তুরস্কের মুজাদ্দিদ উস্তাদ সাঈদ নুরসীর

হীরকতুল্য হিকমাহ সমূহ

রিসালে-নূর সমগ্র থেকে

Translate & Edited By
Mohammed Abdul Mannan
PHD Candidate Yalova University, Turkey.
Masters of Arts. Kushtia University Bangladesh.
Dawrah Hadith. Bangladesh Qawmi Madrasah.

সাঈদ নুরসীর হীরকতুল্য হিকমাহ সমূহ

حكمة الألماسية برسالة النورية

Said Nursi’nin Elmas Hikmetleri

Tebrik Niteliğinde

Mehmet Paksoy.Yaşar Uyusal. Mahmut Işkur. Ekrem Kılıç. Selçuk Demirsoy. Mahmut Andı. Jihan Karim. Murat Kınık. Mikail koç. Yalova ve Orhangazi Nur Cemaati.

Çeviride Hususı Asistanlar

Murat Nuralp. Turgut Toruk. Ümit Pelit. H: Abdul Hannan.
সার্বিক সহযোগিতায়ঃ Murathan Seyhan. Serhat akgün. Rasim Enes Kılıç.

Translated By:
Mohammad Abdul Mannan

সম্পাদনায়, প্রকাশক, স্বত্বঃ -**অনুবাদক** | **Edıted, Publisher, Owner –Translator**
পরিবেশক” **ইউনাইটেড নূর ফাউনডেশন** | **Distributor” United Nur Foundation**
প্রথম প্রকাশ **@ ২০২২** | **First Published @ 2022**

প্রাপ্তিস্থান

মাকতাবাতুশ-শামস
৭ নং, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মার্কেট
বন্দর বাজার, সিলেট, ৩১০০, বাংলাদেশ।
01718-377477, 01719-288558

Bangla Turkish Hane
Bayraktepe Mah, Son Sok,
Huzur apt: 11/1, Yalova, Turkey.
+905372730042,
mannan01720@gmail.com

ISBN 978-88-89637-15-9

রকমারি, Wafi Life, رسالۂ نور Risale-i Nur

Cover and Printed By : KATIB

অভিমত تعليق

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

شيخ الاسلام مفتي تقي عثماني

১৯২৩ সালে তুরস্কে উসমানী খেলাফত বিলুপ্ত করে তৎকালীন শাসকদল ধর্মহীন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। যার ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসন গুলোর বিরুদ্ধে কঠোর হস্তক্ষেপ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় একসময় তুরস্কে আরবীতে আযান বন্ধ করে দেওয়া হয়। আরবী ভাষায় ধর্মীয় বইপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষাদানের প্রতিও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। জনসাধারণকে টুপির স্থানে ইংলিশ হ্যাট পরিধান করার আইন প্রণয়ন করে জোর-জবরদস্তি করা হয়। মোটকথা, এসব ধর্মবিবর্জিত হিংস্র কার্যকলাপ আর অন্য কোন ইসলামী জনপদে দৃশ্যমান হয়নি। আল্লাহর মেহেরবানিতে পর্যায়ক্রমে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু তুরস্কের শাসনব্যবস্থায় ধর্মহীনতা জেঁকে বসে এবং দেশের ধর্মীয় আকাশ আল্লাহ্ দ্রুহীদের আন্ধকার মেঘে ছেয়ে যায়। বর্তমানে আল্লাহর মেহেরবানিতে এই ভয়ংকর অবস্থার আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের ধর্মীয় এ অমানিশার ঘনঘটায়ও তুরস্কের ওলামায়ে কেরাম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে অবস্থার মোকাবেলা করতে থাকেন। তারা বিভিন্ন অঙ্গনে নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ ধারার কার্যক্রমে কয়েকটি গ্রুপ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রথমত, ঐসব আলেম যারা দৃশ্যপটের আড়ালে থেকে ইসলামী শিক্ষার সংরক্ষণের জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করতে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, আল্লামা বাদীউযযামান সাঈদ নূরসী রহ.-এর অরাজনৈতিক ঈমানী আন্দোলন। তিনি তার রচিত রিসালায়ে নূরের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলাহী লেখনীর মাধ্যমে অলৌকিকভাবে নওজোয়ানদের মধ্যে ইসলামী নবজীবনের ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। তার প্রভাব সমাজের প্রত্যেক স্তরের জনসাধারণের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তৃতীয়ত, দাওয়াত ও তাবলীগের প্রভাব এর সাথে এক হয়েছে। বর্তমানে এই তিন দলের ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রভাব বেড়েই চলেছে।

মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী রচিত
'দুনিয়া মেরে আগে কিতাব থেকে সংগৃহীত

P' no 75-76 6668.

অভিমত *تعليق*

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ
شيخ عبد الفتاح ابو غده

শাইখ সাঈদ নুরসী হলেন, বিপদ মুকাবেলায় পাহাড়ের দৃঢ়তা নিয়ে এড়িয়ে থাকা জগদ্বিখ্যাত আলেম। মুসিবতের বেলায় ভাসতে থাকা এক চেতনাকর দ্বীনের দাঈ। জীবনের কঠিন থেকে কঠিনতম মুহূর্তে সত্যের ওপর টিকে থাকা এক মর্দে মুমিন। জীবনযুদ্ধে আল্লাহর হুকুমের ওপর অবিচল থাকা এক সাহসী মুজাহিদ। ইবাদত ও সাধনায়, যিকির ও মুযাকারায় আত্মসমাহিত এক দরবেশ।

'বদীউযযামান' উপাধি যাকে জগতে খ্যাতি এনে দিয়েছে। উস্তায বাদীউযযামান সাঈদ নূরসী তুরস্কের ইসলামি জাগরণের অগ্রদূত। তাঁকে তুরস্কের ধর্মীয় জাগরণের অগ্রসেনা বলে গণ্য করা হয়। আধুনিক সময়ে তাঁকে ইসলামি জাগরণের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রীয় পুরুষ হিসাবে গণ্য করা হয়।

আল্লাহ পাক স্বীয় ক্ষমা ও মাগফিরাতের চাদরে তাঁকে ঢেকে নিন। তার অফুরন্ত রহমত ও অনুগ্রহ তার ওপর বর্ষন করুন। আমাদেরকে ও সকল মুসলমানকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা উপকৃত করুন। আমীন।

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. রচিত 'আল-উলামা উল উযযাব আল্লাযিনা আছারুল ইলমা আলায-যাওয়াজ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

অনুবাদক مترجم

প্রশংসা তার করতেই হবে যিনি ছাড়া কল্পনা শক্তির মধ্যে থাকা অদেখা অনুর কোন ক্ষমতা নেই। পরিচিত হলাম রিসালে নূরের সাথে তাও আবার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই সুন্দর মননের, পরোপকারী ব্যক্তিত্ব জনাব জিহান করিম সাহেবের মাধ্যমে, তার সন্ধান আবার পেলাম ডক্টর কাদির তারিক স্যারের ইমেইলের মাধ্যমে। তিনিও ছিলেন আরেক নিরব হিতাকাঙ্খী ব্যক্তিত্ব। যাইহোক আল্লাহ দুজনকেই জান্নাতের বাসিন্দা না বানিয়ে যেন দুনিয়া থেকে ফেরত না নেন। এক পর্যায়ে ইস্তানবুলের অম্রানিয়াস্থ নূর মাদ্রাসার সেলজুক আবে ও মেহমেত পাক্সয় আবে বড় গুণীজনদের মাধ্যমে তুরকিশ ভাষা শেখা ও অনুবাদ এর কাছাকাছি হওয়া শুরু হয় আলহামদুলিল্লাহ শেষ পর্যন্ত বেশ কিছু অনুবাদের বিশেষ অংশাবলি এখন বই আকারে বের হয়ে যাচ্ছে। কল্পনা করিনি যাহা তাইতো তিনি চাইলে করতে পারেন, তিনিই যুল-জালাল তিনিই যুল-কামাল রাব্বে রাহিম ও তিনিই যুল-আযাল। ঈমানী চেতনার জাদুকরী শতাব্দীর সেরা বইগুলো থেকে একটি হলো ওস্তাদ আল্লামা বদিউজ্জামানের **রিসালে নূর।** বলাবাহুল্য, ইংরেজি ও আরবিতে পূর্ণ রিসালে নূর অনূদিত আছে। এর সবচেয়ে বড় কারামতের একটি হলো অসংখ্য ভাষায় এই কিতাবটি অনূদিত হয়েছে আর এমনটি হবে বলে ভবিষ্যৎ বানীও ছিল সুলায়মান আবে নামের প্রথম যুগের এ্কজন নূর তালাবার। লেখকের ভাষায় এই কিতাব তার কোন সম্পদ নহে এটা নেয়ামতে এলাহি, তার দাওয়াতের ভাষা হল ঈমানের হাকিকাতের আলোচনা করে করে ভ্রাত্রিত্তের ছোঁয়া বিস্তৃত করে চিরস্থায়ী জীবনের সফলতা অর্জন করা। তারি-ই ধারাবাহিকতায় এবার = **সাঈদ নুরসীর হীরকতুল্য হিকমাহ সমূহ** = বাংলায় অনূদিত হলো এইগুলোও আবার ছয় হাজার পৃষ্ঠা থেকে সর্বসাধারণের দৃষ্টি সাকুল্যে নির্বাচন করে করে লেখা হয়েছে যেখানে একজন মুসলমানের সবচেয়ে জটিল বিষয় তাকদীরের এবং সবচেয়ে সহজ আলোর হাতছানি ভ্রাত্রিত্ত বা উখুয়্যাত এবং ইবাদাতের শর্ত নামীয় ইখলাস রিসালে ও বিদ্যমান রয়েছে, যে রিসালেগুলো ঈমানের সবচেয়ে বিষাক্ত দুশমন অহংকারকে ধূলিস্যাৎ করে সবরের ক্ষমতাকে শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া শেষের দিকে বিষয় ভিত্তিক, আমাদের দৈনন্দিন চূড়ান্ত আবশ্যকীয় কিছু তথ্য একত্রিত করা হয়েছে, যেগুলো সমগ্র রিছালে নূর থেকে অংশ বিশেষ, অতি গুরুত্তপুরক উপাত্ত একত্রিত করতে প্রচেষ্টা করা হয়েছে যেন পূর্ণ রিছালে নূর পড়ার আগ্রহটা তৈরি হয় এবং দুই চারজন মিলে এক সাথে অল্প সময়ে একটি বিষয়ের উপর দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন, যেখানে আছে জান্নাত, জাহান্নাম, হাসর, মৃত্যু, হৃদ্যতা, মুসীবত, নফস, রিজিক, সবর, লোক দেখানো রিয়া, মন্দ ধারণা, শুকরিয়া, সমালোচনা, ওয়াসয়াসা, যৌবন, মতভেদ, জাতীয়তাবাদ, মাজহাব, বিতর্ক, ন্যায়বিচার, নেতিবাচক চিন্তা ও ১০ টি বিশেষ প্রশ্নের উত্তর। এই কিতাবের এবং নূর জামাতের সোহবত অর্জন করলে যে কেহ একেবারেই স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে সহজে এই যুগে সত্যিই রিসালে নুরের অনুসরনে ও আমল করনের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের অনুসরণ করা সম্ভব। এটা আমি তুরস্কের ইয়ালভা শহরের মুরাদ কিনিক ভাইজানের সাথে যদি না থাকতাম তাহলে এমন অনুভূতি আমার তৈরী হতো না। একটি কথা না বলিলে নহে, রিসালে নুরের হাকিকি ও ঐশী স্বাদ ও তাকওয়া উসমানী ও তুরকিশ ভাষায় আয়ত্ত অনেকটা সহজলভ্য। নতুবা অন্য ভাষায় যেমন বাংলায় তার উপযুক্ততা অর্জন কিছুটা অপ্রতুল। নিঃসন্দেহে একটি মুরগ

যে পরিমান উড়তে পারে ইহা কি কখনও বাজপাখি বা পাখিদের রাজা ঈগলের সমতুল্য হতে পারে। তারপরেও সময়ের অপূর্ব উস্তাদ বাদিউজ্জামানের মানা'বি, আধ্যাত্মিক হিম্মতকে ছোঁয়ার চেষ্টা অনুবাদের দ্বারা করানো হয়েছে মাত্র। শিশুবেলা থেকে মাদ্রাসা-মসজিদে আলেমদের আশপাশে বড় হলাম আর ভাবতাম তাকওয়া মনে হয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই, কিন্তু নূর জামাতের সাথে থেকে ও পরে বুঝলাম যে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার রং জায়গা বিশেষ বিস্তৃত করে বিভিন্নভাবে প্রভাতের আলোর মশাল করে রেখেছেন। কি অদ্ভুত কি আজব আল্লাহর ও ঈমানের পরিচয় বুঝিয়ে-বুঝায়ে অসাধারণভাবে রিসাল নূর এই মানুষগুলোকে কোরআনের প্রতি গোলামী করাতে পারবে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না। সত্যি কথা বলতে বাধ্য হয়ে এই কথাগুলো আমি বললাম যার বাস্তব প্রমাণ আমি নিজেই। জানাকথাঃ কোরআন ব্যাতিত পৃথিবীর উদরে "লা রাইবা ফিহ" বলে কোন কিতাব নেই, পরিশেষে অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গসুন্দর ত্রুটিমুক্ত রাখতে চেষ্টা ও শ্রম অবলম্বন হয়েছে। তারপরও ত্রুটি ও মুদ্রণপ্রমাদ থাকা স্বাভাবিক তাই বলে অবহিত করন এর অপেক্ষায় আমরা রইলাম সংশোধন করা হবে ইনশা-আল্লাহ। নিয়তের খবরতো তিনিই জানেন যদি তিনি কবুল করে নেন তাহলে তামাম দুনিয়ার কোন মূল্য নেই, ঈমানদীপ্ত এই কিতাবখানাকে আল্লাহ কবুল করুন। এবং সার্বিক সহযোগিতায় যারা ছিলেন তাদের সকলের নাজাতের উসিলা করুন। আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

অনুবাদক

محمد عبد المنان

রিসালে নূর পড়ার ইহ-ও পরকালীন উপকারিতা কি কি ?

يُوزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدِمَاءِ الشُّهَدَاءِ

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِاَةِ شَهِيدٍ

এই দুটি হাদিস শরিফ থেকে অর্জিত এলহামের দ্বারা স্পষ্ট যে রিসালে নুরের লিখন কর্মে ব্যাস্থ থাকার কারনে ব্যাক্তির দুনিয়াবি ও পরকালীন জীবনে অসংখ্য ক্ষেত্রে লাভমান ও সফলতা থেকে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করছি। এই সফলতা সমূহ রিসালে নুরে আলোচিত হয়েছে এবং তার ছাত্রদের স্বীকারোক্তির দ্বারা তা প্রমাণিত ও হয়েছে। **পাঁচটি পরকালীন বা ইবাদাত সংশ্লিষ্ট উপকার=**

১/ একজন নূর তালাবা সর্বোৎকৃষ্টপূর্ণ মুজাহাদা কারি বা প্রচেষ্টাকারী হিসেবে বিবেচ্য হয়ে যান। আর তা হল যে পথভ্রষ্ট দের সম্মুখে তারা আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

২/ একজন নূর তালাবা যে তার উস্তাদের প্রতি হাকিকাতের বাস্তবতার নিরিখে সাহায্যের আবয়বে খেদমত কারীতে রূপান্তরিত হয়ে যান।

৩/ মুসলমান জনসাধারণের জন্যে ঈমানের বিবেচনায় একজন পূর্ণাঙ্গ খেদমত কারীতে রাহবার হয়ে যান।

৪/ একজন নূর তালাবা যিনি হাতেখড়িতে কলমের শক্তি দ্বারা ইলমে হাকিকির অর্জন কারী হয়ে যান। ৫/ একজন নূর তালাবা যিনি কখনো এক ঘণ্টা যা এক বছরের সমতুলয় ইবাদাতের আওতাভুক্ত হওয়া এমন তাফাক্কুরের ইবাদাতে পরিবর্তনশীল ব্যাক্তিতে রুপ নিয়ে নেন। **পাঁচটি দুনিয়াবি বা ইহকালীন উপকার=**

১/ একজন নূর তালাবা এর রিজিকের মধ্যে বরকত চলে আসে।

২/ অন্তরের মধ্যে শান্তি ও প্রশান্তি চলে আসে। ৩/ রোজকারে সহজলভ্যতা চলে আসে।

৪/ কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ততা চলে আসে। ৫/ রিসালে নুরের ছাত্র হওয়ার ফজিলত অর্জন করার সাথে সাথে সমগ্র রিসালে নূর তালাবাদের বিশেষ দোয়ার অধিকার অর্জন হয়ে যায়।

কলমের দ্বারা নূর জামাতের খেদমত ও সত্যনিষ্ঠতার মাধ্যমে রিসালে নুরের ছাত্রত্য অর্জনের দুটি অতি মহামূল্যবান সফলতা অর্জনের প্রমান রয়েছে।

১/ কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রতিপাদিত যে তারা এই দুনিয়া থেকে ঈমানের সাথে কবরে গমন করে। ২/ সমস্ত রিসালে নূর ছাত্রদের আধ্যাত্মিক সোয়াব অরজনের ক্ষেত্রে নূর প্রাসাদের মা'নাবি ব্যাবসায়ি কাঁরখানার সুক্ষ রহস্যের বিবেচনায় তাদের সকল নূর ভাইদের উত্তম কৃতকর্মের অংশিদারিত্ত অর্জনে লাভমান হয়ে থাকে। এমন কি হাফিজ আলি নামিয় মশহুর নূর তালাবা এর ন্যায় শহীদি দরজা অর্জনের তৌফীক কারী হয়ে যায়। এমিরদাগ লাহিকাছি ১৯০।

রিসালে নূর কি ধরনের তাফসির ?

মৌলিক ভাবে তাফসির রেওয়ায়েত ও দিরায়েতে বিভক্ত। রিছালে নূর এই দিক থেকে একটি দিরায়েত তাফসিরের অন্তর্ভুক্ত।

মাজহাবি,ঈশআরি ও ফিকহি তাফসিরের বিবেচনায় ঈশআরি বলা যায়। যেমন ইমাম তুস্তারি এর তাফসিরুল কুরাআনুল আযিম এর ন্যায় মিল রয়েছে।

আবার আধুনিক বিষয়ভিত্তিক, ইজমালি, বিজ্ঞ্যানতত্ত্ববহুল, আদাবতত্ত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিক, আভিধানিক, ও ইলহাদি তাফসীর এর নবিন প্রকার সমুহের থেকে রিসালে নূর বিষয়ভিত্তিক, বিজ্ঞ্যানতত্ত্ববহুল, ও দর্শন বাদী দের মুখুস উন্মোচনে ইলহাদি তাফসীর ও বলা যায়।

চতুর্থ নং মন্তব্যটি লেখক উস্তাদ সাইদ নুরসির জীবনী নামক গ্রন্থের তুরকিস ভাষায় লিখা বইয়ের পৃষ্টা নাম্বার ৬৮১ তে উল্লেখ আছে যে, তাফসীর দুই প্রকার প্রথমটি যা সকলের অবগত থাকা তাফসীর যেখানে কুরআনের ইবারাত শব্দাবলী ও বাক্যাবলিকে আর অর্থ উদঘাটন পূর্বক যে বর্ণনা ব্যাখ্যা ও প্রমাণাদির দ্বারা আঞ্জাম দেয়া তাফসীর পুস্তক সমূহ।

দ্বিতীয় প্রকার তাফসীর হল, কুরআনে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা হাকিকাত সমুহকে সার্বিক দলিল প্রমাণাদির দ্বারা ব্যাখ্যা বর্ণনা করা। এই দ্বিতীয় প্রকার অত্যান্ত গুরুত্ত বহন করে। প্রথম প্রকার তাফসিরে এই দ্বিতীয় প্রকার তাফসিরকে মাঝে মধ্যে ইঙ্গিত পূর্বক সঙ্কেপে আলোচনা হয়েছে ও তার অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু রিসালে নূর অত্যান্ত গভীর ও প্রখড়ভাবে এই দ্বিতীয় প্রকার তাফসীরের উপর তার ভিত্তি স্থাপন করে লিপিবদ্য করা হয়েছে। অতুলনীয় এক পন্থায় সুদূর দুষ্ট দর্শনবাদীদের কে ও চুপ করিয়ে এক আধ্যাত্মিক তাফসীরের নাম হল কুল্লিয়াতে রিসালে নূর , , , , , , , ।

রিসালে নূর সংকলন

"রিসালে-ই নূর" মূলত ১৯১০ থেকে শুরু করে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত। (যদিও মূল অংশের রচনার কাজ শুরু করেন। ১৯২৬ সালে)। "রিসালে-ই নূর" প্রায় ৬০০০ হাজারের অধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি রচনা সংকলন। এতে রয়েছে প্রায় ১৩০ এর অধিক প্রবন্ধ (থিসিস বা গবেষণা বা রিসালে)। এসব রচনার কোনটি ২-৩ পৃষ্ঠা আবার কোনটি ৮০-৯০ পৃষ্ঠাব্যাপি।

"রিসালে-ই নূর" অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রন্থ যা লেখকের নিজ হাতে সরাসরি রচিত নয়, পুরোটাই শ্রুতি লিখন! তিনি তার ছাত্রদের উদ্দেশ্য বলতেন এবং তাঁরা তা শুনে শুনে লিখতেন। পরে লিখিত কপি তিনি নিজ হাতে সংশোধন করে দিতেন। সে সময় বই প্রকাশের উন্নত সিস্টেম ছিলনা তাই হাতে লিখিত কপিগুলো পড়ার জন্য বাইরে পাঠানো হতো। সাঈদ নুরসী (রহঃ)র শত শত অনুসারীরা এগুলো কপি করে অন্যদের নিকট প্রচার করতেন। এ ধরনের হাজার হাজার ছাত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে তুরস্কের ইস্পার্তা অঞ্চলে ঘরে ঘরে রিসালে নূরের কপি তৈরি হতো। বছরের পর বছর এভাবে রিসালে নূরের কপি হাতে লিখে প্রচার হতে থাকে। বলা হয়ে থাকে, "রিসালে-ই-নূর" এর কপির সংখ্যা প্রায় ৬ লাখে পৌছেছিল । এদিক দিয়ে এটি যুগের এক বিস্ময়ও বটে। ১৯৪৬ সালে আল্লামা সাঈদ নুরসীর (রহঃ) ছাত্রদের নিকট প্রথম কপি করার মেশিন আসে এবং ১৯৫৭ সালে প্রথম এর প্রিন্টিং কপি বাজারে আসে।অবশ্যই যে কোন কর্মকাণ্ড বা সেবার পরিবর্তে আর্থিক মজুরি বা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেচনা করা হয় তবে রিসালে ই নূরের তালেবরা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাল্লাহর রাজী খুশির জন্য কাজ করে। তদুপরি আছে এই মেহনতের অংশ হতে পারার আনন্দ ও তৃপ্তি; আমাদের ভাই ও নাগরিকদের ইসলাম এবং মানবতা অর্জনে সহায়তা থেকে আসা চিরন্তন জান্নাত লাভের সুখ এবং আশা, এই মেহনতের থেকে আমাদের প্রাপ্তি ও পাওনা।

রিসালে নূর আমাদের কীভাবে পড়া উচিত

- সাধারন কিতাব বা পত্রিকার ন্যায় না পড়া - খালিস নিয়তে পড়া, - বারবার পড়া, - যত্ন সহকারে পড়া, কৌতুহল (উৎসুক) নিয়ে পড়া, - মহব্বতের সাথে পড়া, - আস্বাদনের সাথে পড়া, - নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়া, - অন্বেষণ করে করে পড়া, - এগিয়ে যেতে যেতে, - রুহানি আনন্দে পড়া, - প্রেমের সাথে পড়া,- তাফাক্কুর ও সুচিন্তার ধ্যান করে করে পড়া

-ধীরে ধীরে পড়া,- তাড়াহুড়া না করে পড়া,- অধ্যবসায় এবং নিখুঁতভাবে পড়া- আগে না পড়ার মতো আধ্যাত্মিক আনন্দে পড়া,- মুজাকারা করে করে পড়া,- চিরকাল, জীবনব্যাপী পড়া,- জানা বিষয়কে এখনই নতুন করে জানছি বলে পড়া- শিখা ও আমলের নিয়তে পড়া,- কিছুই জানিনা এই নিয়তে পড়া- তাকওয়াবান হওয়ার নিয়তে পড়া

- আল্লাহকে খুশি করার নিয়াতে পড়া।

রিসালে নূর সমগ্রে কি কি উত্তর রয়েছে ?

- স্রষ্টা ও সৃষ্টির সেরা মানবকে নিয়ে যতরকম প্রশ্ন রয়েছে তিলতিল করে সূতির ন্যায় স্বর্ণাক্ষরে উত্তরগুলো রিসালে নূরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।- দুনিয়াকে কিভাবে ভালবাসবেন ? - যৌবনের অনিষ্টতা থেকে কিভাবে মুক্তি মিলবে?

- জীবনকে স্বাদময়ী কিভাবে করবেন? - আমাদের ভিতরকার রুহ আসলে জিনিস টা কি?

- আমি নামক আমিত্ত বাস্তবেই ব্যাপারটা কেমন? - জান্নাতের বাস্তবতা কি আসলেই আছে?

- হাসরের দিন কি সত্যই হবে? -এখনকার জামানায় ও ধর্মীয় ইজতেহাদের দরজা কিখোলা ?

-নবীজির মে'রাজ এর সত্যতা কতটুকু রয়েছে ? -মেরাজ কি সত্যই হয়েছিল?

-একের অধিক স্রষ্টা কতটুকু কার্যকরী কথা ? -দুনিয়াটা আসলেই কি ক্ষনস্থায়ী ? স্রষ্টা বলতে কিছুর ধারনাটা কেমন?

-ভুমিকম্প থেকে মুক্তির উপায় কি? -আদম আঃ কে কেন জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে ?

-শয়তানকে সৃষ্টি করা কি মন্দ কাজ নহে? -বিশেষ করে মুসলমানদের উপর শুধু শুধু মুসিবত কেন আসে ? -রাজনীতি থেকে সাইদ নুরসি কেন দূরে থেকেছেন?

-হজরত আলি রা. এর যুগের সকলেই তো সাহাবি ছিলেন তাহলে হক বাতিল কিংবা কোনটি ছিল?

- মানুষ আসলে কি? পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান কোন পর্যায়ে? -এই মানুষকে সৃষ্টির আসল রহস্য কি? তাকে দুনিয়াতে কেন প্রেরণ করা হয়েছে? পাপ কাজে মানব অভিমুখী হয় কেন?

- জীবন কি? কোথা থেকে এসেছে এবং আবার কোথায় যাবে? -আর দুনিয়াতে আমার কাজ কি? আমার সময় কি সীমিত নাকিএখানে চিরস্থায়ী? - এই দুনিয়াকে এত সুন্দর করে কে পরিচালনা করছে? -ধর্ম ও বিজ্ঞান কি আসলে বিপরীতমুখী? এখানে সমাধান কি? - মানুষের শারীরিক মৃত্যুর পর তার সবকিছুই কি একেবারে শেষ হয়েযাবে?

- পরকাল বলে যদি কোন বাস্তবতা থাকে তবে তার ধরন কি রকম? - মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়া কিভাবে সম্ভব?

- প্রকৃতি বলতে আসলে কি বুঝায়? - ফেরেস্তা কি? এদের কি বাস্তবে অস্তিত্ব রয়েছে? - রুহ্ কি? -দেহের মৃত্যুর পর এটাও কি মরে যায়? - তাকদির কি? মানুষ কি বাধ্য না তাকে বাধ্য করা হয়?

- মানুষের সামাজিকভাবে সমস্যা কি ও তার সমাধান কি? - মানুষের ভিতর কি কি আধ্যাত্তিক ক্ষমতা থাকে যা ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারে? আরও অসংখ্য অজানা প্রশ্নের জবাব রিসালে-নুরে বিদ্যমান।

গুরুত্ত-পূর্ণ বিষয় ভিত্তিক তত্ত সমূহ

জান্নাত
জাহান্নাম
জাহান্নামের সময়সীমা
হাসর
গুনাহ
মৃত্যু
মুহাব্বাত
মুসীবত
নফস
রিজিক
সবর
রিয়া
মন্দ ধারণা
কৃতজ্ঞতা
সমালোচনা
কুমন্ত্রণা
যৌবন
আধুনিকতা
মতভেদ/ঈর্ষা
সাহাবী
বাদানুবাদ
ন্যায়বিচার
প্রশ্ন ও উত্তর
নুরসীর জীবনী ও মর্মবানী সমূহ

গুরুত্ত-পূর্ণ বিষয় ভিত্তিক তত্ত সমূহ

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين الحمدلله رب العلمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلي اله
اجمعين

জান্নাত

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا "হে মানব তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর" আলোচ্য আয়াত দ্বারা হুকুম সাব্যস্থ হচ্ছে যে এই দুনিয়ার উপস্থিত স্বাদকে তরক করে কষ্ট ও প্রচেষ্টার প্রতিদানের জন্য ইবাদতে মশগুল হয়ে যে সামানা আখেরাতে প্রেরন করা হয়, এতে জান্নাতের দরজা খুলে জান্নাতের অনাবিল স্বাদ ও প্রশান্তিকে প্রদর্শন করে মুমিনদের অন্তর সমূহকে সুমিষ্ট ও গ্যারান্টি সরবরাহে যোগান প্রদান করছে। তার সাথে, এলাহির প্রস্তাবের ভিত্তি স্বরূপ এবং ঈমানের প্রথম রুকন হওয়া তাওহীদকে প্রথমেই প্রমান তুলে প্রমাণিত করে দিয়েছে, উক্ত আয়াত ও তাওহীদের ফলাফলকে এবং রহমতের শিরোনাম জান্নাত ও সা'দাতে আবাদিয়ার স্বীকৃতির অবস্থান ফুটিয়ে তুলেছে। এমনকি মুহাম্মাদ সাঃ এর নবুয়াতকে اِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ ইলা আখেরিল আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত প্রধান করতঃ তার মু'জেযাকে প্রমাণিত করা হয়েছে। এখানে ও সুসংবাদ ও ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা নবুয়াতের দায়িত্ত সমূহকে কোরআনের ভাষায় ইশারা দেয়া হয়েছে।

বন্দুগন! জান্নাত এবং জাহান্নাম হল; সৃষ্টির সুক্ষ-বৃক্ষের থেকে চিরস্থায়ী জীবনের পথে গত হওয়া দুটি ডাল থেকে আত্মপ্রকাশ পাওয়া দুটি ফল, এবং কায়েনাতের ধারাবাহিকভাবে আগত হওয়া সিলসিলার দুটি পরিণাম, এবং চিরকালীন পথে সোজা কায়েনাতের বন্যায় প্রস্রবিত হয়ে গত হওয়া দুটি খাজিনা ও দুটি হাউজ বা পুকুর বিশেষ। অবশ্যই মহান আল্লাহ্, এই আলমকে পরিসমাপ্তির হিকমতের কারনে পরিক্ষার ক্ষেত্র স্বরূপ তৈরি করেছেন; আবার সীমাহীনতার জন্যে পরিবর্তন, স্থানান্তর, রুপান্তর সাধনের ক্ষেত্রে ইচ্ছা পোষণ করেছেন; এমনকি চিরস্থায়ী লক্ষের জন্যে ভাল এর সাথে মন্দকে, উপকারের সাথে ক্ষতিকে, সুন্দরের সাথে কদর্যকে উৎকৃষ্টতার সারাংশের সাথে নিকৃষ্টতার বিপরীত একটি আকৃতিতে জান্নাত ও জাহান্নামকে একটি বীজের ন্যায় প্রস্ফুটিত করে কায়েনাতের এই সশ্যক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেছেন। স্পষ্ট কথা যে, যেহেতু এই আলম মানবের জন্যে একটি পরিক্ষা ক্ষেত্র এবং তাদের জন্যে এক প্রতিযোগিতার স্থল স্বরূপ; উত্তম কর্ম ও মন্দ কর্মের বিবেচনায় একটি অপরটি থেকে আলাদা না হওয়ার স্থরে মিশ্রিত ও মিলিত হওয়ার মূল টার্গেট এটা যে, যেন মানবজাতি তাদের স্থর-ভেদে স্থরান্বিত হতে পারে। পরিক্ষা ও নিরীক্ষার সময় শেষ হওয়ার পরে খারাপ পথে ব্যাস্থ থাকা মানুষেরা যেন আলাদা হয়ে যায় এই মর্মে وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ " এই মুজরিমরা আজকে বাম পথের সিরিয়ালে যাও" এমনটি এলাহি ফরমানের উল্কাপিন্ডেময়, নির্দয় ধমকি, কঠোর ভাষায় এলাহির ফয়সালার সম্মুখীন হওয়ার ন্যায়; ভাল পথের পথিকদের ও فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ' চিরস্থায়ী বসবাসের ফরমানের নির্দেশনায় জান্নাতে প্রবেশ কর" এমন ফয়সালা যা মহান রাব্বুল আ'লামিনের দয়া-প্রবন, বন্দু-সুলভ, মমতাময়ী আদেশের মুখোমুখি তারা হবে। মানবজাতি এই দুই দলে আলাদা হওয়ার পর, কায়েনাতও চুড়ান্তকরন এবং শোধনের পরিসমাপ্তিতে পৌঁছাবে। অনিষ্টতা, বিশৃঙ্খলতা, ক্ষতিকারক অঙ্গ ও অংশাবলির এক দিকে হটিয়ে দেয়ার মাধ্যমে জাহান্নামের সৃষ্টি পূর্ণতার সাথে উত্তম, উপকারী, উৎকৃষ্টতার কর্ম ফলের ব্যাক্তিদের

ডান দিকে সরিয়ে নিয়ে জান্নাতের সৃষ্টির পরিপূর্ণতা পরিসমাপ্তির স্বার্থ প্রস্ফুটিত হয়ে উটবে। (ইসারাতুল ই'জায ১৪০)

প্রশ্ন- ত্রুটিপূর্ণ, ক্ষতিগ্রস্থ, পরিবর্তনশীল, ধুয়াপুরক, কষ্টকর দেহ সমূহের অমরত্তের ও জান্নাতের সাথে কি-ইবা সম্পর্ক রয়েছে? যেহেতু রুহের উচ্চমানের স্বাদ গ্রহণীয়তার বাস্তবতা বিদ্যমান রয়েছে; এটাই তার জন্যে যথেষ্ট। শরীর সংক্রান্ত দেহের স্বাদ ভোগের জন্যে, কেন-ইবা একটি দেহের হাসরের উৎপত্তি প্রয়োজন রয়েছে?

উত্তর- তার কারণ হলঃ যেমনটি, মাটি; পানি, বাতাস, আলোর দৃষ্টিতে ঘনীভূত, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়--- কিন্তু, এলাহির শিল্পকলার সমগ্র শ্রেণিসমূহের শুরু এবং মাধ্যম হওয়ার ধরুন অন্যান্য উপকরন সমূহের উপরে তাত্তিকভাবে প্রকাশ হওয়ার ন্যায়—আরেক্টি উদাহারন যেমন ঘনীভূত হওয়া মানুষের নফস; যার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ধাপ-ভেদের বিবেচনায়, পরিশুদ্যতার শর্তে মানবের সমগ্র কাবিলিয়াতের উপরে উন্নীত হওয়ার ন্যায়--- একি-ই ভাবে যেমন দেহতত্তে; যেখানে সব চেয়ে জমাটকৃত, বেষ্টিত, প্রাচুর্যমন্ডিত একটি এলাহির ইসিম সমূহের তাজাল্লির আয়না স্বরূপ। রহমতের সমস্ত খাজিনা সমূহের একীভূতকৃত ষ্টক সমুহকে মাপ-পরিমাপের আওতাধিন হবে এমন মাধ্যম সমূহ হল দেহতত্ত্বীয়।

যেমন আরেকটি উদাহারন হল জিহ্বার মধ্যে থাকা স্বাদ-শক্তি, রিজিকের স্বাদের মধ্যে যদি খাবারের ভিন্নতার বিবেচনায় অবস্থান না থাকত; তাহলে প্রত্যেকটা থেকে আলাদা আলাদা অনুভুতি সৃষ্টি হতনা, টেস্ট করে বুঝে আসতো না। তারি সাথে অধিকাংশ এলাহির তাজাল্লি সমুহকে জানা, স্বাদের গতি বুঝার যে ক্ষমতা রয়েছে এটাও ঘুরে ফিরে দেহ তাত্ত্বিক ব্যাপার। পাশাপাশি, অত্যান্ত ব্যাতিক্রমি এবং শেষ সীমার ধাপ অনুসারে পৃথক পৃথক স্বাদ সমূহের অনুভুতি সৃষ্টি হওয়ার যোগ্যতা ও দেহ তাত্ত্বিক। যেহেতু এই কায়েনাতের মহান শিল্পী, এই কায়েনাতের সাথে তার সমস্ত খাজিনা সমুহকে পরিচয় করিয়ে দিতে এবং তার সমগ্র নাম সমূহের তাজাল্লিয়াতকে জানিয়ে দিতে এমনকি তার সমস্ত অনুগ্রহের প্রকারাদির স্বাদকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চান; সুতরাং অবশ্যই এই কায়েনাতের প্রস্রবনের পরে আগত সুমহান হাউজকে এবং এই কায়েনাত দস্তরখানার বিছানোর স্বার্থকথাকে একটি বড় হাসরের এবং এই দুনিয়ার শিল্পকলার চিরস্থায়ী খাজিনা হওয়া যার নাম (দারে-সা'দাত) চির সুখের জায়গাকে এক প্রকার তুলনীয় প্রেক্ষাপট উপস্থাপিত হবে ও করবেন। তদসত্তেঃ দেহ, রুহের সার্বিক ভিত্তি সমুহকে হেফাজত ও করবেন। একি-ই ভাবে ঐ মহান সানিয়ে-হাকিম ও আদিলে-রাহিম আল্লাহ্‌ নিঃসন্দেহে দেহবিশেষ মাধ্যম সমূহের দায়িত্তকে আদায় করার জন্যে প্রতিদান স্বরূপ এবং তাদের খেদ্মতের উপহার স্বরূপ এবং বিশেষ ইবাদাতের ক্ষেত্রে সোয়াব স্বরূপ, তাদেরকে উপযুক্ততার ভিত্তিতে স্বাদ ভোগ করার ব্যাবস্থা করবেন। এমনটি না হলে হিকমত, আদালত, ও রহমতের বিপরীত এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, যা তার রহমতের সুন্দরতার ও আদালতের পূর্ণতার সাথে মোটেই খাপ খাবেনা ও এলাহির ক্ষমতার স্বার্থ রক্ষায় অনুপযুগিতা সামনে আসে যা অসম্ভব। (রেফঃ সোজলার ৪৯৮)

জাহান্নাম

প্রশ্ন- জাহান্নাম এখন বিদ্যমান এই বিবেচনায় এখন কোথায় আছে?

উত্তর- আমরা আহলে সুন্নাত অয়াল জামাত এই মুহূর্তে জাহান্নামের অস্তিত্ত বিদ্যমান থাকাতে বিশ্বাস করি। কিন্ত তার স্থল কোথায় তাহা নির্দিষ্ট করছিনা।

প্রশ্ন- বেশ কিছু হাদিসের বাহ্যিক বিবেচনায় স্পষ্ট হয় যে, জাহান্নাম হচ্ছে মাটির নিচে। অর্থাৎ পৃথিবীর নিচে। এমন কি একটি হাদিসের দৃষ্টিতে জাহান্নামের আগুন যা দুনিয়ার আগুনের থেকে দুই শত গুণ বেশি তেজময়। এই কথাগুলোর ব্যাখ্যা----,?

উত্তর – দুনিয়ার নিচে, তার কেন্দ্রতে অবস্থিত। এই কথার বিবেচনায়, জমিনের নিচ তার কেন্দ্রতে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রমানিত হওয়ার মুখোমুখিতে পৃথিবীর কেন্দ্রতে, তার উষ্ণতার দুই লক্ষ সমমানের এক স্থরের আগুন বিদ্যমান রয়েছে। কারণ হল প্রত্যেক তেত্রিশ হাত নিচে ধারনা প্রসুত এক প্রকার উষ্ণতার অবস্থান বাড়তে থাকে। এই গবেষণার ধারাবাহিকতায়, ভূমির কেন্দ্র পর্যন্ত দুই লক্ষ পরিমাণ উষ্ণতার এক অবস্থান প্রমান উপস্থাপিত হয়। সুতরাং এই ভিত্তির দিকে খেয়াল করলে হাদিসে উল্লেখিত তথ্য উপযুক্ততা নিয়ে আসে। এই বিবেচনায় জমিনের কেন্দ্রে দুই লাখ সমতুল্যের তেজময়, উত্তাপ আগুন জাহান্নামের জন্য এক বীজের হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে, কেয়ামতের জন্যে এক পর্দার আয়ত্তে আবরন ভূমির স্থর সমূহকে ভেদ করে, বিভীষিকাময় পরিস্থিতির বাস্তবায়ন হবে, বিস্তৃত হতে থাকবে এবং পূর্ণ যোগানদান সামগ্রীর দ্বারা জাহান্নাম বাস্থবে সামনে আসবে, এমনটি বলা যেতে পারে। একই ভাবে অন্য এক হাদিস শরিফে উল্লেখিত একটি শব্দ "যামহারির" হিমায়িত ও হিমশিলা নামি একটি আগুন রয়েছে। এই হাদিস ও ঐ দৃষ্টিতে অনুকূলপূর্ণ। যদিও জমিনের কেন্দ্র থেকে গ্যালাক্সি পর্যন্ত স্থরে স্থরে আধিক্য হওয়া আগুন অথবা বাড়তি না হওয়া আগুন, "যামহারির" ও এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি আগুনের সমস্ত স্থর এর মধ্যেই আওতাভুক্ত। প্রকৃতি বিদ্যার মধ্যে বারংবার আলোচিত হওয়ার ন্যায়, আগুন মাঝে মাঝে এমন স্থরে আসে যে, তার আশেপাশে থাকা উষ্ণ তিব্রতাকে পূর্ণভাবে নিজের দিকে টেনে উত্তেজিত করে আশপাশের উষ্ণতাকে শীতল করার দ্বারা জ্বালায় এবং পানিকে বরফে রুপান্তরিত করে।

প্রশ্ন- উল্লেখিত হাদিসের ভাষায় জাহান্নাম জমিনের কেন্দ্রেতে, অথচ পৃথিবী হল, জাহান্নামের বিবেচনায় একটি ডিমের ন্যায়, তাহলে এই এত বড় জাহান্নাম মাটির নিচে কিভাবে অবস্থানি হবে?

উত্তর- হাঁ, আলমে-মুল্ক, অর্থাৎ আলমে-সাহাদাত, অর্থাৎ আমাদের এই দেখতে পাওয়া আলম বা দুনিয়ার বিবেচনায়, জাহান্নাম, জমিনের ভিতরে রয়েছে বলে জাহান্নাম কে আমরা ছোট করে দেখাচ্ছি। কিন্তু আখেরাতের আলমের দৃষ্টিতে জাহান্নাম এমন এক বিশালতা সৃষ্টি করে যে, হাজার হাজার পৃথিবীকে তার ভিতরে আনতে সক্ষম, তার পর ও তার ক্ষুধা মিটবে না। আমাদের এই দেখতে পাওয়া দুনিয়া একটি পর্দার ন্যায় আমাদের জন্য তার বিশাল প্রসস্থতাকে বুজতে বাঁধা হয়ে আছে। অধিকন্তু, জমিনের ভিতরকার জাহান্নামের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জাহান্নামের কলিজা ও জাহান্নামের বীজ ছাড়া অন্য কিছু নহে। একইসাথে জাহান্নামের অবস্থান জমিনের নিচে পাওয়ার কথাটার অর্থ হল জমিনের পেটের ভিতরে নতুবা জমিনের সাথে মিলিত, সংশ্লিষ্ট যুক্ত হওয়াটা বাদ্য করেনা। তদসত্তে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবীর ন্যায় অক্ষিগোলক গগনমণ্ডল সমূহ, সবকটিই সৃষ্টির সুক্ষ বৃক্ষের ফলসমূহ স্বরূপ। জানা কথা যে প্রত্যেক ফলের নিচে বৃক্ষের সমস্থ ডাল সমুহের অভ্যন্তরস্থ আধেয় বিদ্যমান রয়েছে। এই সুত্রের ধারাবাহিকতায়, আল্লাহ্‌র রাজত্ত সীমাহীন প্রশস্থ। সৃষ্টির সুক্ষ বৃক্ষের ডাল সমূহ ও সকল দিকে বিস্তৃত হয়ে প্রশস্থ হয়ে আছে। ঐ পন্থায় জাহান্নাম যেখানেই বিস্তৃত হোক না কেন তার অবশ্যই অবস্থান বিদ্যমান রয়েছে। একিই ভাবে একটি হাদিসের ভাষায় জাহান্নাম হল নমিত রয়েছে; অর্থাৎ মুচড়িত করে রাখা রয়েছে, অর্থাৎ পুরোপুরি ভাবে খোলা নহে। এর অর্থ হল জাহান্নামের একটি ডিমের মত, জমিনের কেন্দ্রেতে বিদ্যমান এবং আরও পরে তার প্রকাশ ঘটবে এমন একটি অস্তিত্ববান সৃষ্টি।

বিঃদ্রঃ- জাহান্নাম এখন অনুপস্থিত উল্লেখকারী মু'তাজিলাদেরকে আলোচ্য হাদিস দেখানো জরুরী। (ইসারাতুল ই'জায ১২৮)

ভু –মন্ডলের দুরদিগন্তে ভ্রমণকারী এমন অনেক মাখলুকাত রয়েছে যে, আলোর বাহিরে হওয়ার কারনে তাদেরকে দেখা যায় না। চন্দ্র তার আলোকে ফিরিয়ে নিলে কোন দেহকে দেখতে না পাওয়ার ন্যায়, আলোহীন অনেক গ্যালাক্সি সমূহ, সৃষ্টি সমূহ আমাদের চক্ষুর সামনে থাকার পরেও আমরা দেখতে পাই না।

জাহান্নাম দুই প্রকার একটি ছোট অপরটি বড়। সামনে ছোটটি বড় জাহান্নামে রূপান্তরিত হওয়াটা এবং একটি বীজের সমতুল্য হওয়ার ন্যায়, আগামিতে তাহা থেকে একটি মনযিল পদারপিত হবে। ছোট জাহান্নাম মাটির নিচে তথা কেন্দ্রতে বিদ্যমান। এই গ্যালাক্সির নিচ, কেন্দ্রিয়ভুক্ত। মাটির শাস্ত্রের দ্বারা জানা বিষয় যে, তেত্রিশ মিটার খননের দুরত্তে, এক প্রকার উষ্ণতার তীব্রতা বাড়তে থাকে। অর্থাৎ জমিনের অর্ধেকের কেন্দ্র পর্যন্ত ছয় হাজার কিলোমিটার হওয়াতে, দুই লক্ষ পরিমান উষ্ণতার সমমানের একত্রিত করনটা; অর্থাৎ দুই লক্ষ পরিমাণ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে আরও বেশি তীব্র এবং হাদিসের রেওয়ায়েতের ভাষায় উপযোগী এক আগুনের অস্থিত্তের প্রমান পরিলক্ষিত প্রমানিত। এই ছোট জাহান্নাম, বড় জাহান্নামের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক কার্যক্রম, এই পৃথিবীতে ও বারযাখ আলমে দেখা হয়েছে এবং ঐ দিকেই হাদিস শরিফ ইঙ্গিত করেছে। আখেরাতের আলমের দিকে, এই ভু-পৃষ্ট যেভাবে তার বাসিন্দাদেরকে বছরের ঘূর্ণায়নে দ্বারা কেয়ামতের ময়দানের দিকে অবতরন করছে তেমনি ভাবেঃ ছোট জাহান্নামকে ও বড় জাহান্নামের দিকে এলাহির হুকুমের মাধ্যমে হাঁকিয়ে হস্তান্তর করছে। মু'তাজিলাদের অনেক ঈমামগনদের মতামতের ভিত্তিতে- "জাহান্নামকে পরবর্তীতে সৃষ্টি করা হবে" তাদের এমন কথার কারণ হল তারা এই ব্যাপারটাকে উপস্থিত সময়ে পুরোপুরিভাবে আয়ত্ত করতে না পারা এবং এর অধিবাসিদেরকে পুরোপুরিভাবে পূর্ণ মুনাসিব পন্থায় বুজতে না পারায় তাদের এই মন্থব্য ভুল এবং আহমকগিরি ছাড়া কিছুই নহে। একই ভাবে গাইবের পর্দার মধ্যে থাকা আস্তিত্ত ও মানযিল সমূহকে আমাদের এই দুনিয়ার চক্ষু দ্বারা দেখা এবং দেখানোর জন্যে, হয় তামাম কায়েনাতকে ছোট করে দুটি শহরের উদাহারনে নিয়ে আসা জরুরী নতুবা আমাদের এই চক্ষু কে বড় করে তারকারাজির ন্যায় তৈরি করা আবশ্যক এই জন্যে যে ঐ স্থান সমূহকে দেখে আমরা সুনির্দিষ্ট যেন করতে পারি। "ওয়াল ইলমু ইন্দাল্লাহ" আল্লাহই বেশি জানেন। আখেরাতের আলমের মানযিল সমূহ, আমাদের এই দুনিয়ার চক্ষু দ্বারা দেখা অসম্ভব। তবে বেশ কিছু রেওয়াতের ইঙ্গিতের দ্বারা পরকালের জাহান্নাম, আমাদের এই দুনিয়ার সাথে সরসরিভাবে সংশ্লিষ্ট পুরক। তাইতো গরমের প্রচন্ড তাপের জন্য " মিন ফাইহে জাহান্নাম" বলা হয়েছিল। এতে এটা দাঁড়ায় যে এই দুনিয়াবি অতি ছোট ও কিঞ্চিৎ আকলের চক্ষু দ্বারা ঐ বিশাল জাহান্নামকে দেখা অসম্ভব। তবে আল্লাহ্‌র "হাকিম" নামের নুরের দ্বারা দেখা যেতে পারে। (মাকতুবাত ৯)

জাহান্নামের সময়সীমা

প্রশ্ন- অল্প এক সময়ের কুফুরি করার বিপরিতে এলাহির পক্ষ থেকে সীমাহীন সময়কালের জাহান্নামে নিক্ষেপ করাটা কিভাবে ইনসাফ বা আদালত হবে?

উত্তর- এক বছরের হিসাব যদি ৩৬৫ দিনে করা হয়, তাহলে এক মিনিটের মধ্যে কাওকে হত্যার ন্যায় কৃত অপরাধ এর শাস্তি মিনিট হিসেবে সাত কুটি আট লক্ষ চৌরাশি হাজার মিনিট ইন্সাফের আদালতের জেল নামীয় শাস্তি হওয়াটা বিদ্যমান থাকা অবস্থায়; এক মিনিটের কুফুরি করাটা, যা হাজার হত্যার সমতুল্য হওয়াতে, একটি লোক বিশ বছর কুফুরিতে সচল থেকে জীবন ভোগ করল এবং মারা গেল, এই লোকটির ব্যাপারে ইন্সাফি আদালতের আঈন অনুযায়ী ৫৭ ট্রিলিয়ন ২০১ মিলিয়ার ২০০ মিলিয়ন বছর মানবের ইন্সাফি

আদালতের আঈন অনুযায়ী জেলের শাস্তি ভোগ করার ফয়সালা হয়ে থাকে। অধিকন্তু “ খালিদিনা ফিহা আবাদা” এই আয়াতাংশের দ্বারা এলাহির আদালতের পুরোপুরি উপযুক্ততাকে বুঝায়ে দিচ্ছে। এখানে অতি দুরত্তপূর্ণ দুই সংখ্যার ভেদ পুরক রহস্য হল এই যে, হত্যা এবং কুফুরি অতিমাত্রার অপরাধ ও অতিরঞ্জতা হওয়ার কারনে, অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এক মিনিটের হত্যাযজ্ঞয় কমপক্ষে বাহ্যিক নিয়ম মাফিক পনের বছর হত্যাকারির জীবন থেকে কমিয়ে নেয়া হয়, এর ফলে অপরাধি লোকটি জেলে যায়। অপর দিকে এক মিনিটের কুফুরি এক হাজার একটি এলাহির ইসিম সমুহকে অস্বীকার করা ও তার উজ্জল নকশা সমুহকে ছোট করা এবং তামাম কায়েনাতের অধিকারের সাথে অতিরঞ্জতা ও তার পূর্ণতাকে অস্বীকার করা এবং সীমাহীন একত্তবাদের দলীল সমুহকে মিথ্যা প্রতিপন্য করা এমনকি সৃষ্টির সাক্ষী সমুহকে প্রত্যাখ্যান করার ধরুন একজন কাফির কে হাজার হাজার বছর সর্ব নিম্নের জাহান্নামে নিক্ষেপ করাটা “খালিদিনা” এর আদালাত হওয়াটা অতি পূর্ণভাবে উপযুক্ত। (লাম’লার ২৭৬)

হাশর

হাশরের ব্যাপারে আ রোপিত একটি **প্রশ্ন** : পবিত্র কুরআনে বার বার এ ধরণের যে সকল আয়াত বর্ণিত হয়েছে। وَمَّا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ ও اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً

এমন সব আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বড় হাশর’ হঠাৎ করে সংঘটিত হয়ে যাবে। কোনো সময় নেয়া ছাড়াই এক মুহূর্তের মাঝে পূর্ণতা লাভ করবে। কিন্তু দুর্বল বুদ্ধি ও ত্রুটিপূর্ণ বোধশক্তির দাবি হলো। অসাধারণ ও অভূতপূর্ব ঘটনা তাকে বোঝাতে কোনো বাস্তব ঘটনা, দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো উদাহরণ দেয়া চাই। যাতে বিষয়টি তাকে বোঝানো উদ্দেশ্য তা গ্রহণযোগ্য আকৃতিতে তার স্মৃতিতে বসে যায়।

উত্তর : হাশরের মাসআলা মৌলিকভাবে তিনটি মাসআলা সম্বলিত বিষয় : ১. রূহসমূহ দেহে ফিরে আসা। ২. দেহগুলোকে জীবিত করা। ৩. দেহগুলোকে নতুনভাবে তৈরি করা ।। প্রথম মাসআলা : রূহগুলো আপন দেহে ফিরে আসা। এ বিষয়টিকে উদাহরণ দ্বারা এভাবে বোঝানো যেতে পারে যে, প্রশিক্ষণ প্যারেডে এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত সৈনিকরা বিউগলের আওয়াজ শোনে চোখের পলকে একত্র হয়ে যায়। জ্বি হ্যা, এই সামরিক বিউগলের চেয়ে ইসরাফীল আলাইহিস সালামের সিঙ্গার বাশি একেবারেও কম বা নিম্নস্তরের নয়। এমনিভাবে যে রূহ স্থায়ী জগতের বিভিন্ন দিকে এবং কোণায় কোণায় লুক্কায়িত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। যেগুলো اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ এর মত অনাদিকালের গভীর থেকে আসা হৃদয়ছোঁয়া আওয়াজের জবাব قَالُوا بَلٰى দ্বারা দিয়েছিল যে এসকল রূহের আনুগত্য ও নির্দেশ পালন এবং এদের নিয়ম,শৃঙ্খলা যে কোনো সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য থেকে হাজারো গুণ বেশি মাত্রায় বাস্তব। “তেইশতম” রচনায় সর্বোচ্চ শক্ত দলিল-প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে , শুধু রূহ-আত্মাসমূহই আল্লাহর আনুগত্য করে না; বরং জগতের অণু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁর ফরমাবরদার এবং তারা কোমর বাঁধা সৈনিকের ন্যায় সদাপ্রস্তুত রয়েছে। দ্বিতীয় মাসআলা : দেহগুলিকে জীবিত করা। যেমনিভাবে বিশাল এক শহরে রাজকীয় উৎসব পর্বে রাতের বেলায় লাখ লাখ বৈদ্যুতিক বাতিকে পাওয়ারহাউজে স্থাপিত সুইচের সাহায্যে এক মুহুর্তের মধ্যে আলোকিত করে ফেলা সম্ভব। ঠিক তেমনিভাবে কোটি কোটি প্রাণীর জীবন-প্রদীপকে একই কেন্দ্র থেকে আ লোকিত করে ভূপৃষ্ঠের উপর এনে দাঁড় করা নো সম্ভব। যে বিদ্যুৎ আল্লাহ তাআলার এক মাখলুক এবং তাঁর এই মেহমানখানায় আলো ব্যবস্থাপনার সেবা দিতে আদিষ্ট। সেই বিদ্যুতের মাঝে যখন এই বৈশিষ্ট্য আর শক্তি পাওয়া যায় যে , সে তার স্রষ্টা ও মালিকের পক্ষ থেকে পাওয়া শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা এবং দি কনির্দেশনার আ লোকে স্বীয় ডিউটি পালন করে যায়। সুতরাং এটাও তাহলে অবশ্যম্ভাবী প্রমাণ হলো যে, বড় হাশর’ও আল্লাহর সে সকল সুশৃঙ্খল নীতিমালার আ লোকে চোখের পলকেই

প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যে সকল নীতিমালার আ লোকে কাজ করার নমুনা বিদ্যুতের মত লা খো সেবক আঞ্জাম দিয়ে চলেছে।

তৃতীয় মাসআলা : দেহগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন করে তৈরি করতঃ বিশ্বজগতে বৃক্ষ ও চারার সংখ্যা মানব আবাদির চেয়ে হাজারো গুণ বেশি। বসন্ত ঋতুতে এ সকল বৃক্ষ ও তার ফল-পাতা মাত্র কয়েক দিনেই এক দফায় নিজের সেই পূর্ণ আকার-অবয়ব ও বেশ-ভূষায় ফিরে আসে, বিগত বসন্তে সে যে আবয়ব ও বেশ-ভূষায় ছিল। এমনিভাবে সেই বৃক্ষ ও চারাগাছের ফল , ফুল এবং পাতা চোখের পলকে বিলকুল সেই ঢং ও অবস্থায় চলে আসে, বিগত বসন্তে সে যে অবস্থায় ছিল। একই অবস্থা বীজ-বীচির। যেগুলোর সংখ্যা অগণিত। বসন্ত ঋতু আসতেই এ সবই গভীর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে একই মুহূর্তে প্রকাশিত হয়ে স্বীয় অস্তিত্বের জানান দেয় । একই অবস্থা বৃক্ষরাজির কাণ্ড-ডালপালারও। যা হেমন্তের দপনার শিকার হয়ে ফল-পাতাশূন্য হয়ে যায়। আবার কুম বিইযনিল্লাহ'র নির্দেশ পেতেই তা ফল , ফুল ও পাতায় সু শোভিত হয়ে ওঠে। একই অবস্থা চতুষ্পদ প্রাণীরও যার রয়েছে অগনিত সঙ্খ্যা ও প্রকার। এরা সবাই স্বীয় সুক্ষ, গভীর ও শক্ত শিল্প-সৃষ্টিসহ ভূপৃষ্ঠে লম্ফঝম্ফ ও আনন্দ-ফুর্তি করে বেড়ায়। একই অবস্থা পোকামাকড় ও অন্যান্য ভূমি-পতঙ্গেরও।

বিশেষতঃ মাছির অস্তিত্ব লক্ষণীয়। সে সর্বদা আমাদের চোখের সামনেই থাকে। অনবরত স্বীয় হাত , চোখ ও পাখা মুদতে মুদতে আমাদের চেহারার উপর বসে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। নিজের স্টাইলিশ পয়-পরিষ্কারের মাধ্যমে আমাদের ওযু এবং পরিচ্ছন্নতা স্বরণ করিয়ে দেয়। মাত্র এক বছরে এত সংখ্যক মাছির জন্ম হয় যা 'দম সে আ-দম' তথা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে সহ এ সময় পর্যন্ত মানবজাতির সামষ্টিক সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। এখন অন্যান্য ভুমি-পতঙ্গের সাথে সাথে এক মাছিকে বসন্তকালে নতুন করে অল্প কয়েক দিনেই জীবিত করা এবং উত্থান ঘটা নো, কেয়ামত দিবসে মানবদেহকে জীবিত করে উ থ্যিত করার ব্যাপারে একটি নয়; হাজারো উপমা বুঝিয়ে দেয়। হ্যা , যেহেতু এই দুনিয়া "দারুল হিকমাহ আর পরকাল "দারুল কুদরত" সেহেতু দুনিয়ায় বস্তুনিচয় সৃষ্টির ব্যাপারে কিছুটা পর্যায়ক্রমিক ধারা ও সময় নেয়া প্র য়জন। কেননা আল্লাহর হাকীম, মুরাত্তিব, মুদাব্বির এবং মুরাব্বী জাতীয় অধিকাংশ সম্মনিত নামের মাঝে পাওয়া প্রজ্ঞা 'র আবেদনও তাই। কিন্তু পরকালের ব্যা পার যদি দেখা হয় , তবে "হেকমত"এর তুলনায় "রহমত" এবং "কুদরত"এরই বেশি ও পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী হবে। এইজন্য ওই জগতে বস্তুর সৃষ্টির জন্য যুগ-যামানা য়, সময়, মূলধাতু এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হবে না। সেখানে প্রতিটি বস্তু কোনো মূলধাতু এবং সময় নেয়া ছাড়াই এক মুহূর্তের মাঝে তৈরি হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের আয়াত- وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ, এতে ঐ বিষয়েরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে জিনিস এই দুনিয়ায় এক দিন অথবা এক বছরে তৈরি হয় আখেরাতে তা এক মুহূর্তে শুধু চোখের পলক ফেলার সময়ের মাঝেই তৈরি হয়ে যাবে । তুমি যদি 'হাশর' বিষয়ে এটা জানতে চাও যে, তার আগমন এমনই অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় যেমনটি আসন্ন বসন্ত ঋতু। তবে এ ব্যাপারে আমার দেয়া সেই বিস্তারিত আলোচনা গভীর দৃষ্টি দিয়ে পড়ে নাও যা আমার লেখা "মাকালাত" গ্রন্থের দশম রচনা এবং উনত্রিশতম রচনায় বিবৃত হয়েছে। যদি এই বিস্তারিত আলোচনা পড়ার তুমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হও। অর্থাৎ , হাশর' সংঘটিত হওয়া ঠিক তেমনই অকাট্য , অলঙ্ঘনীয় এবং নিশ্চিত ; আসন্ন বসন্ত ঋ তু যেমনটি অকাট্য, অলঙ্ঘনীয় এবং নিশ্চিত। তাহলে নিশ্চয় তুমি আমার চোখ ফুড়ে দেবে।

চতুর্থ মাসআলা : দুনিয়ার মৃত্যু এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়া । বিষয়টি এই উদাহরণ দ্বারা বুঝে নাও! যদি কোনো নক্ষত্র বা লেজ বিশিষ্ট উল্কা আল্লাহর নির্দেশে এই জমিনের সাথে টক্কর খায় , যে যমীন আমাদের মেহমানখানা, বসবাস ও আশ্রয়স্থল, তাহলে এই জমিন ঠিক এক মুহূর্তেই এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেমন দশ বছর ধরে বাননো প্রাসাদ এক মিনেটেই ধ্বংস হয়ে যায় ।

পরিশিষ্টের চতুর্থ কথা

قَالَ مَنْ يُحْيِى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِى اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ *

"সে বলে যে, পঁচে গলে যাওয়ার পরও এই হাড্ডিগু লোকে কে জীবিত করবে? আপনি বলে দিন যে, সেই আল্লাহ এগু লো জীবিত করবেন যিনি এগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত -সূরা ইয়াসীন : ৭৮-৭৯।" (সোজলার ১১২)

এসো! আমরা কিছু সময় সভ্যতার দাবিদার মানুষগু লোর প্রতি লক্ষ্য করি । চল দেখি তারা কীভাবে জীবনযাপন করছে। এদিকে তাকাও, দেখ এখানে প্রতিটি কোণায় কোণায় সি সি ক্যামেরা লাগা নো আছে। কোন কিছুই এ ক্যামেরা থেকে গোপন থাকছে না। এখানে প্রতিটি কোণায় এমন লেখক আর সাংবাদিকরা কলম নিয়ে বসে আছেন , যারা ছোট থেকে ছোট প্রতিটি বিষয়কে তৎক্ষণাৎ লিখে রাখছেন। সামান্য থেকে সামান্য বিষয়ের রেকর্ডও তাদের কাছে আছে।এই সর্বউচ্চ পর্যায়ের গুরুত্ব প্রদান, ছোট-খাটো সমস্ত বিষয়াবলির রেকর্ড, নিঃসন্দেহে এর পিছনে একজন সূক্ষ্ম পর্যায়ের বিচারক রয়েছেন। সুতরাং এটা কীভাবে সম্ভব যে, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বাবধায়ক, আদেশদাতা যিনি নিজের প্রজাদের মধ্য হতে কোন সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীর সামান্য থেকে সামান্য লেনদেনের বিষয়টি দৃষ্টির অ গোচরে রাখেন না, তিনি তাঁর প্রজাদের মাঝে বড় থেকে বড় যারা তাদের লেনদেনের রেকর্ড সংরক্ষিত রাখবেন না , তাদের হিসাব নেবেন না, তাদের কৃতকর্মের সাজা দেবেন না? অতএব, যে সব কৃতকর্মে তারা লিপ্ত হয়, তা মহান সম্মানের অধিকারী রা ব্বুল আলামীনের প্রতি বেআদবি, তার মহানুভবতা, বড়ত্বের জন্য চ্যালেঞ্জ ও ধৃষ্টতা হিসেবে বিবেচিত এবং পৃথিবীব্যাপী তাঁর সর্বময় রহমতকে অস্বীকার করার নামান্তর নয় কি ? যেহেতু এখানে অনেকে নিজের কৃতকর্মের সাজা থেকে বেঁচে যায় , তাই বলা যায় আবশ্যই তাদের ঐ সমস্ত গোনাহের সাজা একটি বড় আদালতে হবেই। (সোজলার ৫৩)

প্রশ্ন- কেয়ামতের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘটনাবলিতে বাকী থাকা রুহ সমূহ কি প্রভাবান্বিত হবে?

প্রত্যেক রুহ তার ধাপ অনুসারে প্রভাবিত হবে। ফিরিস্তাদের তাজাল্লিয়াতে-কাহরিয়ায় (বলপূর্বক ও বাদ্যতামুলক তজল্লি) তাদের নিজেদের বিবেচনায় প্রভাবিত হওয়ার ন্যায় স্থায়ী রুহ সমূহ ও প্রভাবান্বিত হবে। যেমনটি কোন মানুষ যখন কোন গরম স্থানে অবস্থান করে, বাহিরে স্নো এবং তুষারঝটিকায় কাঁপছে এমন কাওকে যদি দেখতে পায় তাহলে বোধ শক্তি ও দেহের বিবেচনায় ঠাণ্ডার ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়। একই ভাবে প্রানবাহি বাকী থাকা রুহ সমূহ, দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ধরুন, কায়েনাতের সবচেয়ে বড় ঘটনাবলীর থেকে কেয়ামত একটি হওয়ার কারনে স্তর অনুযায়ী প্রভাবিত হওয়াটা; শাস্তির যোগ্য হলে কষ্টকর অবস্থানে, আর উত্তম প্রতিদানের যোগ্য হলে শান্তির অবস্থানে, বিস্মিত হওয়ার অবস্থানে, এমনকি সুসংবাদি হওয়ার অবস্থানে প্রভাব সমুহকে অর্জন করাটা, কোরআনের ইঙ্গিত সমূহ প্রমান করচ্ছে। যেমন কোরআন সব সময় ধমকের সুরে বলতেই আছে যে "তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে" অধিকন্তু মানবের দেহের সাথে এমন অবস্থার দর্শনকারীরা, কেয়ামতে পৌঁছাবে। অর্থাৎ কবরের জগতে দেহ সমুহের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া রুহ সমূহেরও ঐ কোরআনি ধমক সমুহের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

প্রশ্ন- আলোচ্য كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ আয়াতের ধ্বংসলীলার সাথে; আখেরাতের, জান্নাতের, জাহান্নামের, এবং তার বাসিন্দাদের কোন অংশিদারিত্ত আছে কি?

উত্তর- আলোচ্য মাসআলা অসংখ্য বিশ্লেষক মুহাক্কিক ও আহলে কাশফ ও অলিদের আলোচিত এক মাসআলা। এই বিষয়ের ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা তাদের-ই কথার মধ্যে। আবার এই আয়াতের মাঝে অনেক প্রশস্থতা ও মর্তবা সমূহ

বিদ্যমান রয়েছে। মুহাক্কিক গনের সংখ্যাঘরিষ্ট এক দল বলেছেন যেঃ আলোচ্য আয়াতের সাথে আলমে-বেকা (চিরস্থায়ী জগতের) কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। অন্য দল বলেছেনঃ মুহূর্তের জন্য অতি অল্প সময়ের জন্য তারা তথা মাখলুকাত ধ্বংস হবে। এটা এতটাই অল্প সময় যে, নিঃশেষ হয়ে আবার অস্থিত্তে আসবে কিন্তু অনুভবই করতে পারবেনা। কিন্তু এই ব্যাপারে কতক চরমপন্থী ধ্যানকারীদের ন্যায় যদি ফেনায়ে-মুতলাক (একেবারে নিঃশেষ হওয়া) বিবেচনা করা হয়, তাহলে এটা মৌলিক তত্ত নহে। তার কারণ হলঃ যেহেতু মহান পবিত্র ইলাহি স্বত্বা হলেন, চিরন্তন ও শাশ্বত; নিঃসন্দেহে তার সিফাত ও নাম সমূহ ও অমর। আর যেহেতু তার গুণ ও নাম সমূহ চিরন্তন ও শাশ্বত; তাহলে অবশ্যই এগুলোর আয়না ও জালওয়া সমূহ ও এবং কারুকার্য নকশা সমূহ এমনকি এগুলোর আত্মপ্রকাশকারী হওয়া চিরস্থায়ী জগতের বাকিয়াত (স্থায়িত্ত) ও আহলে বেকা যারা তারা ফেনায়ে-মুতালাকে (একেবারে নিঃশেষ হওয়া) যেতে বাদ্য নহে, যেতে পারেনা। (মাক্তুবাত ৫৯)।

গুনাহ

প্রশ্নের উত্তর হল- কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান কিভাবে সচল থাকে ?

মানুষের প্রবৃত্তি উপস্থিৎ ও দৃশ্যমান এক দিরহাম স্বাদ ও মজাকে প্রাধান্য দেয়, তার বিপরীত অদৃশ্যমান ও ভবিষ্যতে হবে এমন বিশাল রকমের ফূর্তি আনন্দকে অগ্রাধিকার দেয় না। একিভাবে উপস্থিৎ একটি চড় খাওয়া থেকে ভয় করে, কিন্তু সামনে আগত এক বছরের শাস্তি থেকে ভয় করে না। একইভাবে যদি মানুষের মধ্যে তার আবেগ বা চাহিদা প্রভাব বিস্তারকারী কোন বিষয় হলে, তখন আর বুদ্ধিদীপ্ত কোন কথা আর শুনতে চায় না। খাহেশাত ও কল্পনা তার উপর হুকুম প্রতিষ্ঠিত করত: একেবারে নিম্নমানের রিপুর চাহিদা এবং একেবারে প্রয়োজনহীন কোন আনন্দ ফুর্তির প্রতি ধাবিত হয়, চাই ভবিষ্যতে আরও বিশাল আকারধারী কোন সুখ আনন্দ আসুকনা কেন ঐ দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। এবং অতি স্বল্প পরিমাপক কোন সমস্যা থেকে দূরে থাকে যে, আগামীতে আগত যত বড় বিপদই আসুক তাতে কর্ণপাত করতে চায় না। তার কারণ হল- কল্পনা ও খাহেশাত এবং অনুভূতি প্রবণ প্রবৃত্তি ভবিষ্যকে দেখে না, এমনকি তাহা অস্বীকার করে। এখানে তার নফসের অন্য অংশ যদি বুঝাতে চায়ও কিন্তু এই মুহুর্তে ঈমানের কেন্দ্রস্থল হওয়া কলব ও আকল চুপ থাকে, এভাবে মন্দের প্রবৃত্তি গুলো বিজয় লাভ করে।

এমতাবস্থায়, কবিরা গুনাহ করাটা ঈমানহীনতা থেকে সংঘটিত হয় না বরং কল্পনা, রুচি ও প্রবৃত্তি এবং খাহেশাত থেকে আগত হওয়ার ধরুন আকল ও ক্বলব পরাজয়ের কারণ হিসেবে সাব্যস্থ হয়।

একিইভাবে, পূর্বোল্লেখীত ইশারা সমূহে আলোচিত হওয়ার ন্যায় এটা পরিষ্কার যে, ভ্রষ্টতা ও খাহেশাতের পথ ধ্বংশাত্মক হওয়ার কারণে এই পথ অতি সহজতর। শয়তান রুপী মানুষ ও জ্বীন অতি দ্রুত মানুষকে ঐ পথে সঞ্চারিত করে।

অত্যন্ত নিরাশাময় একটি অবস্থা যে, চিরস্থায়ী জীন্দেগীর ব্যাপারে হাদিসের অকাট্য ভাষা হল মশার ডানার ন্যায় ক্ষুদ্র এক নূর,এটা চিরস্থায়ী হওয়ার কারণে একজন মানুষের সারাটি জীবনে আস্বাদিত মজা ও স্বাদ এবং নেয়ামতের ঠিক বিপরীত তুলনার অবস্থায় কিছু মানুষ চিরস্থায়ী, অনন্তকালের স্বাদ সমূহের বিপরীত দুনিয়ার এই মশার ডানাতুল্য স্বাধের যোগ্য নহে। এমন উপভোগ্যের পিছনে পরে শয়তানের পিছনে ঘুরপাক খাচ্ছে, তার অনুসরণ করছে। অতএব, এই রহস্যের ভিতরকার সুক্ষতা এই যে, কোরআনে কারীম মু'মীনদেরকে

অসংখ্যবার ও চাপ প্রয়োগের ন্যায় ধমক ও উৎসাহ এর সাথে গুনাহ থেকে সতর্কবার্তা ও উত্তম পথে আহ্বান করছে। (লামা'লার ৭৬)

রেওয়ায়েত আছে যেঃ " শেষ যামানা ঐ পরিমাণ ধ্বংসাত্মক হবে যে, কোন লোক-ই স্বীয় নফসের উপর অভিবাকত্ত, খবরদারী করতে পারবেনা" এই কারনেই তের শত বছর সময় কালে ও পয়গাম্বরের হুকুমের সাহায্যে সমস্ত উম্মত ঐ ফিতনা থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাওয়াতে ক্রুটি করেন নাই। এবং দোয়ার ধারাবাহিকতায় কবরের আযাবের পানাহের পর পরই "মিন ফিত্নাতেদ্দাজ্জাল ওয়া মিন ফিত্নাতে আখিরিযযামান" এই উম্মাতের দোয়া হয়ে আসছে।

আল্লাহ্‌র কাছে সোয়াব প্রদানের ইলিম বিদ্যমান, এই বিষয়টার একটি ব্যাখ্যা হল এই যে, ঐ ফিতনা সমূহকে প্রত্যেকটি নফস নিজে নিজেই ভোগ করবে, তার বিস্তার ঘটাবে। মানব-সকল স্বীয় ইচ্ছায়, এমনকি রুচি-চাহিদার মাধ্যমে এই অশ্লীল কর্ম কান্ডকে বাস্তবে নিয়ে আসবে। উদাহারন স্বরূপঃ রাশিয়াতে নারী-পুরুষ একসাথে উলঙ্গ অবস্থায় (বড় যৌথ বাথরুমে) প্রবেশ করে এবং নারীরা তারা স্বীয় সৌন্দর্যতাকে প্রদর্শন করে যাতে করে তাদের প্রতি প্রেমাকাংক্ষি ভাব তৈরি করে ঝোঁক আকর্ষিত করে তারা ফিতনাকে আরও উত্তেজিত করে সম্মুখে ছেড়ে রাখে, ফলে স্বভাবজাত অশালীন সুন্দরের পাগল যুবকেরাও, স্বীয় নফসের কাছে হেরে গিয়ে ঐ অগ্নিতে পাগলপারা হয়ে নিজেদেরকে আনন্দের সাথে নিক্ষেপ করে, নিজেদেরকে জ্বালিয়ে চুরমাড় করে। তথাপি ডান্স ও তিয়েটারের ন্যায় ঐ যামানার নারীপুরুষ উলঙ্গপনার খেলায় এবং মারাত্মক কবিরা ও নতুন বেহায়াপনাকে, একেকটি অশ্লীল খাহেসাতের সাথে ফ্যানের ন্যায় মনোবাসনা মুখীদের আশপাশে তারা একত্রিত হয়, বেহায়াময় নষ্টামিতে ব্যাস্থ থাকে। হায় যদি এমনটি না হতো, সততার পথে কঠোর আইন হলে এমন ইচ্ছা ও থাকত না, গুনাহ ও স্থাপিত হতো না। (শুয়া'লার ৫৮৪)

আগত পূর্ব সচেতনকারী একটি মাসআ'লাঃ

রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আখের যামানায় এক ব্যাক্তির ভুলক্রুটির ও গুনাহের কারনে আত্যান্ত ধ্বংসযজ্ঞ অবস্থার রুপ ধারন করবে। পূর্বকালে প্রশ্নের অংশ ছিল, " আসলে এটা কি কোন সাধারণ ব্যাক্তির দ্বারা, হাজার হাজার লোকের সমপরিমাণ গুনাহ করা সম্ভব"? এবং শেষ জামানায়, আমাদের অবগত হওয়া গুনাহের বাহিরে আর কি-ই বা গুনাহ রয়েছে যে, যে পাপগুলো সকল গুনাহকে একত্রে করবে, এমনকি কেয়ামতের সংঘটনের ক্ষেত্রে ও দুনিয়ার মাথা থেকে নীচ পর্যন্ত ধবংস হওয়ার জন্যে মাধ্যম হবে? এভাবে চিন্তা করলাম। আর এই যামানায় তার অসংখ্য কারণ সমূহ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমার রেডিও এর দ্বারা (বর্তমান ইন্টারনেট) অসংখ্য দিক বিবেচনায় এটা পরিস্কার যেঃ উল্লেখিত ঐ একটি মাত্র লোক একটি মাত্র অশ্লীল কথার দ্বারা এক কুটি সমতুল্য কবিরা গুনাহকে মুহূর্তের মধ্যে করতে পারে, কুটি কুটি মানুষকে এই কথা শ্রবণ করিয়ে গুনাহে অন্তর্ভুক্ত করে। হাঁ, বাতাসের বাতাবরণে উচ্চারণ কারী লাখ কুটি শব্দ সমুহকে এবং এক ভাষা নামীয় মাধ্যম হওয়া রেডিও এর বর্ণ উপাদান যে মানব জাতির জন্যে এমন এক এলাহির নেয়ামত যে, বায়ুমণ্ডলকে যেখানে এলাহির শুকরিয়া ও প্রশংসার অনুদের দ্বারা পূর্ণ করার কথা সেখানে পথভ্রষ্টতা থেকে আগত মানব সৃষ্ট নির্লজ্জতা, ঐ মহান নেয়ামতের কৃতজ্ঞতার ঠিক বিপরীত ব্যাবহার করার কারনে সন্দেহাতীত এই মানবতা চড় খাবে-ই খাবে যেমনটি সভ্যতার সাজ-সরঞ্জাম নামীয় এলাহির অনুগ্রহ সমুহকে, এই মাথাহীন, নির্লজ্জ, গাদ্দার, সভ্যতা উদ্ভাবিত টেকনোলোজি বস্তু সমুহকে এলাহির কৃতজ্ঞতায় ব্যাবহার না করে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যাবহার করে নেয়ামতের কুফুরি করার কারনে এমন এক চড় খেয়েছে যে, যার কারনে তারা সামগ্রিক সাদাতে-আবাদিয়া (চির

শান্তির জীবন) থেকে মাহরুম হয়েছে। এবং সর্ব উচ্চ সভ্যতায় উন্নীতকারী মানুষদেরকে সর্ব নিম্ন ও জানোয়ারদের থেকে আরও নীচে নিমজ্জিত করেছে। জাহান্নামে যাওয়ার পূর্বে জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন করাচ্ছে।

হাঁ , রেডিও এর সার্বজনীন নেয়ামতের দিকে দেখলে, সামগ্রিক এক কৃতজ্ঞতার দাবি রাখে। এবং ঐ ব্যাপক কৃতজ্ঞতা ও মহান আসমান জমিনের মালিকের শাশ্বত কালামকে উপস্থিত শ্রোতাদেরকে এক মুহূর্তে শুনানোর লক্ষে, সার্বজনীন লক্ষ ভাষা ও আসমানি বাণীর এক হাফিজের তেলাওয়াতের উচ্ছারনে, সকল সময় এই দুনিয়াতে কোরআন পড়া আবশ্যকীয়। যাতে করে সামগ্রিক নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় হয় এবং নেয়ামতের ধাঁরা চলতে থাকে। (কাস্তামুনু ৭২)

আমার প্রানপ্রিয়, সত্যবাদী বন্দুগন,

আমি চিন্তা করলাম যে, বর্তমান যুগে কুরআনে হাকিমের দৃষ্টিতে, ঈমানের পরে সব চেয়ে বেশী ভিত্তি প্রতিষ্টামুলক ব্যাপার হল তাকওয়া ও আ'মালে-সালিহ। তাকওয়ার সারকথা হল বারণকৃত কর্ম ও গুনাহ সমূহ থেকে নিজেকে হেফাজত করা। আর আ'মালে-সালিহ হল হুকুমকৃত গণ্ডির ভিতরে অবস্থান করে উত্তম কৃতকর্মে প্রতিযোগী হওয়া, অর্জন করা। সর্বক্ষেত্রে মন্দকে দূরে রেখে উত্তম পন্থাকে প্রাধান্য দেয়ার পাশাপাশি; এই নির্লজ্জতার, ধ্বংসাত্মক, অনিষ্ট আকর্ষণে আকৃষ্টকারী যামানায় এই তাকওয়া নামী নুরান্বিত শক্তি দ্বারা, ফিতনা ফেসাদের এবং বড় বড় গুনাহের থেকে মুক্ত হয়ে মজবুত এক খুঁটির সর্ব উচ্চমানের আসনে সমাসিন হওয়া বুঝায়। এই যামানায় বিধ্বংসীতা ও অনৈতিক বাতাস আক্রমণাত্মক ভাবে সয়লাব করার কারনে তাকওয়া হল এই বিনাশী সাধনের বিরুদ্দে সব চেয়ে বড় ভিত্তি। যে ফরজ সমুহকে আদায় করে, কবিরা পাপাচার থেকে মুক্ত থাকে, সেই নিজেকে বাচাল। এরকম বিশাল কবিরা গুনাহের ময়দানে আ'মালে-সালিহার এখলাছের সাথে সফলতা অত্যান্ত বিরল। অথচ অল্প এক আ'মলে সালিহ এই ভয়াবহ শর্ত সমূহের সম্মুখে সম্পাদন অনেক মূল্যবান গুরুত্ত বহন করে। একিভাবে, তাকওয়ার মধ্যে বিদ্যমান আছে এক নিরঙ্কুশ আ'মালে-সালিহা। কারণ কোন এক হারামকে তরক করা ওয়াজিব। আর কোন ওয়াজিবকে সম্পাদন করা হল, অনেক সাধারণ সুন্নাতের সোয়াব অর্জন করা। তাই তাকওয়া এরকম যামানায়, হাজার হাজার গুনাহের আক্রমনের সম্মুখে একবারের পরিহার ও বর্জন, অল্প আমল, যা শত শত গুনাহকে তরক করা ও অনেক ওয়াজিবকে আমল করার পর্যায় অস্থিত্তবান হয়। এই তাৎপর্যময় কথাকে নিয়তে ও আমলে এনে, তাকওয়ার নামে এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকার ইচ্ছানুসারে নিশেদকৃত কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকার এক নাম হল আ'মালে –সালিহ। রিসালে-নুরের বন্দুদের এই যামানায় সব চেয়ে বড় দায়িত্ত হল এই ধ্বংসাত্মক ও পাপাচারিতার বিপরীত তাকওয়াকে ভিত্তি বানিয়ে জীবন সায়াহ্নে যাপন একান্ত আবশ্যকীয়।

যেহেতু প্রত্যেক মিনিটে, এখনকার সামাজিক জীবনের রীতিনীতি হল শত গুনাহ মানুষের সম্মুখে এসে তাহাকে ডাকছে ; এমন পন্থার বিপরীতে তাকওয়ার সাথে বিরত থাকা মানে হল শত খানেক আ'মালে-সালিহকে বাস্তবে চর্চা করার তুল্য। জানা কথা যে; একজন লোকের একদিনে ধবংস করা প্রাসাদ, বিশজন লোক বিশ দিনে ঐ প্রাসাদকে আবার বানানো অসম্ভব, তারি সাথে যেখানে একজন লোকের কোন বিনাশ সাধনের বিপরীতে বিশ জন লোক সেখানে কাজ করার প্রয়োজন হবে; এখন যেখানে হাজার হাজার লোক এমন বিনাশের কাজে ব্যাস্থ তাদের বিপরীতে, রিসালে-নুর এর ন্যায় একজন জীবন মেরামতকারী যার প্রচেষ্টা ও প্রভাব নিঃসন্দেহে আকস্মিক ব্যাপার বৈ অন্য কিছু নহে। এখন যদি এই পরস্পর মিলিত দুই শক্তি তাকওয়া ও আ'মালে-সালিহা একসাথে এক লেবেলে কাজ করে তখন এই প্রাসাদ হোক আর বিনাশী ব্যাপার হোক অলৌকিকভাবে ঐক্যতার নিরিখে এবং বিজয়ের সহজলভ্য পন্থায় তা ফুটিয়ে ওটার কথা।

মোদ্দাকথাঃ সামাজিক জীবনকে পরিচালনাকারী একান্ত ভিত্তি হল সম্মান প্রদান এবং দয়া প্রদর্শন যা অতি মাত্রায় প্রকম্পনকারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যন্ত্রনা ও বেচারা বয়স্কদের এবং মাতাপিতা সম্পর্কে এই হুরমাত ও মারহামাত আক্রমনাত্মক ফলাফল প্রদান করচ্ছে। মহান ইজ্জতের শুকুর আদায় করি যে, রিসালে-নুর এই বিস্ময়কর বিনাশী কর্ম কান্ডের বিপরীতে প্রতিরোধ সংগ্রাম মজবুতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, মেরামতে সফল হচ্ছে। যিল্কারনাইনের প্রাচীরের ধবংস হওয়ার পর ইয়া'জুজ ম'জুজের দুনিয়েতে ফেসাদ সয়লাব করার ন্যায়; মুহাম্মদি শরীয়ত নামী কুরআনী প্রাচীরের কম্পনের দ্বারা, ইয়া'জুজ ম'জুজ থেকে আরও আশ্চর্যময় পন্থায়, আখলাকে ও জীবনের অন্দকারাচ্ছন্ন এক নৈরাজ্য ও অরাজকতাপূর্ণ ধর্মহীনতার ফেসাদের বিপরীত সমাধানের পথ সুগম হচ্ছে। রেসালে-নুর সুহৃদগন, এমন পর্যায়ের পরিস্থিতির মধ্যে তাদের আধ্যাত্মিক মুজাহাদার মাধ্যমে, ইনশা-আল্লাহ্‌ সাহাবিদের যামানার ন্যায় অল্প আমলের দ্বারা, অতুলনীয় বড় মাপের সোয়াব এবং আ'মালে-সালিহার অর্জনের উসিলা হবে।

আমার সুপ্রিয় সুহৃদগন! সুতরাং এরকম এক যামানায়, এরকম এক বিধ্বংসীমূলক বিপদের বৈপরিত্তে, আমাদের এখলাসের শক্তি ব্যাবহারের পর সব চেয়ে বড় শক্তি হল, একে অপরের সাথে পরকালিন আমলের অংশিদারিত্তের বিধান চর্চার সাথে একে অপরকে কলমের দ্বারা, প্রত্যেকের আ'মালে-সালিহার উৎকৃষ্টতাকে খাতায় লেখানোর ন্যায়; মুখের মুলায়েম ভাষায়, আমাদের প্রত্যেকের তাকওয়ার দুর্গে এবং রাজপ্রাসাদে শক্তি ও সাহায্য পৌঁছানো আবশ্যকীয়। এবং বিশেষ করে ঝড়ের আঘাতের উদ্দেশ্য হওয়া আপনাদের এই দরিদ্র ও অক্ষম ভাইয়ের জন্যে, এই পবিত্র তিন মাসে এবং বিশেষ পবিত্র দিন সমুহে আপনাদের দোয়ায় ভুলে না যাওয়া, আপনাদের ন্যায় মুজাহিদ, জীবন কোরবানি, দয়াপ্রবন ভাইদের শান। অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদের আধ্যাত্মিক সহযোগিতার জন্যে আরজু নিবেদন করছি। এবং আমিও ঈমান ও সাদাকাতের, সত্যবাদিতার সাথে, সমস্ত রিসালে-নূর সুহৃদগণের জন্যে সকল দোয়ায় ও আধ্যাত্মিক অর্জনে, চব্বিশ ঘণ্টা, ইশ্তেরাকে-আ'মালে-উখ্রাবিয়ার নীতির সাথে, মাঝে মাঝে শত বারের চেয়ে আরও বেশী সমগ্র রিসালে-নুর সুহৃদগণের জন্যে উৎসর্গ করচ্ছি। (কাস্তামুনু ১৪৮)

মওত / মৃত্যু

কোরআনের বাহ্যিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকারী উলামাদের থেকে, তাবিয়ি'নদের যুগের সুমহান এক ইলমি সর্দার এবং হযরত আলি রাঃ এর অত্যান্ত গুরুত্তপুরক এক সুহৃদ হলেন হাসান বাসরি রাহঃ তিনি রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যাক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লামের কাছে এসে ক্রন্দনরত আবস্থায় তিব্র যন্ত্রনা বোধ করল। সে বলিলঃ " আমার ছোট একটি মেয়ে ছিল, এই পাশের খালে পরে মারা গিয়েছে, তাহাকে ওখানে নিক্ষেপ করেছি"। রাছুলে আকরাম আলাইহিচ্ছালাতু অয়াচ্ছালাম এতে দুঃখ সান্তনা দিলেন। এবং তাহাকে বলিলেন; "আসো ওখানে এক সাথে যাই" পরে তারা পৌঁছালেন। রাছুলে আকরাম আলাইহিচ্ছালাতু অয়াচ্ছালাম ঐ মৃত মেয়েকে ডাক দিলেনঃ "হে অমুক! বলে ডাক দিলেন। আচমকা ঐ মৃত মেয়ে, লাব্বাইক অয়া সা'দাইক বলিল, রাছুলে আকরাম আলাইহিচ্ছালাতু অয়াচ্ছালাম ফরমান করলেনঃ আবার তুমি তোমার পিতা-মাতার কাছে ফিরে আসতে চাও নাকি? মেয়ে বলিলঃ " না। আমি তাদের থেকে আরও ভাল অবস্থান খুজে পেয়েছি। (শিফা, কাযি আয়ায, ৩২০/১)(মাক্তুবাত ১৫৬)

প্রশ্ন- ফুরকানে-হাকিমে اَلَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا আলোচ্য আয়াতের ন্যায় অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ আছেঃ " মৃত্যু ও জীবনের ন্যায় একটি মাখলুক, সাথে সাথে একটি নেয়ামত ও বঠে"। এভাবে বলে বুঝানো হচ্ছে। অথচ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মাওত হল একটি; বিনষ্টতা, ধবংস হওয়া, নাই হয়ে যাওয়া, স্বাদকে জ্বালিয়ে বিনাশ করা, তাহলে

এটা মাখলুক বা নেয়ামত কীভাবে হবে? **উত্তর**- মৃত্যু হলঃ জীবনের দায়িত্তকর্ম থেকে মুক্তির এক পারমিশন, এক ছুটি গ্রহণ, একটি স্থানের পরিবর্তন, একটি দেহের রূপান্তর-সাধন, চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি এক আহ্বান, শাশ্বত জীবনের এক প্রারম্ভিকা, এক সূচনা। যেমনটি এই হায়াত নামী জীবন দুনিয়াতে এসেছে সৃষ্টি ও ভাগ্যের মাধ্যমে; তেমনি ও তার এই দুনিয়া থেকে যাওয়াটা, মৃত্যুটা হবে সৃষ্টি ও তাকদিরের সাথে এক হিকমত ও পদক্ষেপের প্রাপ্তির মাধ্যমে। তার কারণ হল একেবারেই স্বাভাবিক জীবন হল লতাপাতার জীবন এই তরুলতার মৃত্যুও যা জীবন থেকে আরও সুবিন্যাস্থ একটি শিল্প কারিগরির নিদর্শন হওয়াকে উপস্থাপন করে। যদিও ফলফলাদি সমূহের, বীজ সমুহের, দানা সমূহের মৃত্যু; বিলীন হওয়ার সাথে চূর্ণবিচূর্ণ ও বিস্তৃত হয়ে নাই হওয়ার অবস্থায়, অতি সুবিন্যাস্থ এক ক্যেমিকেল আচরনি এক প্রয়াস এবং ভারসাম্যপূর্ণ এক উপাদানী সংমিশ্রণ ও হিকমতপূর্ণ এক অনু সমূহের আকৃতি সম্পূরকতা থেকে সংশ্লিষ্ট হওয়া এক পিষিত ব্যাপার যে, এই দেখতে না পাওয়া বিন্যাস্থ ও কৌশলী মৃত্যু, যা কচুরিপানার জীবনের দিকে লক্ষ করলে তা ভেসে ওঠে। অর্থাৎ বীজের মৃত্যু হল, কচুরিপানার জীবনের শুরু; বরং একই জীবনের আওতাধীন হওয়ার কারনে, এই মৃত্যুও, প্রান নামী জীবনের সমতুলয়ে এটাও মাখলুক এবং সুশৃঙ্খলপুরক। একই ভাবে সজিব ফলফলাদির অথবা প্রানবাহি প্রাণী সমূহের মৃত্যু যখন মানুষের উদরে গিয়ে বাস্তবতার রুপ নেয়, মানব জীবনের বেঁচে থাকার মাধ্যমের শুরুটা হওয়ার ধরুন তাদের ঐ রকমের মৃত্যু তাদের দুনিয়ার জীবন থেকে আরও সুবিন্যাস্থ-পূর্ণ ও মখলুক বলা হয়। অতএব, একেবারে নিম্ন মানের জীবনের স্থর হওয়া তরুলতার জীবনের মৃত্যু; যদি এরকম মাখলুক, হেকমত পূর্ণ ও সুবিন্যাস্থ হয়, তাহলে জীবনের স্থরের সর্ব উচ্চ মানের জীবন হওয়া মানবের জীবনের তরে আগত মৃত্যু, কোন সন্দেহ ছাড়া ভূমির নীচে কবর হওয়াতে, একটি বীজের বাতাময়ি এক বৃক্ষ হওয়ার ন্যায়, জমিনের নীচে চলে যাওয়া একজন মানুষ ও, বারযাখের জগতে, অবশ্যই একটি চিরস্থায়ী জীবনের দানা প্রধান করার কথা। অপরদিকে মৃত্যু, যা নেয়ামত হওয়ার দৃষ্টিতে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে, তার অসংখ্য কারণ সমূহ থেকে চারটি তাৎপর্য ইঙ্গিত দিচ্ছি। প্রথমটিঃ জীবন যাপনের দায়িত্তবান মৃত্যুশয্যাগ্রস্থতা থেকে এবং জীবন অতিক্রান্ত করার ভার থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে, শততে নিরানব্বইজন প্রিয় ব্যাক্তিদের সাথে আলিঙ্গন করার লক্ষে, মৃত্যু হল আলমে-বারযাখে পৌছার এক দরজা হওয়ার দৃষ্টিতে এটা এক মূল্যবান নেয়ামত। দ্বিতীয়টিঃ সংকীর্ণ, সমস্যাপূর্ণ, আঁকাবাঁকা, কম্পনময় এই দুনিয়ার জেলখানা থেকে বের হয়ে; দ্রুত, শান্তিময়, সুখী এক চিরস্থায়ী জীবনে পদার্পণের মাধ্যমে, , মৃত্যুর উসিলায় মহান রব শাশ্বত বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করে অফুরন্ত নেয়ামতের আসনে প্রবেশ করা হল আরেক নেয়ামত।

তৃতীয়টিঃ বার্ধক্যের ন্যায়, জীবনবাতিকে দুর্বিষহকারী একাদিক কারণ সমূহ রয়েছে যে; যার কারনে মৃত্যু, জীবনের অসংখ্য ক্ষেত্রে একটি নেয়ামত হিসেবে গন্য হয়। যেমনঃ তোমাকে অস্যস্থিকর কারী এমন বয়স্ক পিতামাতার রোগ-বালাই এমনকি পর্ব পুরুষরাও যদি পেরেশানির অবস্থা সমূহের সাথে এখন তারা তোমার সামনে থাকতেন; তাহলে জীবন কি মাপের ঘৃণ্যতাপূর্ণ, এবং মৃত্যু কি মাত্রার নেয়ামত হওয়াটা সহজতর ভাবে বুঝতে পারতে। একিভাবে চিন্তা করুন ঐ মাছিতুল্য প্রানিরা যারা সুন্দর সুন্দর ফুল সমূহের পাগলপারা তাদের জীবনে ঠাণ্ডার ঋতুর কঠোরতার কারনে কতইনা কষ্ট দায়ক অবস্থা আবির্ভূত হয় , , এবং তাদের মৃত্যু আগমনটা যে রহমত বুঝতে বাকী না থাকাটা পরিস্কার। চতুর্থটিঃ নিদ্রা যেমনি একটি শান্তির স্থৈর্য, এক রহমত, এক মানুষিক প্রশান্তি; বিশেষ করে বিপদ্গ্রস্থদের, জখম আক্রান্তদের, অসুস্থদের জন্যে, , একই ভাবে ঘুমের বড় ভাই মৃত্যু সেও মুসিবত গ্রস্থদের এবং যে মানুষ আত্মহত্যার প্রতি আকৃষ্ট এমন বিপদ-আপদে অধ্যুষিত ব্যাক্তিদের জন্যে মৃত্যু যতুপযুক্তভাবে এক নেয়ামত ও রহমত স্বরূপ। তবে আলাদা কথা হল যারা পথভ্রষ্ট তাদের জন্যে অসংখ্য বানী সমূহে শক্ত প্রমাণাদির সাথে উল্লেখ করার নায়ায়; তাদের মৃত্যু

হল জীবন যন্ত্রণার ন্যায় ঘৃণ্যতার চেয়ে আরও অপদস্থপুরক, শাস্তির উপরে আরও বেশী শাস্তি স্বরূপ, , যা এই আলোচনা থেকে ভিন্ন এক বিষয়। (মাক্তুবাত ৭)

"ছুম্মা ইয়ুমিতুকুম" আলোচ্য আয়াতের অংশ মৃত্যুর সার্থকতাকে আরও স্পষ্ট করে। হাঁ, মৃত্যু ও জীবনের ন্যায় একটি মাখলুক হওয়ার বিবেচনায়, মৃত্যু এটা কোন ধ্বংস হওয়া বা একেবারে বিলীন না হওয়াকে সঙ্কেত প্রধান করে। বড়জোর বলা যায় মৃত্যু রুহের দেহের আবরণ থেকে স্থান পরিবর্তনের সংশ্লিষ্ট বিষয়। একইভাবে, মানুষের মধ্যে থাকা উপস্থিত সিমটম সমূহ সীমাহীন লক্ষণ সমূহ থেকে অকাঠ্যভাবে বুঝা যায় যে, মানুষ মারা যাবার পর একটি জিনিস বাকী থাকে আর এটা হল রুহ। অর্থাৎ রুহের চিরন্তনতা এটা তার সত্ত্বাগত বোধ বা চেতনা। এই স্বত্বাগত চেতনা কোন ব্যাক্তির পাওয়া যাওয়াটা, তার জাতিসত্তায় হওয়াটা আবশ্যকীয় করার সাথে; আংশিক আবশ্যকীয়তা একটি পূর্ণাঙ্গ আবশ্যকীয়তার অস্থিত্তের আওতাভুক্ত হয়ে একটি রুপ প্রদর্শণ করে। মৃত্যুর এই ধারাবাহিকতায়, এটা হায়াত বা জীবনের ন্যায় একটি কুদরতি-মু'জিযা স্পষ্ট হয়। নতুবা ব্যাপার এমন নহে জীবনের শর্ত সমূহ না পাওয়াতে যে মৃত্যুর কারনে প্রান,রুহ বিলীন হয়ে গিয়েছে। সুতরাং মৃত্যু হল চিরস্থায়ী জীবনে পদার্পণের একটি ভুমিকা স্বরূপ; এই বিবেচনায় এটাকে নেয়ামত গণনা করা যায়। তার কারণ হল নেয়ামতের সূচনা ও একটি নেয়ামত। এতদনুসারে বিশেষণের বিশেষণ তথা ওয়াজিবের ভুমিকা ওয়াজিব স্বরূপ; হারামের প্রারম্ভিকা হারাম স্বরূপ। মৃত্যু হল, ক্ষতিকারক প্রাণীদের দ্বারা ভরপুর কোন জেলখানা থেকে বের হয়ে প্রশস্থ এক মরুভূমিতে প্রবেশকরন। এইরূপে রুহ হল, দেহের আবরণ থেকে যদি বের হয় এটা তার জন্য নাজাত স্বরূপ। মৃত্যু যদি না হতো, তাহলে ভুমন্ডল মানবজাতিকে ধারন করতে পারতোনা এবং মানব শ্রেণি অনাকাঙ্ক্ষিত পেরেশানিতে বেষ্টিত হতো। বার্ধক্যতা জনিত এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হতো কেউই শক্তি দিয়ে উটতে পারতোনা৷ তাই বাধ্য হয়ে এই মৃত্যু নামী নেয়ামতকে সবাই এক সময় পেতে চাইতে থাকে। (ইসারাতুল ইজায ১৭৯)

জেনে রেখো হে-প্রিয়! কবর হল আখেরাতের আলমের একটি খুলা দরজা৷ তার পিছন দিকটা হল রহমতের, সামন দিকটা হল আযাবের। সমস্থ দোস্ত ও ভালবাসার মানুষগুলো ঐ দরজার পিছনে দাড়িয়ে আছেন। তোমার কি তাদের সাথে মিলিত হওয়ার সময় আসে নাই? তাদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে আলিঙ্গন করার আগ্রহ কি তোমার নাই? হাঁ, সময় এসে গেছে এই দুনিয়ার বিচ্ছি নোংরামি থেকে পবিত্র হওয়ার চিত্রায়নে এক গোসল করা এখন জরুরী। নতুবা তারা তোমাকে নিয়ে মন্দ ধারনা করতে বাধ্য হবেন৷ যদি আজকে ইমাম রাব্বানি আহমদ ফারুকি রাহঃ জীবিত থেকে ভারতে কোন দাওয়াতের আহ্বান করেন, তাহলে আমি সমগ্র কষ্ট ও যন্ত্রনাকে উৎসর্গ করে তার দাওয়াতে উপস্থিত হব। এতদানুসারে, আসমানি কিতাব ইঞ্জিলে যার নাম আহমদ, তাওরাতে আহ্যাদ বা আহিয়াদ,কোরআনে মুহাম্মাদ নামীয় ব্যাক্তিত্ত দু-জাহানের এই সূর্যের কবরের পিছনের দিকে লক্ষ লক্ষ আহমদ ফারুকি বেষ্টিত করে অবস্থান করছেন। তাদের সাথে দেখা করার জন্যে কেন যে আমরা তাড়াহুড়া করচ্ছিনা। পিছনে পড়ে থাকা সন্দেহাতীত বড় ভুল ছাড়া কিছু নহে। (মাস্নাভিয়ে নুরিয়া ১২৯)

জেনে রাখো হে-প্রিয়! কোন কিছুর মুল্য গ্রহণ করার সময় আথবা প্রতিদান প্রধানের সময়কালে, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার জীবাণু খেলা করতে শুরু করে। কিন্তু বেতন নেয়ার পূর্বে কাজের বেলায় ঐ জীবাণুর মোটেই খবর থাকেনা। এমনকি অলস লোক ও পরিশ্রমীকে ভালবাসে। দুর্বল কোন লোক সবল ব্যাক্তিকে উৎসাহ, উদ্দিপনা দেখায়। কিন্তু যে কাজ করে সে এমনটি চায় যে যেন তার কাজ পাতলা হয়, কষ্ট কম হয়। আমাদের এই দুনিয়াটি ও দ্বীন-দারীর জীবনের প্রতি এবং আখেরাতের কর্ম ব্যাস্থতার প্রতি কাজ ও খেদমতের জন্যে বানানো এক কারখানা হওয়ার দৃষ্টিতে এবং ঐ কারখানার ভিতরে কৃতকর্মের ফলাফল অন্য জগতে দেখতে পাওয়ার দৃষ্টি-ভঙ্গিতে হওয়ার কারনে ইবাদাতে ঈর্ষা ও হিংসা না হওয়া

চাই। এমনটি করলে এখলাস নষ্ট হয়ে যাবে। এবং এমন প্রতিহিংসাকারী যে শুধু উৎসাহ ও উদ্দিপনা দেয় তার ন্যায় প্রতিদান লোভীর অপেক্ষার ন্যায় আমরা তুল্য হবো। সাময়িকতাকে সে চিন্তা করছে না ফলে তার কৃত উত্তম আমলকেও এখলাসের অভাবের কারনে নষ্ট করে ফেলে। কারণ সোয়াব প্রধানের কালে এবং প্রতিদান গ্রহনের কালে মানুষকে মানুষের রবের সাথে শরিক করে ফেলে এবং ব্যাক্তি তখন সৃষ্টিকুলের বিতৃষ্ণার টার্গেট হয়ে যায়। (মাস্নাবিয়ে নুরিয়া ২২৭)

কবর হচ্ছে গোমরাহীদের এবং প্রচন্ড অহংকারীদের জন্যে একটি ভয়ংকর বিপদজনক স্থান। এবং ক্রুটির মধ্যে জেলখানার ন্যায় একটি নিকৃষ্ট স্থান এবং একটি বিশাল আকারের সাপের পেটের ভিতরের ন্যায় একটি কবর যা কবরের জন্যে খোলে রাখা দরজা স্বরূপ। কিন্তু অপর দিকে আহলে কোরআন এবং ইমানদারদের জন্য এটা হল দুনিয়ার বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেয়ে চিরস্থায়ী সুখের বাগানে এবং পরীক্ষার স্থল থেকে উত্তীর্ণ হয়ে জান্নাতের বাগানে এবং জিন্দেগীর এই অশান্তি থেকে রহমানে রাহিমের রহমতের দ্বার খোলা এক দরজা স্বরূপ।

আহলে দালালাতের জন্যে যেন তার সকল বন্ধু-বান্ধবদের থেকে যন্ত্রণাময়ী এক চিরস্থায়ী বিদায়। এমনকি স্বীয় নফসের অনুসারী মিথ্যে দুনিয়ার জান্নাত থেকে পৃথক হওয়া এবং বিপদময় ও একাকীত্বের মধ্যে ভিতরের বন্ধীশালায় প্রবেশ করা স্বরূপ। চিন্তা করেন আহলে-হেদায়েতের কথা ও আহলে-কোরআনের জন্যে যারা পরকালীন দুনিয়ায় প্রবেশ করেছে এবং খুবই সন্তুষ্টিচিত্তে পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মুয়ানাকা ও দেখা সাক্ষাৎ করচ্ছে। কেবল এটা নহে তারা আসল নাগরিকত্বের উত্তরাধিকারী সূত্রে চিরস্থায়ী সফলতার স্থরে এটা তাদের জন্যে এক মাধ্যম স্বরূপ। শুধু তাই নহে এটা যেন তাদের জন্যে দুনিয়ার জেলখানা থেকে চিরস্থায়ী বাগ-বাগিচায় আহ্বান বা দাওয়াত স্বরূপ। আর এটা যেন মহান রহমান ও রহিমের পক্ষ থেকে কোন প্রতিদান বিহীন এক দায়িত্বময় অবস্থান। এবং এটা তাদের জন্যে হায়াতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তিস্বরূপ। এবং এটা উবুদিয়্যাতের এবং পরীক্ষার এক শিক্ষা ও শিক্ষণীয় সূত্রের এক মহান সংবিধান।

উপসংহারঃ যাইহোকনা কেন যদি কেহ এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার হায়াতকে যদি তার চিরস্থায়ী স্থল মনে করে তাহলে প্রত্যক্ষভাবে জান্নাতের আরাম-আয়েশ ভোগ করছে মনে হলেও সে কিন্তু প্ররোক্ষভাবে জাহান্নামে রয়েছে। আর এর বিপরীত যে-ই পরকালের চিরস্থায়ী জিন্দেগীকে মাকছাদ বানাবে সে নিঃসন্দেহে ইহ ও পরকালে চিরসুখী ও আসল জান্নাতের অধিবাসী হবে। তার আরেকটা গুণ হল দুনিয়া যে পরিমাণই কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ প্রদর্শন করূক না কেন সে কিন্তু তাহাম্মুল (ধৈর্য) বহন করে। এবং এই ধৈর্য্যের মধ্যে অবস্থান করে সে মালিকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে-------- (সোজলার ৩৮)

এই গাফলতে বেষ্টিত এবং এই সাময়িক জীবনকে স্বাদবান মনে করে এবং আখেরাতকে ভুলে, দুনিয়ার প্রতি অন্বেষণ কারী বদবখত আমার নফস! তুমি কি জানো তোমার আচরন কিসের সাথে তুলনীয়? তুমিত ঐ একটি উট পাখির ন্যায় যে শিকারিকে দেখে, সে উড়তে পারছে না; নিজেকে গুপন করার জন্যে তার মাথাকে বালির মধ্যে টুকরিয়ে লোকানোর চেষ্টা করছে, যেন শিকারি ব্যাক্তি তাহাকে দেখতে না পায়। কিন্তু তার মাথা ব্যাতিত যে বিশাল দেহটি রয়েছে তা বাহিরে রয়ে আছে, শিকারি কিন্তু ঠিকই তাহাকে দেখছে। আসলে সে তার মাথাকে বালুর ভিতরে রাখার কারনে সে ঐ শিকারিকে দেখতে পারছে না।

হে আমার নফস! নিম্নের এই উদাহারনের প্রতি ধ্যান দাও, দেখ; দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণীয় দৃষ্টিপাত, সুমিষ্ট এক স্বাদকে কীভাবে কষ্টকর এক দুর্বিষহে রূপান্তর করে। যেমনঃ এই গ্রামে (বারলায়) দুইজন লোক রয়েছে। একজনের সকল আত্মীয়স্বজন ইস্তানবুলে চলে গিয়েছে। আরামছে তারা ওখানে বাস করছে। শুধু সে-ই এখানে রয়ে গিয়েছে। সে ও ইস্তানবুলে চলে যাবে। সে ইস্তানবুলে জাওয়ার জন্যেও খুবই আগ্রহী, ওখানে যেতে ভাবছে। তার কারণ হল সে তার প্রিয়দের সাথে থাকতে চাচ্ছে। যখনই তাহাকে বল না কেন " ওখানে যাও" হেসে হসে আনন্দের সাথে সে ওখানে যাবে। অন্য দিকে দ্বিতীয় লোকটি, যার নিরান্নব্বইজন আত্মীয় এই গ্রাম থেকে চলে গিয়েছে, কিছু লোকেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আর এক অংশ আত্মীয়স্বজন যাদের সাথে না দেখা হয় না তারা তাকে চিন্তা করে এমন কিছু স্থানে বিস্তৃত হয়ে আছে। এক পেরেশানি অবস্থায় তারা ভবগুরে। এই রকম আবস্থা দ্বিতীয় লোকটির স্বজনদের গভীর বিষণ্নতায় সে চিন্তিত। এই বেচারার অবস্থা সে তার স্বজনদের না পাওয়া বেদনাকে কোন মুসাফিরের সাথে বন্দুভাবাপন্ন হয়ে এক ভারসাম্য তৈরির চেষ্টা করে সান্তনার চেষ্টায় ব্যাকুল। সে শুধু স্বজনদের না পাওয়ার যযন্ত্রনাকে ভুলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন হে আমার নফস! প্রথমে হাবিবুল্লাহ, এবং সকল প্রিয়রা, কবরের অপর পার্শে তারা সবাই অবস্থানরত আছেন। আর যারা এক-দুইজন জীবিত রয়েছেন তারা ও চলে যাচ্ছেন। সুতরাং তুমি মৃত্যু থেকে পলায়ন করে, কবর থেকে ভয় পেয়ে তুমার মাথাকে খামকা ঘুরিয়না। সৎ-সাহসী পুরুষের ন্যায় থাকাও, শুন কবর তুমার থেকে কি চাচ্ছে। ভীতিহীন ভাবে মৃত্যুর দিকে থাকিয়ে হাস, দেখ কি চায়। খবরদার গাফিল হয়ে দ্বিতীয় লোকটির মতো হয়ো না।

হে আমার নফস! এটা বলনা যে " যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে, আধুনিক কালে আমরা আছি, সকলেই দুনিয়ায় ব্যাস্থ, মজা নিচ্ছে। টাকাকড়ি ও জীবন জীবিকায় সবাই ব্যাপৃত, পাগল-পারা"। কিন্তু মনে রেখো মৃত্যু পরিবর্তন হচ্ছে না। সব সময়ের মতো দুনিয়া ত্যাগ করা কিন্তু সচল রয়েছে। মানুষের অক্ষমতা, দরিদ্রতা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। শুধু বেড়েই চলেছে। মানুষের যাত্রা কিন্তু চলতেই আছে, এমন অবস্থার দ্রুতগামিতা বাড়ছেই বাড়ছে।

এও বলনা যেঃ " আমিও তো সকলের মতো"। কারণ সবাই তোমার সাথে বড়জোর কবরের পার পর্যন্ত যাবে। সবার সাথে বিপদ-আপদে এক সাথে থাকা মানে যদি সান্তনা হয়, তাহলে এটা নিরেট সত্য যে, কবরের অপর পাশ হল অত্যান্ত ভয়ংকর। এবং নিজেকে বেহুদা সন্দেহ করোনা। যদি এই মুসাফিরখানার দুনিয়ায় হেকমতের দ্বারা লক্ষ কর; তাহলে কোন কিছুই পরিপাটিহীন, উদ্দেশ্যহীন তুমি দেখতে পাবে না। তাহলে তুমি কীভাবে পরিপাটিহীন, উদ্দেশ্যহীন এখানে থাকতে পারবে? এই দুনিয়ায় ঘটে যাওয়া ভুমিকম্পের ন্যায় ঘটনাবলী এগুলো এমনি এমনিতে হচ্ছে মনে করো না। (সোজলার ১৬৯)

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ (জুমা' ৮)

আলোচ্য আয়াত ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, "মৃত্যু থেকে পলায়ন কারীরা, পলায়ন করে করে তারা আরও মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে"। (মাক্তুবাত ৪১৭)

মুহাব্বাত / হৃদ্যতা

اَلْحُبُّ لِلّٰهِ * وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ * وَالْحُكْمُ لِلّٰهِ

তে উল্লেখিত اَلْبُغْضُ فِى اللهِ * وَالْحُكْمُ لِلهِ (কেবল একমাত্র আল্লাহর জন্যে ভালবাসা/রাগ করা/ আদেশ করা। (আবু দাউদ, ছুন্নাত-২) যদি এমনটি না হয় তাহলে নফস ও শয়তান প্রশ্রয় অর্জন করতঃ মুনাফেকির বন্ধু হিংসা, বিদ্বেষ জয়লাভ করে। হাঁ যদি এমনটি না হয় তাহলে ইনছাফ আদালতের ধারপ্রান্তে সুন্দর রঙ্গে জুলুম হয়।

গত হওয়া একটি শিক্ষণীয় ঘটনাঃ একবার হযরত আলী রাঃ এক কাফিরকে নিচে ফেলে হত্যা করতে তলোয়ার ও বের করে নিয়েছিলেন কিন্তু ঐ কাফির লোকটি হযরত আলী রাঃ এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করিলে তিনি তাহাকে হত্যা করা থেকে বিরত রহিলেন। কাফির লোকটি জিজ্ঞেস করল কেন আমাকে হত্যা করচ্ছ না হে আলী ? তখন হযরত আলী উত্তরে বলেছিলেন আমি তোমাকে প্রথমে আল্লাহর জন্যে, তার ভালবাসার খাতিরে হত্যা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু থুথু নিক্ষেপ করার পর আমি ভীষণ রাগান্বিত হলাম আর আমি ভাবলাম এখন যদি তোমাকে হত্যা করি তাহলে আমার রাগের অংশবিশেষ তোমার হত্যার সাথে জড়িত হয়ে যাবে যা আমাদের দ্বীনে নিষিদ্ধ। তখন ঐ কাফির বলল যে আমি থুথু নিক্ষেপ করে আমাকে তাড়াতাড়ি হত্যা করতে তোমাকে ক্রদান্বিত করেছিলাম । আর যাই হোক তোমাদের দ্বীন ঐ পরিমাণ খালিছ ও বিশুদ্ধ তাহলে অবশ্যই তোমাদের দ্বীন হাক্বিক্বি ও আসল দ্বীন। (মাক্তুবাত ২৬৮)

আমার সারাটি জীবনে, মানবতার সামাজিক জীবন থেকে দৃঢ়ভাবে নিরীক্ষণে বুঝলাম এবং অনুসন্ধানের দ্বারা আগত ফলাফল পেলাম এই যে, স্নেহের জন্য এক মাত্র উপযুক্ত বস্তু হল আরেক স্নেহ, ভালবাসা। আর ঝগড়ার জন্যে এক মাত্র উপযুক্ত বিষয় হল আরেকটি ঝগড়া। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক জীবনকে স্বার্থক, সিকিউরিটিকারী এবং চিরন্তন সুখ প্রধানকারী হৃদ্যতা ও ভালবাসা গুনটির, সব চেয়ে বেশী উপযোগই হল অন্য কিছু নহে আর তা হল মুহাব্বাত ও ভালবাসা। অপর দিকে মানবের সামাজিক জীবনকে অতীষ্টকারী হল শত্রুতা ও বৈরিতা, আর এটি এমন এক খাসলত যে, এর সাথে সব কিছু থেকে বেশী ঘৃণ্যতা ও দুশমনি এমনকি এর বাস্তবায়ন কেবল নিকৃষ্টতা ও ক্ষতির মাধ্যমে করা সম্ভব। এই ব্যাপারের বাস্তবতা রিসালে নুরের বাইশ তম মাকতুবে বিশ্লেষণ হওয়ায় এখানে সংক্ষেপে একটি ইঙ্গিত প্রদান করছি। এটা হল যে, ঝগড়া ও দুশমনির সময় শেষ। দুই-দুইটি বিশ্ব-লড়াইয়ে শত্রুতামি কি পরিমাণ বিনাশমুখী ও ধ্বংসাত্মক এবং কি মানের আক্রমণাত্মক জুলুম তা দেখিয়ে দিয়েছে। ঝগড়ার মধ্যে যে কোন ফায়দা নেই তা এখন পরিষ্কার। একইভাবে, আমাদের দুশমনদের গুনাহ-পাপাচারিতা, - সীমালঙ্গনতা না হওয়ার শর্তে – যেন দুশমনি আমরা নিজের কাছে টেনে নিয়ে না আসি। তাদের পাপের জন্য এলাহির শাস্তি-ই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে মানুষের রিপু, আত্মহংকার, অন্যায় মনোবাসনা, ইচ্ছাকৃত ভাবে ঈমানদারদের বিপরীতে অন্যায় ভাবে বৈরিতা চালিয়ে যায়; নিজেকে সঠিক মনে করে। অথচ এই বিবাদ ও বিতণ্ডার দ্বারা বৈরিতা চালিয়ে যায়, যেখানে আহলে ঈমানদের বিপরীতে হৃদ্যতার মাধ্যম হওয়া ঈমান, ইসলামিয়াত দিয়ে আগানোর কথা, সেখানে জাতীয়তার ন্যায় আগ্রাসী মাধ্যমগুলো শক্তিশালী ভাবে কাজ করছে, এগুলোর মুল্যায়ন বেশী করা হচ্ছে। দুশমনির অপ্রয়োজনীয় মাধ্যম সমূহকে, ভালবাসার পাহাড়ের ন্যায় প্রাধান্য দেওয়াটা হল এক প্রকার উম্মাদনা, পাগলামি বৈ কিছু নহে।

যেহেতু মুহাব্বাত দুশমনির ঠিক বিপরীত একটি বিষয়। আলো ও অন্ধকারের ন্যায় মৌলিকভাবে কখনও একত্রিত হতে পারেনা। এদের যেটি-ই জয়লাভ করে না কেন অন্তর কিন্তু বাস্তবতার ভিত্তিতে এটাকে খুজে পাবে। হাঁ, মুহাব্বাতের মাধ্যম সমূহ হল; ঈমান, ইসলাম, মানবতার ন্যায় নুরান্বিত মজবুত জিঞ্জির সমূহ এবং আধ্যাত্মিকতার দুর্গ সমূহ। আবার দুশমনির মাধ্যম হল; আহলে ঈমানদারদের বিপরীত ছোট ছোট পাথরের ন্যায় এক প্রকার বিশেষ মাধ্যম সমূহ যা মোটেই মূল্যবান নহে। আর ব্যাপারটা যখন এরকম তাহলে একজন মুসলমানের প্রতি বৈরিতা কারী, ঐ ব্যাক্তির ন্যায়, যে শত্রুতামিকে মুহাব্বাতের পাহাড়ের সমতুল্য কাজ মনে করে। অনেক বড় রকমের ভুল এটা। মুহাব্বাত, ভ্রাতৃত্ত, ভালবাসা

এগুলো হল ইসলামের রুচি, মিযাজ, বন্ধন। যারা দুশমনিতে ব্যাস্থ তারা ঐ হীনমস্তিস্ক শিশুর ন্যায় যে কাঁদতে চাচ্ছে, কাঁদুক, কিন্তু মাছির একটি ডানার জন্য কাদা মানে হল বেহুদা বাহানা খুজা। একই ভাবে দুশমনিতে আগ্রহী ব্যাক্তি ঐ অতি দুষ্টা ব্যাক্তির ন্যায় যে ভাল ধারনা করার ক্ষমতা থাকার পর ও মন্দ ধারনা করে। একটি বস্তুর সাথে দশটি ভাল গুনকে ডাকিয়ে রাখে। এমনটি করা হল ইসলামি দ্বীনের আখলাকের ভিতরের ইন্সাফ ও উত্তম ধারনার নিতিনুসারে তা সর্বদা প্রত্যাখ্যিত। (খুতবায়ে শামিয়া ৫১)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুতে ভালবাসায় আপ্লুত হওয়া দুই ধরনার হয়। একটি হল; উপর থেকে নীচের দিকে অবতরণ করে। অপরটি হল; নীচ থেকে উপরের দিকে উটে। এখন একজন মানুষ যদি সর্ব প্রথম তার ভালবাসাকে আল্লাহ্র প্রতি প্রধান করে, তাহলে তার এই ভালবাসার কারনে সে আল্লাহ্র পছন্দনিয় সব কিছুকে ভালবাসবে। এবং সে আল্লাহ্র মাখলুকদের কে তার ভালবাসা বণ্টন করার কারনে, আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা তখন কমে না, বাড়তেই থাকে। দ্বিতীয় প্রকার যেটা, এটা প্রথমে আসবাবকে তথা মাদ্যমকে ভালবাসে এবং ভালবাসাকে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার মাধ্যম তৈরি করে। এই জাতীয় মুহাব্বাত কাউকে হেফাজত করতে পারবেনা, হারিয়ে যাবে, ঠিকবে না। এমনকি কখনও শক্তিশালী কোন আক্রমন তাহাকে হারিয়ে দিবে। তার এই মুহাব্বাত বাহ্যিক ক্ষেত্রে যজবা প্রদান করে, ধ্বংসের কারণ হয়। যদিও আল্লাহ্র প্রতি মাধ্যম হয় না কেন তার কাছে পৌছাতে অনেক ত্রুটির বিদ্যমান ভালবাসা এটি, , । (মাস্নাবিয়ে নুরিয়া ৭৩)

মুহাব্বাত আবার দুই প্রকারঃ এক, মা'নায়ে হরফি (তথা আন্তস্থল থেকে কৃপণতা ছাড়া ভালবাসা) এমনভাবে যে, রাছুলে আকরাম আলাইহিচ্ছালাতু অয়াচ্ছালামের বিবেচনায়, আল্লাহ্‌র নামের উসিলায় হজরত আলী রাঃ এর সাথে, হাসান ও হুসাইনকে এবং আহলে বায়তকে ভালবাসা। এই ভালবাসা রাছুলে আকরাম আলাইহিচ্ছালাতু অয়াচ্ছালামের ভালবাসাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। মহান আল্লাহ্‌র ভালবাসার প্রতি উসিলা হবে। এই ভালবাসা শরীয়ত সম্মত, এর আধিক্যতায় কোন ক্ষতি নেয়। সীমালঙ্গন হবে না। অন্য কাহারও প্রতি বৈরিতায় ও শত্রুতায় উৎসাহ দিবে না।

দুই, মা'নায়ে ইসিমের সাথে মুহাব্বাত (তথা শুধু মুখের বানী)। অর্থাৎ স্বয়ং কেবল তাদেরকে ভালবাসে। হযরত পয়গাম্বর আলাইহিচ্ছালাতু অয়াচ্ছালামকে চিন্তা না করে শুধু হজরত আলি রাঃ এর কারামত ও কামালতকে গুরুত্ত দিয়ে এবং হযরত হাসান ও হুসাইনের সু-উচ্ছ মর্যাদা সমুহকে চিন্তা করে তাদেরকে ভালবাসে। এমনকি আল্লাহকে না চিনলেও পয়গাম্বর কে না জানলেও এর পর ও তাদেরকে চিনে, জানে, ভালবাসে। এই ভালবাসা রাছুলে আকরাম আলাইহিচ্ছালাতু অয়াচ্ছালামের ভালবাসায় ও আল্লাহ্‌র প্রতি মুহাব্বাতের ক্ষেত্রে মুটেই ধারে কাছে নহে, কাজের নহে। এই ভালবাসা যদি আধিক্য হয়, তাহলে অন্যান্যদের প্রতি দুশমনি ও বৈরিতার দাবি রাখে। (মাক্তুবাত ১০৭)

কিছু আহমক রয়েছে যে, সূর্যকে চিনতে না পারার কারনে, যদি একটি আয়নার মাঝে সূর্যকে দেখে, তাহলে ঐ আয়নাকে ভালবাসতে শুরু করে। অত্যান্ত প্রচেষ্টার, আগ্রহের দ্বারা ঐ আয়নাকে হেফাজত করতে থাকে। যেন আয়নার ভিতরের সূর্য হারিয়ে না যায় । যখন-ই এই আহমক, এটা বুঝতে পারে যে সূর্যটা, আয়নার ধ্বংসের বা ভেঙ্গে যাবার কারনে ভিতরের সূর্য ও মরে যায়, তখন আবার ঘুরে ফিরে ঐ আকাশের সূর্যকে ভালবাসতে শুরু করে। মূল সূর্যের প্রতি মুখ ফিরায়। ঐ সময় বুঝতে পারে যে আয়নায় দেখতে পাওয়া সূর্যটা; আসলে আয়নার মুখাপেক্ষি নহে, তার অস্থিত্ত আয়নার উপর নির্ভর করে না। বরং মূল সূর্যটা, আয়নাকে ঐভাবে রাখার, ধরার কারনে তার ভিতরে চক-চক করা বা আলো আসাটা মূল সূর্যের সাহায্যে হচ্ছে। সুতরাং এটা প্রমাণিত যে সূর্যের স্থায়িত্ত ঐ আয়নার স্থায়িত্তের উপর নহে, বরং আয়নার ভেঙ্গে না যাওয়ার শর্তে তার চাকচিক্যময়তার স্থায়িত্ত ঐ সূর্যের উপর নির্ভরশীল। হে মানুষ! তোমার অন্তর হল তোমার আকৃতি ও ভিত্তির একটি আয়না স্বরূপ। তোমার ফিতরাতে ও কলবের মধ্যে অবস্থানকারী কঠোর এক স্থায়ী

ভালবাসা, যা তোমার ঐ অন্তরের আয়নার জন্যে বা ভিত্তির জন্যে নহে , , বরং ঐ আয়নার মধ্যে থাকা যুগ্যতার বিবেচনায় এক ঐশী জলওয়া রয়েছে যা বাকিয়ে যুল-জালালের জলওয়ার সম্মুখে এক ভালবাসা থেকে এটা যে, যা তোমার আহমকির কারনে ঐ ভালবাসার মুখ অন্য দিকে ফিরে গিয়েছে। আর যেহেতু বিষয় এরকম, সুতরাং মুখে উচ্চারণ করে বল " ইয়া বাকী আন্তাল বাকী" অর্থাৎ হে রব যেহেতু আপনি আছেন এবং আপনি চিরন্তন; অতএব বিনাশ ও ধ্বংস আমাদেরকে যা করার করুক, কিছুই আসে যায় না! (লাম'লার ১৩৬)

মানুষ! সে তার স্বত্বা প্রয়োজনের সমন্বয়কারী হওয়ার বিবেচনায় সৃষ্টিকুলের প্রায়-ই সব কিছুর সাথে তার একটা সম্পর্ক রয়েছে। একই ভাবে মানুষের সত্ত্বা সমন্বয়ে অসংখ্য এক ভালবাসার স্থাপত্য লেভেল পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এই কারনে মানুষ ও সমগ্র মাখলুকাতের প্রতি এক প্রকার প্রেমাস্পদে আবদ্য, ও এই হৃদ্যতা সে লালন করছে। এই বিশাল দুনিয়াটাকে সে একটি ঘরের ন্যায় পছন্দ করে। পৃথিবীটাকে সে চিরস্থায়ী জান্নাতের বাগানের ন্যায় ভালবাসে। অথচ তার ভালবাসার এই সৃষ্টিকুল দাড়িয়ে আছে এমন নহে, এরা চলে যাচ্ছে। আর এই চলে যাওয়া দেখে লোকটি খামকা কষ্ট, আযাব ভোগ করচ্ছে। তার সীমাহীন, অতুলনীয় ভুল স্থলের ভালবাসার পাত্ররা চলে যাওয়াতে কষ্টের কারণ হচ্ছে। এখন এই আযাবের সাথে সে যত ভুল, ভ্রান্তি করবে সব-কিছুর জন্যে সে নিজেই দায়বদ্য। তার কারণ হল, অন্তরের সীমাহীন ভালবাসার শক্তিকে সীমাহীন এক কামালে-বাকি এর মালিক এক সত্ত্বার তরে ব্যাবহার করার জন্যে দেয়া হয়েছিল। আর এই মানুষ মন্দ পথে ব্যাবহার করে ঐ ভালবাসাকে ধ্বংসশীল সৃষ্টিকুলের প্রতি ব্যাবহার করে এক ভুল করেছে, এখন সে ভুলের শাস্তি ঐগুলোকে হারানোর দ্বারা ভোগ করতেই আছে। (লাম'লার ১৪)

আল্লাহ্ মানুষকে এই কায়েনাতের মধ্যে স্বভাবজাতভাবে সীমাহীন এক মুহাব্বাতের মেজায দিয়ে তৈরি করেছেন। তার কারণ হলঃ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে নিপুণতার সম্মুখে আনত ভালবাসা এবং কামালাতের সম্মুখে নত হওয়া এবং তার বিপরীতে দয়া, ভালবাসা এটা চিরাচরিতভাবে বিদ্যমান। জামাল ও কামাল ও এহসানের স্তরের ভেদে তার ঐ ভালবাসা বাড়তে থাকে। এশকের একেবারে শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌছায়। আবার এই ছোট মানুষের ছোট এই কল্বের মধ্যে, কায়েনাত তুল্য এক এশক স্থাপিত হয়। হাঁ, কলবের মধ্যে থাকা ডালের বীচির ন্যায় হওয়া সংরক্ষণ ক্ষমতা, যা একটি লাইব্রেরীর ন্যায় হওয়া হাজার হাজার বই সমমান লেখা বিদ্দমানতা এটা প্রদর্শন করচ্ছে যে, মানুষের কলব তামাম কায়েনাতকে তার ভিতরে প্রবেশ করাতে সক্ষম ও সমতুল্য হৃদ্যতা, ভালবাসা বহন করতে ও সক্ষম। অতএব, যেহেতু মানবের স্বভাবের, ফিতরাতের মধ্যে এমন এক সীমাহীন মুহাব্বাতের ঝোঁক, যোগ্যতা প্রস্তুত আছে। তাহলে অবশ্যই এই মানবের রব এমন মাখলুক যার মধ্যে রয়েছে চেতনার ক্ষেন্দ্র, এবং যে একেবারেই মুখাপেক্ষি, এমনকি যে চিন্তাশীল, ও একান্ত আশিক হওয়ার যোগ্যতা যার মাঝে বিদ্দমান এই মানুষের কাছ থেকে সে এই সীমাহীন ভালবাসার দাবি রাখে। আল্লাহ্র ভালবাসা যা নবীজির সুন্নাতের অনুসরনের দাবি করে। কারণ আল্লাহকে ভালবাসার মানে হল তার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি মুতাবেক কাজ করা। আর সন্তুষ্টির সর্ব উচ্চ মুকাম্মাল ছবি হল হযরত মুহাম্মাদ সঃ এর সুন্নাত। যাতে- মুহাম্মাদ সঃ এর কাজ ও মৌন সম্মতিতে নিজেকে তৈরি করা এর অর্থ দাড়ায়। (লাম'লার ৫৭)

হে আমার নফসের অনুসারী অন্তর! হে আমার দুনিয়া প্রেমি বন্দু! ভালবাসা হল এই কায়েনাতের একটি অস্থিত্তময় কারণ। এবং এই কায়েনাতের সে বন্ধন ও। এমনকি এই কায়েনাতের নূর ও জীবন ও। মানুষ দুনিয়ার একান্ত সর্বোপরি এক ফল স্বরূপ হওয়ার কারনে, কায়েনাতকে সুশোভিত করবে এমন এক মুহাব্বাত ক্ষমতা ঐ মানুষ নামী ফলের মধ্যের অন্তরে বীচি হওয়াতে ধাপ-কৃত করা হয়েছে। সুতরাং, এটা স্বাভাবিক যে সে ঐ মানের সীমাহীন এক মুহাব্বাতের উপযুক্ত হওয়া, এবং অসিম পূর্ণতার অধিকারী হতে পারা। অতএব, হে আমার নফস ও বন্দুগন! মানুষের

মধ্যে দুটি মাধ্যম তথা ভয় ও মুহাব্বাত প্রাকৃতিক ভাবেই উন্নীত আছে। সর্বাবস্থায় এই ভালবাসা ও ভয়কে, হয় জনগনের তরে নতুবা স্রষ্টার পথে ব্যাবহার হবে। অথচ ,যদি জনগনের জন্যে ব্যাবহার হয় তথা মানুষকে ভয় করে, তাহলে এটা এক যন্ত্রনাদায়ক এক বালা-মুসিবত বৈ কিছু নহে। জনগনের তরে মুহাব্বাত ও একটি বিষণ্ণময় আপদ স্বরূপ। কারণ এমন কিছুতে ভয় করচ্ছ যে, তারা তোমাকে কৃপা করবে না এমনকি অনুগ্রহ ও দেখাবে না। এমতাবস্থায়, ভয় হল একটি যন্ত্রনাদায়ক এক বিপদ। আবার মুহাব্বাত নিয়ে চিন্তা করলে, তোমার নিরেট পছন্দের বস্তু, হয় তোমাকে চিনবে না " গুডবাই " বলে চলে যাবে, এটাকে যৌবনের বা মাল-সম্পদের ন্যায় চিন্তা করো। নতুবা তোমার ভালবাসার জন্যে তোমাকে অবহেলা করবে। তুমি কি দেখতে পাও না কৃত্রিম এশক, ভালবাসা নিরান্নব্বই %, মাশুকের প্রতি সার্বক্ষণিক আপত্তি তুলতে-ই আছে। তার কারণ হল, চিরঞ্জিব তুল্য আয়না বাতেনি কলবের সাথে মূর্তি তুল্য দুনিয়াবি ভালবাসার প্রতি ডলিয়ে দোল খাওয়াটা ঐ আশিকদের জন্যে কঠিন থেকে আরও কঠিন, এমন ভালবাসা কে প্রত্যাখ্যান করে। বলাবাহুল্য, প্রকৃতি, প্রাকৃতিক ও অনুপযোগী বস্তু কে উড়িয়ে দেয়, দূরে নিক্ষেপ করে। (আমাদের এই আলোচনা প্রবৃত্তির ভালবাসার বাহিরে) অর্থাৎ, তোমার ভালবাসার বস্তু হয় তোমাকে চিনে না নতুবা তোমাকে অবজ্ঞা করছে। অথবা তুমার সাথে বন্দুপরায়ন হচ্ছে না অথবা তোমার থেকে দুরত্ত বজায় রাখছে। যেহেতু ব্যাপার এরকম, তাহলে এই ভয় ও ভালবাসা এমন একজনের সাথে ব্যাবহার কর যে, যেন তোমার ভয় একটি স্বাদময় এক সুমিষ্ট বস্তু হয়। তোমার ভালবাসা যেন লাঞ্চনাহীন এক প্রশান্তি হয়। হাঁ , মহান খালিকে-যুলজালাল থেকে ভয় করা অর্থ হল তার রহমতের অনুগ্রহের প্রতি রাস্তা খুজে পেয়ে তার কাছে প্রার্থনা করা। আসলে, ভয় হল একটি চাবুক; যা তার রহমতের কুলে হাঁকিয়ে ব্যাক্তিকে পৌছিয়ে দেয়। জানা কথা যে, একজন মা তার সন্তানকে ভয় দেখানোর সাথে সাথে তার বুকে টেনে নেয়। ঐ ভয় ঐ সন্তানের জন্যে অত্যান্ত মজাদার । তার কারণ হলঃ স্নেহপরায়নতার ছিনায় তাহাকে টেনে নিচ্ছে । বলাবাহুল্য, সকল পিতা-মাতার স্নেহপরায়নতা হল, রহমতে-এলাহির একটি জ্যোতি স্বরূপ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ে ও এক বিশাল সুখের আনন্দ রয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্‌র ভয় এর ফল এরকম হয়, তাহলে মুহাব্বাতুল্লাহ ও কি পরিমানের সুস্বাদু এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারি সাথে যে আল্লাহ্‌ থেকে ভয় করে, সে অন্যদের নির্দয়তা, অপদস্থতার ভয় থেকে নিজেকে বাঁচাবে। পাশাপাশি আল্লাহ্‌র নামে হওয়ার কারনে সৃষ্টিকুলের প্রতি তার ভালবাসা ও বিলীন মুখী, লাঞ্চনাকর, যন্ত্রনাকর হবে না।

হাঁ, মানুষ প্রথমেই নিজের নফসকে ভালবাসে। পরে আত্মিয়দেরকে, পরে তার জাতিকে, পরে প্রানবাহি মাখলুকাতকে এর পরে কায়েনাতকে পরিশেষে দুনিয়াকে ভালবাসে ।এই ধাপ সমূহের প্রত্যেকেই একে অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট। মানুষ এদের সুস্বাদু স্বাদ সমূহের দ্বারা এবং যন্ত্রনাকর কষ্টের দ্বারা অভিজ্ঞ হতে পারে। অথচ , এই ধ্বংসাবশেষ ভু-মন্ডলে এবং বাতাসের ঘূর্ণায়নে কোন কিছুই বেচারা এই মানুষের অন্তরের হাতে ফয়সালা না থাকার কারনে, সর্বদাই জখম-কৃষ্ট হচ্ছে। তার ভালবাসা যে বস্তুতে রাখছে ঐ বস্তু তার থেকে দূরে গিয়ে আবার তাহাকে বিরক্ত করচ্ছে, যন্ত্রনা দিচ্ছে। সব সময় একটা অশান্তির মাঝে থাকে, নতুবা গাফ্লতের মাধ্যমে মাতাল হয়। যেহেতু সব কিছু এরকম, হে আমার নফস! যদি তোর জ্ঞান থাকে তাহলে এই সকল ভালবাসাকে একত্রিত করো, মূল মালিক কে প্রধান কর, এই আনাকাঙ্খিত বিপদ-আপদ থেকে নিজেকে বাঁচাও। এই সীমাহীন ভালবাসা, অসিম এক কামাল ও জামালের জন্যে আসলে-ই সুনির্দিষ্ট। যখন-ই আসল মালিক কে দিতে পারবে ঐ সময় সমস্ত বস্তুকে তার নামে এবং তার আয়না হওয়ার দৃষ্টিতে প্রশান্তিকর ভাবে ভালবাসতে পারবে। তার মানে হল, এই মুহাব্বাতের ক্ষমতাকে কোন সন্দেহ ছাড়া দুনিয়ার প্রতি ব্যাবহার না করা জরুরী। নতুবা এই ভালবাসা সব চেয়ে মজাদার এক নেয়ামতের স্থলে সর্বাপেক্ষা এক যন্ত্রণার শিরোনাম হবেই হবে।

অন্য একটা দিক হল যে, হে আমার নফস! তুমি, তোমার ভালবাসার এই শক্তিকে কেবল নিজের নফসের জন্যে ব্যাবহার করচ্ছ। তুমি নিজেকে নিজের মা'বুদ, মাহবুব বানিয়ে নিয়েছ। সব কিছুতেঁ তোমার নফস যা বলছে শুধু তাই করচ্ছ। স্বভাবজাতভাবে নিজেকে এক প্রকার রব বানিয়ে নিয়েছ, শরীয়তেঁ বর্জনীয় ভালবাসার শাস্তি হল, সীমাহীন অনুগ্রহহীন এক মহা বিপদের নাম। (সোজলার ৩৫৮)

মুসীবত

হে মুসীবতে আক্রান্ত ব্যাক্তি! যেনে রেখো প্রত্যেক মুসীবতের মধ্যে একটি নেয়ামতের দিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সচেতন হও এবং এটাকে দেখ কীভাবে সব কিছুতে অবস্থান নিচ্ছে এক প্রকার উষ্ণতার, গরমের ভাব এর উপস্থিতি রয়েছে, প্রত্যেক বিপদের মাঝে একটি নেয়ামত লোকিয়ে আছে, আরও বড় আপদকে চিন্তা কর, আর ছোট ছোট দুর্যোগকে দেখে দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। নতুবা মুসীবতকে বড় আকার দিতে থাকবে পরে তুমি ভয়ে চমকিয়ে উটবে। উফ, উফ বলে বলে শ্বাস ছাড়বে, এটা ও আবার হিতে বিপরীত হবে। উল্টো আক্রমন করবে ঠিক, কিন্তু মারাত্মক রুপ ধারন করবে। আবার যদি বেশী গুরুত্ত দাও তখন একটার জায়গা সমস্যা দুইটা হতে থাকবে। অন্তরের নাচানাচির ন্যায় ফিরবে, বাস্তবতায় চেহারা দেখাবে। আর বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার আগের যায়গায় ফিরতে শুরু করবে, তখন অন্তরকে চড় দিবে, চলতে থাকবে। (সোজলার ৭২৪)

প্রশ্ন- মহান রব তিনি মুসীবত সমূহ প্রেরন করেন, বিপদ-আপদ কে চাপিয়ে দেন। বিশেষতঃ মুসলমানদের কে, এমনকি নিরীহ প্রাণীদের প্রতি এটা কি জুলুম নহে?

উত্তর- কক্ষনও নহে! রাজত্ব তার। তার রাজত্বে তিনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষেঃ কোন কারিগর ব্যাক্তি, একটি বিনিময় প্রধানের মাধ্যমে তোমাকে একটি মডেল বানিয়ে অতি সুন্দয় আবয়বে অলঙ্কৃত এক পোশাক পরাচ্ছেন, চাতুর্যতা, অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতাকে প্রদর্শনের লক্ষে তিনি ঐ পোশাককে কাটছেন, কেটে-ছেটে, লম্বা করে, খাটো করছেন, , , তোমাকে বসাচ্ছেন, দাড় করাচ্ছেন। তুমি কি ঐ কারিগর ব্যাক্তিকে বলতে পারবে যে " আমাকে ও অতি সুন্দরকারী এই পোশাককে তুমি বিছ্রি করে দিয়েছ; তুমি আমায়, বসিয়ে, দাড় করিয়ে বিরক্ত করচ্ছ? (কারণ এই জন্যে তুমি বিনিময় পাবে)। মোটেই এভাবে বলতে পারবে না। যদি এমনটি বল তাহলে পাগলামি ছাড়া কিছুই হবে না। ঠিক একই ভাবে, মহান সানিয়ে-যুল-জালাল; তোমাকে চক্ষুর দ্বারা, কর্ণ, জিহ্বার ন্যায় অনেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিশোভীত, অলঙ্কৃত করে অতি নিপুণতার মাধ্যমে একটা দেহ নামীয় পোশাক পরিয়েছেন, , , তার ভিন্নমুখী ইসিম সমূহের উজ্জলতার নকশা সমূহকে প্রদর্শনের জন্যে তোমাকে রোগ দিবেন, বিপদ দিবেন, ক্ষুদা, অভাব দিবেন, , , এরকম অনেক কিছুর দ্বারা তোমায় ক্ষুদ্র এক চাকায় ঘুরাবেন। জীবনের তাৎপর্যকে শক্তিশালী করতে, এবং এলাহির ইসিম সমূহের জলওয়াকে ফুটিয়ে তুলার জন্যে, তোমাকে এমন অসংখ্য চাতুর্যতায়, প্রেক্ষাপটে তিনি ভ্রমন করাবেন। এখন যদি তুমি বল যে, " আমাকে কেনই বা এই সকল মুসীবতের সম্মুখীন করচ্ছ"? উপরে উল্লেখিত উদাহারনের ন্যায়, শত শত হেকমত তুমাকে চুপ করে দিবে৷ এভাবে বলতে পারবে না। মুলতঃ সুকুন ও নীরবতা, অলসতা, বিরক্তিকর একঘেয়েমি, থেমে যাওয়া; এগুলো এক প্রকার শূন্যতা বা অস্তিত্বহীনতা, ক্ষতিকর। গতিপ্রবন ও পরিবর্তন; অস্তিত্বশীল বিষয়, এটা মন্দ নহে উত্তম। জীবন গতিময়তার দ্বারা পূর্ণতাকে পায়; বালা-মুসিবতের দ্বারা উন্নতি লাভ করে। জীবন সে; আল্লাহ্‌র সিফাতি নাম

সমূহের দ্বারা ভিন্নমুখী গতির মাধ্যমে আসল রুপের আত্মপ্রয়াস, আত্মপ্রকাশ করে, নিজেকে পরিশুধিত করে, শক্তি পায়, আলোকিত হয়, প্রশস্থতা লাভ করে, স্বীয় ভাগ্যকে লেখাকারী এক গতিপুরক কলমে রূপান্তরিত হয়, সে তার দায়িত্তকে আদায় করা শিখে, পরকালে বিনিময়ের প্রতি অর্জনকারী হিসেবে নিজেকে অধিকারী করে তুলে। (মাক্তুবাত ৪৫)

যেমনটি ছোট ছোট অপরাধ কারীদের অঞ্চল ভিত্তিক বিচারালয়ে শাস্তি দেয়া হয়, বিচার করা হয়। বড় বড় অপরাধীদের বিচার বড় বিচারালয়ের জন্যে প্রেরন করা হয়। একই ভাবে আহলে ঈমানের ও বিশেষ দোস্তদের আওতাগত ছোট ভুলের জন্যে দ্রুত তাদেরকে পরিশুধিত করার লক্ষে অংশ বিশেষ দুনিয়াতে ও বাহ্যিক দ্রুত বিচার করা হয়। অন্য দিকে আহলে দালালাতের অপরাধ এতই বড় যেঃ সংক্ষিপ্ত এই দুনিয়ার জীবনে তাদের শাস্তি পূর্ণতা না পাওয়ার কারনে, অবস্থার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরকালের বড় আদালতে হাওলা করার লক্ষে, অধিকাংশরা এখানে শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। যাইহোক, হাদিস শরিফের ভাষায় "দুনিয়া মু'মিনের কারাগার, আর কাফিরের জন্যে জান্নাত" দুনিয়াতে এই মু'মিন বাহ্যিকভাবে শাস্তি দেখতে পাওয়ার কারনে, দুনিয়াটা তার ব্যাপারে একটি শাস্তি ভোগের স্থল স্বরূপ। দুনিয়াটা মুমিনদের পরকালে চীর সুখী হওয়ার দৃষ্টিতে একটি জেলখানা, একটি জাহান্নাম স্বরূপ। এবং কাফিরেরা, যেহেতু জাহান্নাম থেকে বের হবে না, এবং তাদের উত্তম কর্ম সমূহের প্রতিদান দুনিয়াতে দেখতে পাওয়া এবং বড় বড় অপরাধের শাস্তি বিলম্বিত হওয়ার বিবেচনায়, তাদের জন্যে পরকালের দৃষ্টিতে দুনিয়াটা হল একটি জান্নাত স্বরূপ। নতুবা গভীর চিন্তায় মু'মিন কাফিরের তুলনায় তাত্ত্বিক ভাবে ও হাকিকাতের দৃষ্টিতে অনেক অনেক সুখী। এ যেন মু'মিনের ঈমান, তার রুহের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক জান্নাতের হুকুমে বলবত; কাফিরে কুফুরি, অপরাধির অপরাধ কাফিরের তাত্ত্বিক তাৎপর্যে একটি জাহান্নামের আগুনের শিখা জ্বলছেই। (লাম'লার ৪৭)

২৬তম কালেমায় উল্লেখিত হয়েছে তকদীরের আলোচনায় মানুষের বিপদ ও অসুস্থতার বেলায় আপত্তিকর আপত্তি উত্তাপনের কোন অধিকার নেই তিনটি কারণে-

প্রথম কারণ- মহান আল্লাহ মানবের মধ্যে যে শরীর নামক পোষাক পরিয়েছেন এটা তার দিকে লক্ষ করলেই কারুকার্যত স্পষ্ট হয়ে উঠে। মানবকে যেন এক নমুনা (মডেল) বানিয়েছেন । আর এই বিদ্যমান দেহকে তার মডেলের উপর কর্তন করা, বদন করন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করার ধারা ভিন্নমুখী আছমায়ে-হুছনার তাজাল্লীকে তিনি তুলে ধরেছেন। শাফি নামটার জন্যে যেমন অসুস্থতা আর রাজ্জাক নামটার জন্যে যেমন ক্ষুধার্থ রাখা জরুরী। আর এভাবে ক্বোরআনের নিম্নের আয়াতে ইঙ্গিত প্রধান রয়েছে-

مَالِكُ الْمُلْكِ يَتَصَرَّفُ فِى مُلْكِهٖ كَيْفَ يَشَٓاءُ

দ্বিতীয় কারণ– জীবনটা মুসিবত সমূহের সাথে, অসুস্থতার সাথে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে পূর্ণাঙ্গতা, ক্ষমতা উন্নতি, এর ন্যায় ফলাফলে প্রতিফলিত হয়। পরিপক্কতা অর্জন করতঃ হায়াতের দায়িত্ব সমূহকে আদায় করে। সর্বদা সুখের জিন্দেগী ভাল দিক থেকে বেশি মন্দ দিকে নিকটবর্তী হয় আর পরিশেষে ঐ দিকেই ধাবিত হয়। যা দেহের সাথে অতপ্রোতভাবে জড়িত।

তৃতীয় কারণ- এই দুনিয়াটা হল পরীক্ষার একটা ময়দান এবং খেদমতের একটি স্থলস্বরূপ। এখানে স্বাধ ও প্রতিদান ও পুরুস্কারের স্থান নহে। নিঃসন্দেহে এটা খেদমতের মাঠ এবং এবাদতের স্থল। অসুস্থতা ও বিপদাপদ সমূহে যদি ব্যক্তি দ্বীনদারী না হয় ও ধৈর্যের বাধ শক্তভাবে ধরার শর্তে যদি কাজ করে তাহলে এই খেদমত ও এবাদত উপযুক্ত হবে ও ধৈর্যশীলকে শক্তিশালী করবে। এবং প্রত্যেক ঘন্টাকে পূর্ণ একদিনের ইবাদতের সমমানে হওয়ার ব্যাপরটাতে অহংকার নহে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করণ জরুরী হিসেবে বিবেচিত হবে।

হা এবাদত ২ প্রকার (১) ইতিবাচক (২) নেতিবাচক। ইতিবাচক হল- যা আমাদের সবার জ্ঞাত ইবাদত সমূহ। নেতিবাচক হল- অসুস্থতাসমূহ ও বিপদাপদ সমূহকে ব্যক্তি নিজেকে মুসিবতের সম্মুখীন ও নিরূপায় কল্পনা করতঃ মহান রবের আশ্রয়ের নামে দৃষ্টিপাত করতঃ তাহাকে চিন্তাকরত: দোয়ার দ্বারা খালিছভাবে তার কাছে প্রয়োজন ও অপারগতা মিনতি করা। আর এমন এবাদতের মধ্যে রিয়া (ইবাদত দেখানো) নেই। এটা হল খুবই বিশুদ্ধ। যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারে এবং মুসিবতের পুরূস্কারের কথা চিন্ড়া করে ও কৃতজ্ঞ হয় তখনই বান্দার প্রত্যেক ঘন্টা পূর্ণাঙ্গ দিনের ইবাদতের সমমানে চলে আসবে। সংক্ষিপ্ত হায়াত যেন লম্বা এক জিন্দেগীতে রূপ নিবে। এমন কি এক প্রকার এরকম রয়েছে যে, এক মিনিট একটি দিনের ইবাদতের সমমানে লিখিত হয়। বলাবাহুল্য, আমার এক মুহাজির ভাই হাফিজ আহমেদ নামের এক আধ্যাত্মিক বিস্ময়কর সত্বা তার অসুস্থতা কে নিয়ে খুবই বেশি চিন্তিত ছিলাম। আর তখন আমার অন্তরে সচেতনতা এমনটি আসলো যে, তাহাকে অভিনন্দন জানাই, তার প্রত্যেক দাকিকা (মিনিট) একটি দিনের সমমান। আর মুল কারণ হল সেও ধৈর্যের মাধ্যমে শুকুর গোজার ছিল।

প্রত্যেক মানুষ যদি তার পূর্বের গত হায়াতকে চিন্তা করে তাহলে কৃলবে বা তার জিহ্বায় হয় "আহ, অথবা উহ শব্দদ্বয় আসবে। অর্থাৎ হয় দুঃখীত হবে নতুবা আলহামদুলিল্লাহ বলবে। যদি দুঃখের অনুভব করে তাহলে তার কারণ হবে গত জিন্দেগীর সকল মুগ্ধকর সুখের বিচ্ছেদ ও সমাপ্তির থেকে নির্গত আধ্যাত্মিক কষ্টসমূহ। কারণ আনন্দের সমাপ্তি কষ্টময়। কখনও তাৎক্ষণিক সুখ সার্বক্ষণিক কষ্ট নিয়ে আসে। এই বিচ্ছেদসমূহকে স্বরণ করলে কষ্টকে বাড়িয়ে তুলে আর সাথে দুঃখের অবস্থান ও মজবুত হয়। বিগত দিনের নির্দিষ্ট সময়ের বিচ্ছেদের পরে যে আধ্যাত্মিক ও চিরস্থায়ী আনন্দ তৈরী হয়। তখন ব্যক্তিকে দিয়ে "আলহামদুলিল্লাহ বলাতে বাধ্য করে। আর এই প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে মুসিবত সমূহের ফলস্বরূপ যে ছোয়াব ও আখেরাতের লাভসমূহ ও স্বল্প হায়াত যা মুসিবতের মাধ্যমে লম্বা হায়াতে পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ধৈর্য থেকে বেশি অংশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এবং তখন

"الحمد لله على كلّ حال سوى الكفر والضلال". বলাটা জরূরী হয়ে পরে।

প্রসিদ্ধ একটা কথা রয়েছে যে, "মুসিবতের সময়কাল লম্বা হয়। হাঁ সত্য যে, মুসিবাত সময়কাল লম্বাই হয়। কিন্তু জনসাধারণের ধারণার ন্যায় সময়কাল সমস্যামুখী হওয়াতে লম্বা নহে বরং এই লম্বার কারণ হল **লম্বা এক হায়াতের ন্যায় হায়াত তার প্রতিদানগুলো এ সময় প্রদান করাতে ও পাওয়াতে সময় লম্বা হয়**। (লাম'লার ০৯)

"তিনটি বিষয় রয়েছে"

প্রথম বিষয়ঃ আসল ও ক্ষতিকর মসিবত দ্বীনের মসিবত হিসেবে ধর্তব্য। দ্বীনের মসিবত থেকে সর্বসময়ে এলাহীর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা একান্ত জরূরী। অন্যদিকে দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রাখে না এমন মসিবত সমূহ ভিত্তিগত দৃষ্টিতে মসিবত নহে। এগুলো এক রকম মহান-রহমানের পক্ষ থেকে সচেতনতার বার্তা। যেমন, একজন রাখাল তার মেষ পালকে যখন টিল মারে একি সময়ে তারা অন্যের জমিতে মুখ দিচ্ছে, এ থেকে মেষ পাল বুঝতে সক্ষম হয় যে ক্ষতির কিছু থেকে হেফাজতের জন্যে টিল মারা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়। একিভাবে খুব স্পষ্ট বিপদাপদ এমন রয়েছে যে, কোনটা আল্লাহ থেকে সতর্কতা, ক্ষতির সংকেত, কোনটা কাফফারাতুজ্জুনুব (গুনাহের কাফফারা) ও হয়। এমন আছে যা গাফলতি থেকে দূরে রাখতে আসে যা মানুষ

হিসেবে নিরূপায় ও দূর্বলতাকে জাগিয়ে তুলতে যেন এক শান্তির উছিলা হয়। রোগব্যাধি সংক্রান্ত বিপদ সমূহ পূর্বে উল্লেখিত হওয়ার ন্যায় এগুলো বিপদ নহে বরং এমন মসিবত রহমানের ইলতেফাত (দয়া) স্বরূপ, এক পবিত্রতা (গোনাহ থেকে) হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে যে, ফলে ভরপুর কোন গাছে ঝাকি দিলে যেমন ফল নীচে পড়তে থাকে তেমনি ম্যালেরিয়া রোগীর দেহে রুগের দ্বারা কাপুনী দিলে ও গোনাহ সমূহ ঝরতে থাকে (বুখারি, মারাজ-২)।

হযরত আইয়ুব (আ:) তার মোনাজাতে স্বীয় আরাম আয়েসের আবেদন করেন নাই বরং যিকিরের মাধ্যম জিহ্বা ও ফিকিরের মাধ্যম কৃলব যখন রোগের কারণে এবাদতের জন্যে বাধাগ্রস্থ হয়েছিল তাই তিনি দোয়া করেছিলেন। আমরা ও আমাদের প্রথম স্তরের উদ্দেশ্যের শিক্ষার জন্যে এই মোনাজাতের ন্যায় দোয়া করা জরুরী আর তা হল আমাদের গোনাহ সমূহ থেকে আগত আধ্যাত্মিক ও রূহানী সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করা। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে এবাদতে প্রতিবন্ধক হলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে পারি। কিন্তু এটা অভিযোগ ও বিরোধিতার সুরে নহে বরং কোমল ও সাহায্য পাবার লক্ষ্যে তার স্বরনাপন্ন হওয়া জরুরী। যাই হোক, আমরা তার প্রতিপালনে সন্তুষ্ট তাই তার পক্ষ থেকে আগত কিছুতেও আমরা নালিশ-বিহীন অবস্থায় খুশী থাকা আবশ্যক। তাকদীর ও দূর্ঘটনা সম্বলিত বিষয়ে মেনে না নেওয়া এবং এক রকম আওয়াজ “উহ” আহ করা অভিযোগের সামিল হওয়ার সাথে একধরনের ভাগ্যের প্রতি ও মালিকের প্রতি বিদ্রুহীতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।তাকদীরের সিদ্ধান্তে সমালোচনা কারী ব্যক্তি তার মা কে লোহাতে আছাড় দিয়ে দিয়ে নাস্তানাবোধ করে। রহমতের সাথে উপহাসকারী রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। ভাঙ্গা হাত দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন হাত আরও বেশি ভেঙ্গে যায় তেমনী মসিবতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বিদ্রুহীতার তরে আপত্তি ও দুশ্চিনতার কারণে বিপদ আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ বস্তুবাদিক সমস্যাগুলোকে বড় করে যখন দেখা হয় বড় হবে, ছোট করে দেখলে তা ছোট হতে থাকে। যেমন রাতের বেলা মানুষের চক্ষুতে কল্পনাময় কিছু এলে যদি তাহাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তখন এটা বড় হতে থাকে গুরুত্বহীন ভাবলে চলে যায়/হারিয়ে যায়। রাগান্বিত মৌমাছিকে বিরক্ত করলে আরও আক্রমনত্রাত্মক হয়ে ওঠে নতুবা নিরব থাকলে শান্ত থাকার ন্যায় সাধারণ বিপদ আপদ সমূহ বড় করে দেখলে বড় হতে থাকে। হতাশার কারণে ঐ মসিবতগুলো দেহ থেকে প্রসারিত হয়ে কৃলবে জড়িয়ে পরে। যার কারণে আধ্যাত্মিক একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়ে তার সাথে সঙ্গী হয়। এভাবে চলতে থাকে। আর যখনই এই উদ্বেগ ও দূর্ঘটনাকে সন্তুষ্টি ও খোদা নির্ভরতার মাধ্যমে দূরীকরণ করা হয় একটি গাছে শিকড়সহ তুলে ফেলার ন্যায় এই দ্বীনহীন মসিবতগুলো উক্ত গাছের ন্যায় পাতলা হতে হতে শুকিয়ে পালাতে থাকে। আর এই বাস্তবতাকে তুলে ধরতে এক সময় এরকম বলেছিলাম যে,-

হে নিরূপায় ব্যক্তি তাওয়াক্কুল কর যখন দেখ মুসিবত

জানা উচিৎ অভিযোগ ও ভ্রান্তির মাঝে ও রয়েছে মুসিবত

কখনও যদি দেখা পাও বালা মুসিবত প্রদানকারীর

ভালবাসা ও বরকত বিদ্যমান মাঝে এই বালা মহামারীর

যদি তুমি দেখা না পাও তাহলেও ভূলে না যাও

নেই যাহা এ দুনিয়ায় আছে তাহা মুসিবত নামের রতন

জাহান ভর্তি বিপদ আপদে কেন যে তোমার মন কাঁদে

বালা নামের ছোট্ট কণার জন্যে চিৎকার করছি পাগলের মতন

হাতিয়ার বানাও তাওয়াক্কুলকে

না কাঁদিয়া হাঁসাও তোমার দুশমনকে

হাসাতে পারা হল তোমার বিজয়

এখানেই রয়েছে বালা হোক দুশমন হোক তাদের পূর্ণাঙ্গ পরাজয়।

যেমন যেভাবে প্রতিপক্ষতার মধ্যে (যুদ্ধে) শত্রুর ঠিক বিপরীত হাসি দেওয়ার সাথে দুশমনী শান্তিতে ও ঝগড়া বিবাদ তামাশায় পরিণত হয়। দুশমনী ছোট হওয়ার সাথে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাওয়াক্কুল (খোদা নির্ভরতা) এর সাথে যদি মুসিবতকে মুখোমুখী করা হয় ঠিক সেটিও স্বাভাবিক পর্যায়ে এটার মত হয়ে যায়।

তৃতীয় বিষয়ঃ প্রত্যেক সময়ের একটা প্রভাব রয়েছে। আর এই গাফলতের যমানায় মুসিবত তার আকৃতিকে পরিবর্তন করে নিয়েছে। কিছু কিছু সময় কিছু ব্যক্তির জন্যে বালা মুসিবত কোন ব্যাপার নয় বরং তাদের জন্যে এটা এলাহির প্রদানকৃত অনুগ্রহতা। এই যুগের অসুস্থদের পাশাপাশি মুসিবতে আক্রান্তদের (কেবল মুসিবত, যা দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট নহে) সৌভাগ্যতা স্বরূপ দেখার কারণে তাদের অসুস্থতা ও মুসিবত সমূহের বিপরীত কিছু খুঁজতে আমার অন্তর কোন চিন্তা সুরাহা দিচ্ছে না। এমন কি আমাকে তাদের কষ্ট কোন প্রভাবিত করছে না। কেননা যেই যুবকই আমার কাছে আসুক না কেন, আমি দেখতে পাই তাদের একে অপরের তুলনায় এক ধরনের দ্বীনদারী দায়িত্বের ও আখেরাতের বিপরীত উত্তম পথে সামঞ্জস্য রয়েছে। আর তা থেকে বুঝতেছি যে তাদের এই অবস্থ্া আসলে কোন মুসিবত নহে। যেন এক এলাহির নেয়ামতের ধরণ। কেননা যদিও তার অসুস্থতাটা তার দুনিয়াবী ফানি (সাময়িক) অল্প সময়ের প্রতি এক প্রকার কষ্টকর করে তুলছে কিন্তু এটা তার জীবনের চিরস্থায়ী হায়াতের ফায়দাকে স্পর্ষ করচ্ছে । যা এক শ্রেণীর এবাদতের হুকুমে পড়ছে ঠিক এই জায়গায় যদি সে সুস্থতা পায় তাহলে সে তার যৌবনের পাগলামীতে ও যুগের অশ্লীলতায় অবশ্যই অসুস্থতার অবস্থায় হেফাজত করতে পারবেনা বরং নির্লজ্জতায় নিজেকে ব্যাস্থ রাখবে।

উপসংহারঃ মহান আল্লাহ অসীম কুদরত ও সীমাহীন রহমতকে দেখানোর জন্যে মানবজাতিকে সীমাহীন অভাব ও অসীম দরিদ্রতাকে চাপিয়ে দিয়েছেন। এবং সীমাহীনভাবে তার নামের চিত্র সমূহকে দেখানোর জন্যে মানুষকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যে, অসীম দিক থেকে কষ্ট পাবার ন্যায় অসংখ্য দিক থেকে সুখ ও পেতে পারে এমন যেন এক মেশিন স্বরূপ সৃষ্টি এবং ঐ মেশিনের মধ্যে শত শত পার্টস রয়েছে। প্রত্যেক অংশের কষ্ট আলাদা, আরাম, দায়িত্ব আলাদা ও ফলাফলও আলাদা। সাধারণত বড় ইনসান বলে যে দুনিয়া রয়েছে তাহাতে যেভাবে এলাহীর নাম সমূহের তজল্লী প্রতিয়মান হয় তেমনী ছোট ইনসান হওয়া মানুষের মধ্যেও তেমনী ঐ নাম সমূহের তজল্লীও রয়েছে। স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও সুখ এর ন্যায় মানুষকে প্রয়োজনীয় দিক সমূহ কিভাবে শুকরিয়া প্রকাশ করায়ে ঐ বিশেষ মানুষ মেশিনের ভিন্নমুখী দায়িত্ব সমূহকে অর্পন করে। আর তখন মানব কৃতজ্ঞ প্রকাশের এক কারখানা হয়ে যায়।

কিভাবে এ মুসিবত সমূহের সাথে, অসুস্থতা সমূহের সাথে, কষ্টের সাথে অন্যান্য আবেগকম্পিত ও প্রবেশিত গুণের সাথে ঐ নামে মেশিনের অন্যান্য চাকা সমূহকে চালাতে শুরু করে উদ্দীপিত করে। মানবের প্রাকৃতিক-তার মধ্যে জড়িত নিরুপায়তা, দূর্বলতা ও দরিদ্রতাকে বাস্তবতায় নিয়ে আসে। নির্দিষ্ট ভাষায় নহে বরং প্রত্যেক অঙ্গের পৃথক পৃথক ভাষার মাধ্যমে এক প্রার্থনা ও সহযোগিতার অনুরোধ করে। মোদ্দাকথা- মানুষ তার ঐ অঙ্গসমূহের দ্বারা পৃথক পৃথক হাজার হাজার কলম একত্রিত হয়ে একটি কলমের রূপের ন্যায় কাজ চালিয়ে যায় হায়াতের পৃষ্টা ও আধ্যাত্মিক খাতায় জীবনের ভাগ্যজড়িত বৃত্তান্ত লিখে আর এলাহির নাম সমূহে যেন একটি ঘোষণাপত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয় যেন এক মহান ছোবহানের ছন্দ মেলানো গজল এর বিবেচনায় বিবেচিত হয়ে মানুষ তার ফিতরাতি কাজ সমূহ চালিয়ে যায়। (লাম'লার ১১)

নফস / রিপু

হে আমার ভায়েরা! গুরুত্বপূর্ণ ও বড় এক উত্তম হায়াতের বিপরীতে খুবই ক্ষতিকর বাধাপূর্ণ ধ্বংসসমূহ তোমাদের সম্মুখীন হবে। শয়তানরা ঐ খেদমতের খাদিমদের সাথে অত্যান্ত প্রচেষ্টা করে। এই বাধা সমূহ ও এই শয়তানদের বিপরীত, আত্মশুদ্ধির ক্ষমতাকে ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয়। এখলাছকে নষ্টকারী কারণসমূহ থেকে সাপ থেকে, বিছা বিশেষ থেকে, দূরে থাকার ন্যায় আপনারা দুরে থাকুন। হযরত ইউসুফ (আ:) এর বলার ন্যায় যেমন:-

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّى নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয় যার উপর আমার পালন কর্তা অনুগ্রহ করেছেন (ইউসুফ ৫৩)

নফসে আম্মারা কে বিশ্বাস করা সম্ভব নহে। আত্মঅহংকার ও নফসে আম্মারা যেন তোমাদেরকে ভূল পথে পরিচালিত না করে। (লামআলার ১৬০)

জনাবে হক্বের কাছে পৌছার মাধ্যম হবে এমন রাস্তা অনেক রয়েছে। সকল সত্যিকার রাস্তা সমূহ ক্বোরআন থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু তারিকাতের অধিকাংশ রাস্তা থেকে অনেক সংক্ষেপ ও অনেক প্রশান্তিমূলক অনেক জনসাধারণপূর্ণ রাস্তা হয়। ঐ পথ সমূহের মধ্যে অনেক বুঝ শক্তির দ্বারা ক্বোরআন থেকে উপকৃত হলাম, যা অভাব, দরিদ্র সহানুভূতির এবং তাফাক্কুরের পথই পেলাম। হাঁ অপারগতা ও সে ভালবাসার ন্যায়, বরং আরও প্রশান্তমূলক একটি রাস্তা যে ইবাদতের রাস্তার মাধ্যমে মাহবুবিয়্যাতের রাস্তায় যায় দরিদ্র ও রহমান নামটাকে স্পর্শ করে। এমনকি সহানুভূতিতা ও প্রেমভালবাসার ন্যায়, বরং আরও ধারালো এবং প্রশস্থ এক রাস্তা যে, রাহিম নামকে স্পর্শ করে। একিভাবে তাফাক্কুর ও এশকের ন্যায় বরং আরও ধনবান, আরও চাকচিক্যময় রাস্তা। আরও প্রশস্থ এক রাস্তা যে, হাকিম নামকে স্পর্শ করে। এই রাস্তা, হালকা রাস্তা সমূহের ন্যায় লাাতাইফে আ'শারা (দশটি পাতলা ও ঘন, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ঃ আবেগ, তারাহুড়া, অনুভতি, জ্ঞান, বেহুদা মনোবাসনা, প্রবৃত্তি, রাগ, কলব, রুহ, গোপন শক্তি সমূহ) ন্যায় দশ ধাপ নহে এবং উচ্চস্বরে যিকিরের পথের ন্যায় নুফুসু সাব'আ (সাতটি নফস তথা ১, নফসে আম্মারা, ২, লাউয়্যামা, ৩, মুত্মা'ইন্নাহ, ৪, রাজিয়া, ৫, মারজিয়্যাহ, ৬, সাফিইয়্যাহ, ৭, মুলহিমা) স্থরে শাখায়ীত ধাপসমূহ নহে বরং চার ধাপ থেকে প্রকাশিত। রাস্তা থেকে আরও হাকিকাত, শরীয়তপূর্ণ । ভূল বুঝা যেনো না হয়। তোমার অভাব ও দরিদ্রতা এবং ভুল ত্রুটি জনাবে হক্বের সম্মুখে দেখতে পাওয়া উদ্দেশ্য নতুবা ঐ গুলোকে আমল করা অথবা সৃষ্টি প্রদর্শন উদ্দেশ্য নহে। এই সংক্ষিপ্ত

রাস্তার বর্ণনাঃ যা সুন্নাতে নববীর অনুসরণ, ফরজ আমল কে আদায় করা, আমিত্য সমূহকে তরক করা। এবং বিশেষতঃ নামাজের মধ্যে তা'দিলে আরকান এর সাথে নামাজ পড়া। এর দ্বারা আরও উদ্দেশ্য নামাযের পরের তাসবিহাত সমূহ আদায় করা।

প্রথম ধাপের মধ্যেঃ আয়াত فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ ইঙ্গিত প্রদান করার ন্যায়। তাযকিয়ায়ে নফস না করা। যদিওঃ মানুষ জন্মগত ও স্বভাবগত ক্ষেত্রে স্বীয় নফসকে ভালবাসে। বরং প্রথমে এবং সত্বাগত। কেবল স্বীয় সত্বাকেই ভালবাসে। বাকী সবকিছুই নফসের জন্যে কোরবানী দেয়। ম'বুদের উপযুক্ত এক ধরন রীতিতে স্বীয় নফসের উপাসনা করে। স্বীয় মা'বুদের যোগ্য এক ত্রুটি-মুক্তির সাথে স্বীয় নফসকে দোষ সমূহ থেকে খুঁত এবং কলঙ্কমুক্ত হিসেবে দেখে । স্বীয় কর্মের ফলে আগত ভূলসমূহ তার কৃতকর্ম দেখে না গ্রহণ ও করে না। স্বীয় নফসকে পুজা করে এমন রকম রীতিতে কঠোরভাবে বাধাগুলোকে প্রতিবন্ধকতার দৃষ্টিতে দাড়ায়। এমনকি প্রকৃতিতে আমানত রাখা এবং মা'বুদে হাকিকির প্রসংশা ও তাছবিহের জন্যে তাকে প্রদানকৃত পঞ্চইন্দ্রিয় এবং যোগ্যতা স্বীয় নফসের অনুসরণে ব্যায় করে। এমনি করতঃ

مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰيهُ

যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরুপে গ্রহণ করে (ফুরকান-৪৩)

আলোচ্য অংশে তার অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবল নিজেকে দেখে, নিজেকে নির্ভর করে, নিজেকে পছন্দ করে এই ধারায় শোধিত হওয়া পবিত্রতাঃ যা এ রকম সমস্যা থেকে শোধিত না হওয়া নিরপরাধ থাকা বুঝায় না।

দ্বিতীয় ধাপের মধ্যে ঃ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَاَنْسٰيهُمْ اَنْفُسَهُمْ আলোচ্য আয়াত শিক্ষা দেওয়ার ন্যায়; নিজেকে ভূলে গিয়েছে নিজের ব্যাপারে কোন খবরই নেই। মৃত্যুর আলোচনাকে অন্যকে দিয়ে দেয়। অস্থায়ী ও চলে যাওয়া যদি দেখে নিজের জন্যে এটা নিবে না এবং কষ্ট ও খেদমতের মাকামে স্বীয় নফসকে ভূলে যাওয়া, তবে কেবল প্রতিদান গ্রহণ এবং মনোবাসনার ক্ষেত্রে উপকৃত হওয়া এমন মাকামে স্বীয় নফসকে চিন্তা করা, শক্তভাবে প্রয়োজনটা আদায় করণঃ এসবগুলো হল কু-প্রভৃত্তির দাবীতে যেন কিছু নহে। এই মাকামে শোধন পবিত্রতা অর্জন শিক্ষা লালন যা এই অবস্থা সমূহের ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ- নফসকে ভূলে যাওয়ার মধ্যে ভূলে না যাওয়া অর্থাৎ- মনোকামনার রূচি ও মনোবসানার আগ্রহসমূহকে ভূলে যাওয়া এবং মৃত্যুও খেদমতে দ্বীন কে চিন্তা না করা.....।

তৃতীয় ধাপের মধ্যেঃ مَّا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَّا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ উক্ত আয়াতের শিক্ষা দেওয়ার ন্যায়: নফসের দাবী, সার্বক্ষণিক ভাল এমনটি নিজে থেকে মনে করে আত্মহংকার এবং গরীমায় প্রবেশ করে। আলোচ্য ধারায় স্বীয় নফসের মধ্যে কেবল ভূল ও ত্রুটি, অভাব, দরিদ্রতা দেখে দেখে, উত্তমকর্ম ও পরিপূর্ণতাকে ফাতিরে যুল-জালাল এর পক্ষ থেকে কৃপাকৃত নেয়ামত সমূহ হওয়াটাকে মনে করতঃ অহংকারের স্থলে শুকরিয়া, প্রসংশার স্থলে নিজেকে বন্দি না করে আল্লাহর প্রসংশায় ব্যাস্থ থাকা। এই মরর্তবায় আত্মশুদ্ধিতা বর্ণিত قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰيهَا

যে নিজেকে শুদ্ধ করে সেই সফলকাম হয় (শামছ-৯)

আলোচ্য আয়াতাংশের উদ্দেশ্য হল যে, পূর্ণতাকে অপূর্ণতার মধ্যে ক্ষমতাকে অভাবের মধ্যে ধন কে দরিদ্রতার মধ্যে জানা।

চতুর্থ ধাপের মধ্যে ঃ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ আলোচ্য আয়াতের শিক্ষা প্রদানের ন্যায়: নফস নিজেকে স্বাধীন এবং স্বনির্ভর এবং অস্থিত্বশীল মনে করে। আর এর থেকে এক প্রকার খোদায়ীর দাবী করে। আসল মা'বুদের সম্মুখে দুশমনির ন্যায় এক অপরাধকে বহন করে। তাই আগত এই হাকিকাতের সাথে গভীর চিন্তার দ্বারা এই পাপ থেকে রক্ষা করে। হাকিকাতটি এরকম যে, সবকিছুই নফসের মধ্যে প্রত্যক্ষ নামবাচক অর্থের দিক থেকে ক্ষনস্থায়ী, অস্থিত্বহীন, দূর্ঘটনামাত্র, বিলুপ্ত জানে । কিন্তু এখানে প্ররোক্ষ। বর্ণমূলক অর্থের দিক থেকে, সানি-এ-যুল-জালালের নাম সমূহের প্রতি তুলনাময়তার দৃষ্টিতে এবং দায়িত্ব কর্তব্যের দৃষ্টিতে স্বাক্ষী স্বরূপ ও উপস্থিত সক্ষম এক অস্থিত্বশীল জানে । এই মাকামে আত্মশুদ্ধিতা ও পবিত্রতা হল এটা যে, অস্থিত্বে বিলুপ্তি বিলুপ্তিতে অস্থিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ যদি নিজে জানে যদি অস্থিত্ব দেওয়া হয়; কায়েনাত পরিমান এক বিলুপ্ত জুলুমাত এর ভিতরে বিদ্যমান। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বময় দেহের অস্থিত্যকে বিশ্বাস করতঃ মুজিদে-হাকিকি থেকে যদি গাফীল হয় তাহলে; নক্ষত্র পোকার ন্যায় এক আলোকিত আলোর বৈশিষ্ট্যময় অস্থিত্ব অসংখ্য জুলুমাতের বিলুপ্তিতে ও বিচ্ছেদের মধ্যে এটা পাওয়া হয়, খুঁজা হয় অন্য বৈ কিছু নহে। কিন্তু এনানিয়্যাত (আত্মহংকার) কে ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং নফসকে কিছুই না হওয়া এবং মুজিদে-হাকিকি এর এক তজল্লীর আয়না পাওয়ামূলক দেখার সময়, সমস্ত সৃষ্টিসমূহ এবং অগনীত এক অস্তিত্ব অর্জন করে। যদি সমস্ত সৃষ্টি সমূহ আল্লাহর নাম সমূহের উজ্জলতার প্রকাশিত হওয়া যাতে ওয়াজিবুল-উজুদ আল্লাহকে পাওয়া ব্যক্তি সবকিছু পায়.........।

উপসংহারঃ

এই অভাব, দরিদ্র, সহানুভূতী, তাফাক্কুরন্ত রাস্তার মধ্যকার চার ধারার ব্যাখ্যা, হাকিকাতের ইলমে, শরীয়তের হাকিকাতে ক্বোরআনের হিকমতে সংশ্লিষ্ট হওয়া ছাব্বিশটি কালেমায় আলোচিত হয়েছে। কেবল এখানে এক দুইটি পয়েন্টের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করব.......এ রকম যে,

হাঁ এই রাস্তা আরও খাটো। কেননা চার ধাপ বিশিষ্ট অভাবের হাত যদি নফস থেকে নির্গত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে কাদিরে-যুল-জালাল কে প্রদান করে। অথচ সর্বোচ্চ ধারালোকৃত এশক নফস থেকে শক্তিশালী হয়। কিন্তু কৃত্রিম মা'শুকের প্রতি জড়িয়ে যায়। তারপর এই কৃত্রিমতার বিলুপ্তিতে মাহবুবে-হাকিকি আল্লাহর প্রতি ফিরে। এমনকি এই রাস্তা অনেক প্রশান্তিমূলক। কেননা নফসের আধ্যাত্মিক পাগলামী এবং উচ্চ পর্যায়ে উন্নতী লাভকরণ দাবী সমূহ পাওয়া যায় না। কেননা অভাব, দরিদ্র, ভূলক্রটি থেকে অন্য নফসে পাওয়া যাচ্ছে না যে স্বীয় সীমানা থেকে অতিক্রম করুক বলে। এমনকি এই রাস্তাটি যেমন জনসাধারণের জন্যে তেমনি এটি জাদ্দায়ে কুবরা (বড় রাস্তা)। কেননা কায়েনাত আহলে ওয়াহদাতুল-ওযুদ এর ন্যায় চিরকালীন শান্তি অর্জনের জন্যে ফাঁসির আসামী ধারণা করে "লা মাউযুদা ইল্লা হু, (لا موجود الا هو) এর হুকুম প্রদানে অথবা আহলে ওয়াহদাতু-শশুহুদ এর ন্যায় হুজুরে দায়ীমী এর জন্যে কায়েনাতকে পূর্ণভাবে ভূলে জেলখানায় জেলের আসামী হিসেবে মনে করে "লা মাসহুদা ইল্লা হু " (لا مشهود الا هو) বলতে বাধ্য হচ্ছে না। বরং ফাঁসি থেকে বা জেলের শাস্তি থেকে অতি স্পষ্টভাবে ক্বোরআনী ক্ষমা করা থেকে এটাও অদৃশ্যমূলক রেখে ও সৃষ্টি সমূহকে স্বীয় হিসাবের তরে খেদমতে-দ্বীন থেকে হ্রাস করাতে ফাতিরে যুল-যালালের দৃষ্টিতে ব্যবহার করতঃ আসমায়ে হুছনার মাজহারিয়্যাত এবং আয়নার কর্তব্য আদায়কারী কর্মে ব্যবহার করতঃ হরফী অর্থের দৃষ্টিতে

ঐগুলোকে দেখে সার্বিক গাফলত থেকে রক্ষা করতঃ চিরকালীন শান্তিতে প্রবেশ করার পথ এই রাস্তা। যাতে প্রত্যেক বস্তুতে জনাবে হক্বের প্রতি পথ খুঁজে পাওয়ার মাধ্যম স্বরূপ। (সোজলার ৪৬৬)

হ্যাঁ, নফসকে পছন্দ কারী ও নফসের উপর বিশ্বাস কারী নিরেট তুমি পুড়াকপালি, দুর্ভাগা। যে তার নফসের দোষ-ত্রুটি দেখতে পায় সে হল বখতিয়ার, ভাগ্যবান। অতএব, তুমি ভাগ্যমান । কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয় যে , নফস কখনও হয় আম্মারায় বা লাউয়্যামায় নতুবা মুত্মা'ইন্নায় রুপ ধারন করে; তবে তোমার পরিশুধিত টেকনিকের অস্ত্রসমুহ ও ইন্দ্রিয় সমুহকে সে আবেগের দ্বারা প্রভাবিত, ও ঘুরাতে থাকে। আবার আবেগ ও ক্রুদ্ধ এটা জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমার সাথে চলতে থাকবে। যদিও তোমার নফসে আম্মারা অনেক আগে মারা গিয়েছে কিন্তু তার প্রভাব সমুহকে জীবন সায়াহ্নে দেখতে পাওয়া যায়। একজন অনেক বড় সুফি, অলি ব্যাক্তি যার নফস পূর্ণ পবিত্র তারপর ও তিনি নফসে আম্মারার আচরন দেখতে পেয়ে এই খবিস নফসের উপর আপত্তি তুলতেন-ই। তাদের কলব অতি পরিষ্কার ও নুরান্নিত হলেও তারা কলবের রোগ সমুহ থেকে বাচতে হাউমাউ করে কাঁদতেন। দেখ এই মহান ব্যাক্তিদের নফস এটা আম্মারা নহে, বরং তাদেরটা হল আবেগের মধ্যে ঘুরপাক কারী নফসে আম্মারার স্ফুলিঙ্গ বা দায়িত্ত। তাদের রোগকে চিন্তা করলে এটা রোগ নহে বরং কল্পনার রোগ। ইনশা-আল্লাহ আমার সুপ্রিয় ভাই আপনাকে আক্রমনকারী নফস এটা নফসের রোগ নহে, বরং আপনার মুজাহাদার পথ চলার জন্যে মানবিক বিবেচনায় আবেগে রুপান্তর কারী এবং সার্বক্ষণিক তরক্কির ক্ষেত্রে বাহানা, কারণ হওয়া এক অবস্থা এটা। (মাক্তুবাত ৩২৯)

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ "নফস সর্বদাই মন্দ, নিকৃষ্ট বস্তু সমুহতে আগ্রহী হয়"

اَعْدٰى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِى بَيْنَ جَنْبَيْكَ " তোমার সব চেয়ে ক্ষতিকর দুশমন হল তোমার নফস"

হাদিসের একটি পয়েন্ট। যার মধ্যে নফসে আম্মারার খেলা রয়েছে, এই শর্তে এই লোকটি কেবল নিজের নফসকে ভালবাসে অন্য কাওকে মোটেও পছন্দ করে না। অন্য কাওকে বাহ্যিক ভাবে ভালবাসলে ও সে কখনও আন্তরিক ভাবে ভালবাসবে না ভালবাসতে পারবে না । অন্যকে ভালবাসা মানে ঐ লোকটির থেকে অর্জিত লাভকে, মজাদার ব্যাপার গুলোকে ভালবাসা। এমন লোক সার্বক্ষণিক নিজেকে ভাল উপস্থাপন করতে ও ভালবাসা নিজের দিকে টানতে কাজ করে এবং তার কোন ভুল হলে সব সময় এটাকে নিজের নফসের দিক থেকে গ্রহণ করে না; বরং একজন এডভোকেটের ন্যায় ওকালতিতে নিজের ত্রুটিকে ঘুর-পাক খাওয়ানোর চেষ্টা করে, নিজেকে নির্দোষ সাব্যস্থ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। অতিরঞ্জতার মাধ্যমে, এমন কি প্রয়োজনে মিথ্যার মাধ্যমে নিজের নফসকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন দেখিয়ে স্বভাবজাতগতভাবে নিজেকে ভাল মানুষের কাতারে নিয়ে আসার বাহানায় ব্যাস্থ থাকে, ফলে তার কটুচারিতার লেভেল অনুযায়ী আলোচ্য مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰيهُ আয়াতের তাৎপর্য অনুসারে চড় খায়। নিজেকে প্রশংসিত করানো বা মানুষের আকর্ষণ টেনে ভালবাসা অর্জন, যা অবৈধ কর্মের দ্বারা জটিল থেকে জটিল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া বুঝায়, এভাবে প্রচন্ড ঠান্ডাকে সে কমিয়ে আনে। একই সাথে পরকালিন দৃষ্টিতে তার এখলাস নষ্ট হয়ে যায়, যা এক পর্যায়ে লোক দেখানোতে রুপ নেয়। পরিণতির শাস্তি না দেখে, ফলাফলকে চিন্তা না করে, উপস্থিত মজায় মজ্জিত হয়ে অনুভুতি ও প্রবৃত্তির নফসের কাছে হেরে গিয়ে, আশ্চর্যজনক পথের কাম-বাসনার ফতুয়ার মাধ্যমে, এক ঘণ্টার স্বাদের জন্যে এক বছর জেল খাটে। এক মিনিটের অহংকার এবং প্রতিশোদের জ্বালায় দশ বছর শাস্তি ভোগ করে। (লাম'লার ২৭৬)

يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

আলোচ্য আয়াতের একটি সারকথা হলঃ এই যামানার একটি ভিত্তি মূল হচ্ছে, মানুষের তার জ্ঞান থাকা সত্তেও পার্থিব দুনিয়েকে চিরস্থায়ী জগতের উপর প্রাধান্য দেওয়ানো। অর্থাৎ, ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন একটি অবিনশ্বর হীরার টুকরার বিপরীত জেনে শুনে ভেঙ্গে যাবে এমন এক কাঁচের টুকরাকে গ্রহণ, প্রাধান্য দেওয়া, এটি একটি দস্তুর, রীতি হয়ে গিয়েছে। আমি এর উপর অনেক ফাঁপরতা, হতভম্ভতায় ভুগছিলাম। আজকাল এটা অবহিত হলাম যেঃ যেমনটি মানুষের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে, ক্ষত হলে, অন্যান্য অঙ্গ সমূহ তাদের কাজ ব্যাতিরেখে অসুস্থ অঙ্গের সাহায্যে এগিয়ে আসে। একই ভাবে, মানুষের জীবনে থাকা লোভ ও হেফাজত ক্ষমতা, এবং রুচি-বোধ ও তার প্রীতি-অনুরাগকে বহনকারী ও মানবের প্রকৃতির মধ্যে উন্নীত হওয়া একটি মানবিক সরঞ্জাম-প্রক্রিয়া, যা অনেক কারনে বিক্ষত হয়েছে, অন্যান্য ইন্দ্রিয় লাতিফাকে, সুক্ষ বিষয়াদিকে নিজের সাথে ব্যাস্থ রেখে নীরব করে রাখতে শুরু করে; অন্যান্য ইন্দ্রিয়দেরকে তাদের মূল দায়িত্ত থেকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। আবার দেখুন, যেমন কোন মানুষ জযবাদার, অশ্লীল মুখী, টালমাটালি, চিত্তাকর্ষকীয় কোন নির্লজ্জ ফুর্তি-আমোদের সুযোগ যদি পায়, তাহলে সে দুষ্ট শিশুদের ও ছিলান টাইপের লোকদের ন্যায়, বড় বড় ধাপে তরান্বিত হওয়া মানুষেরা এবং পর্দাবৃত মহিলারাও ঐ চাকচিক্যময়তায় অংশগ্রহণ করে তাদের আসল দায়িত্তকে ভুলে গিয়ে পিকনিকের ন্যায় মজায় নিমজ্জিত হয়। একইভাবে এই যামানায় মানবের জীবন, বিশেষ করে সামাজিক জীবন এমন এক আক্রমণাত্মক ও যন্ত্রনাকর, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ এক অবস্থান গ্রহণ করেছে যেঃ মানবের উচ্চ সুক্ষ ইন্দ্রিয় সমুহকে ও কলব, আকলকে, নফসে আম্মারার পিছনে ফেলে রেখে, ফ্যানের নায়ায় ঐ ফিত্নার অগ্নিতে নিক্ষেপিত করছে। তবে এটা সত্য দুনিয়ার জীবনের হেফাজতের জন্যে প্রয়োজনের পরিস্থিতির শর্তে অনেক পরকালিন নির্দেশনাকে উপস্থিত প্রেক্ষাপটের ধারায় একটু পাশে রাখা শরিয়তে অনুমতি রয়েছে; তবে কোন সাধারণ প্রয়োজনের তাগিদে বা মারাত্মক কিছু না হলে এমনটি করা যাবে না, তার সুযোগ নেই। অথচ এই যুগে, মানবের সীমানা ঐ পরিমাণ অতিক্রম করেছে যে, ছোট কোন প্রয়োজনের তাগিদে, অতি সাধারণ ব্যাপারে হীরকের তুল্য দ্বীনী, ধর্মীয় হুকুমকে ছেড়ে দিচ্ছে।

হাঁ, মানবের জীবন চলনের সিমারেখা ও জীবন রক্ষার পাথেয়কে, এই যুহে অপচয়ের মাধ্যমে, অমিতব্যতার দ্বারা, অপরিমিত ব্যায়, অধৈর্যতা, লোভের কারনে বরকতের উটে যাওয়ার দ্বারা আগত প্রয়োজনীয় অভাব, এবং জিবিকার পাগলামি ঐ পরিমানে বেড়েছে বিক্ষত হয়ে আছে এবং জীবনের ধারাবাহিকতা এতটাই ভারি হয়ে আছে যে এ যেন এক মু'মিন আহলে দালালাতের অনুসরনে মত্ম, তাদের ছিলানি, বিছ্রিতা দেখে দেখে তার নিজের সুক্ষ ঈমানি দৃষ্টিপাত ক্ষমতা এতই নীচে নেমেছে যে, একেবারেই সাধারণ একটি জীবন মুখী প্রয়োজনের তাগিদকে, অনেক বড় এক দ্বীনই মাস'আলাকে, ব্যাপারকে সে তরক করছে, দুনিয়ার মজা তরক করাচ্ছে, যেন ঠের-ই পাচ্ছে না। এই বিস্ময়কর যুগের আশ্চর্যময় রোগের বিপরীত কোরআনে মু'জিযুল বায়ানের চিরুনি-তুল্য উদাহারনের ঔষধ সমূহের উপস্থাপক হল রিসালে নূর ও এটাই যুগপুযুগি ভারসাম্যময় এক শক্তি; এই রিসালে নুরের ইবারাত, সুমিষ্টময়, উদার, খালিস, সত্যবাদী, জীবন কোরবানকারী সুহৃদদের স্থায়িত্ততাই হল তার প্রমান। সুতরাং ব্যাপার যখন এরকম সর্ব প্রথম কাজ হল রিসালে নুরের ভিতরে প্রবেশ করা সত্যবাদিতার সাথে, উদারতার সাথে পরিপূর্ণ এখলাসের সাথে ও পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে তার সাথে জড়িত হওয়া এতই প্রয়োজন যেঃ যাতে করে এই যামানার ঐ ধ্বংসাত্মক রোগের আক্রমন থেকে নিজেকে হেফাজত করতে সক্ষম হয়। (কাস্তামুনু ১০৪)

স্বীয় নফসকে ও সম্পদকে মহান আল্লাহর কাছে বিক্রি করা তার প্রিয় বান্দা হওয়া কত উচুঁ মানের লাভজনক একটি ব্যবসা কি পরিমাণ মহা সম্মানের এক উচ্চস্থর হওয়াটা এখন আমরা বিক্রি করাটাকে দেখব। আসলেই এটা কি খুবই জটিল বা ভারী বিষয় নাকি, সকলেই বিক্রি করা থেকে পালাচ্ছে। না অকাট্যতার নিরিখে

কাখনও এমন খুবই জটিল বা ভারী বিষয় নহে। যদিও হালালের আশপাশ অনেক প্রশস্ত্ যা চাহিদার জন্যে যথেষ্ট। হারামের দিকে অবনত হওয়া মোটেও প্রয়োজন নেই। মহান এলাহীর ফরজ সমূহকে চিন্তা করি এগুলো অনেক পাতলা এবং অল্প। আল্লাহর গোলাম এবং তার সেনা হওয়া এমন এক সুসম্মানীময় মজাদার বিষয় যে, এর পরিচয় করানো অসম্ভব। আবার যদি দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে চিন্তা করি তাহলে কেবল একজন সৈন্য হিসেবে আল্লাহর নামে কাজ করা, শুরু করা আবশ্যক আর আল্লাহর হিসেবের বিবেচনায় দেওয়ার থাকলে দেওয়া এবং নেওয়া। এবং তার অনুমতি ও নিয়ম-নীতির আওতায় থেকে চলাফেরা নড়াচড়া করা প্রশান্তি অর্জন করা যদি ভূল করে তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা ইস্তেগফারের দ্বারা করা হে আল্লাহ আমাদের ভূল-ত্রুটিকে আপনী ক্ষমা করুন। আমাদের কে আপনার বান্দা হিসেবে গ্রহণ করুন্ আপনার আমানত কে ফিরিয়ে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমাদেরকে এই আমানতের উপর বিশ্বস্থ বিবেচনা করুন। আমীন বলা জরুরী এবং তার কাছে আকুতি মিনতি করা অত্যাবশ্যকীয়। (সোজলার ২৫)

রিযিক / জীবিকা

মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী জীবিকা অন্বেষণে পারিবারিক সমস্যায় পরে না। উক্ত কথার ধারবাহিকতায় لَا يَعُولُ مَنِ اقْتَصَدَ হাদীসে শরীফের অংশের দ্বারা স্পষ্ট যে মিতব্যয়ী লোক রিযিক তলবের ক্ষেত্রে পারিবারিক যন্ত্রণাবলী ও সমস্যাবলীর খুব বেশি সামনা সামনি হয় না। অবশ্য সঠিক সঞ্চয় অকাঠ্য এক বরকতের কারণ ও জীবিকার নির্বাহের উত্তম এক মাধ্যম হওয়াতে ঐ পরিমাণ প্রমাণাদি রয়েছে যা অসংখ্য ও অগণিত। মোট কথা আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি ও আমাকে খেদমতকারী ও বন্ধু ভাবাপন্ন সত্বাসমূহের সাক্ষী স্বরূপ বলছি যে, ইকতেসাদ (প্রয়োজনীয় খরচ) এর দ্বারা একের মধ্যে দশ গুণ বরকত দেখেছি এবং আমার বন্ধুগণ ও দেখেছেন। এমনকি নয় বছর এখন থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে আমার সাথে বরাবর বুরদর (স্থান) এর নির্বাসিত হওয়া নেতৃস্থানীয় কিছু লোক অর্থের অভাবে দুর্ভোগ ও দুর্যোগে আমি যেন না পড়ি সে জন্যে যাকাত গ্রহণ করাতে আমাকে তারা অনেক চেষ্টা করেছে। তখন ঐ ধ্বনী নেতাদেরকে বলিলাম যে বাস্তবে আমার টাকা খুবই কম; কিন্তু আমার মিতব্যয়ীতা আছে; অল্পতুষ্টে আমি অব্যস্থ হয়ে গিয়েছি তাই আমি আপনাদের থেকে ও অনেক ধ্বনী।” পর পর জোড়াজোড়ি করার পরও তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছি। মাহাত্মের বিষয় হল যে দুই বছর পর যারা আমাকে যাকাত দিতে চেয়েছিল তাদের কেউ কেউ মিতব্যয়ী না হওয়ায় ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। ‘সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্যে তাদের থেকে সাত বছর পর ঐ অল্প টাকার সঞ্চয়ী বরকতের সাথে আমার জন্যে যথেষ্ট হল।

আমার অভাব দেখা দেয় নাই। এবং জনগণের কাছে দুনিয়াবী প্রয়োজনে হাত পাততে বাদ্য হই নাই। আমার জীবনের এক সংবিধান হওয়া বাক্য “আল্লাহ ব্যতীত কারও কাছে না চাওয়া” এমন নিয়ম ও আমার ভঙ্গ হয় নাই।”

হ্যাঁ মিতব্যয়ী না হওয়া লোক, লাঞ্চনা ও ভিক্ষাবৃত্তিতে আধ্যাত্মিকভাবে জড়ানো এবং কু-প্রভৃত্তিতে মিশ্রিত হওয়াটা স্বাভাবিক। এই যুগে অপচয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া লোক টাকাকে অনেক মূল্যবান মনে করে । কেননা অনেক সময় তারা বিপরীত স্থর, চরিত্র, ঘুষ গ্রহণ করে। অনেক সময় দ্বীনের পবিত্রতা কে বিসর্জন দিতে হয় যার ধরূণ অসৎ টাকা প্রদান করা হয়। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক একশত টাকা ক্ষতি করে বস্তুগত একশত টাকার কোন মূল্য নেই। যদি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতঃ একান্ত জরূরী ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ও সীমিত এবং দুঃখ মনোভাবে ধৈর্য ধরে তাহলে,

إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (যারিয়াত ৫৮) আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এবং

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ (হুদ ৬) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট যে অজানা থেকে আগত এমন ভাবে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় রিযিক লাভ করবে। কেননা এই আয়াত অঙ্গীকার প্রদান করছে।

রিযিক ২ প্রকারঃ একটি হল হাকিকি (প্রকৃত) রিযিক = এই রিযিকের দ্বারা জীবনযাপন করবে। এই আয়াতের হুকুমের দ্বারা এই রিযিক প্রতিষ্ঠিত। এটা আল্লাহর ওয়াদার হস্তে ন্যাস্ত। মানুষের মন্দ রুচির ব্যবহার যদি না করে তাহলে এই আবশ্যকীয় রিযিক কে সার্বক্ষণিক ভোগ করবে। এর জন্যে মানুষ না দ্বীন না ইজ্জত কোনটাকেই এর জন্যে উৎসর্গ করতে বাধ্য নহে।

অপরটি হল মাজাযী (রূপক) রিযিক = মন্দ রুচির ব্যবহারের দ্বারা অপ্রয়োজনীয় চাহিদাকে প্রয়োজনীয় চাহিদার সাথে সংমিশ্রণ করত; যুগের তালে যোগ দিয়ে এখান থেকে বের হতে পারে না। অত:এব এই রিযিক, আল্লাহর ওয়াদার মধ্যে না হওয়ার কারণে এই রিযিক কে অর্জন করা, বিশেষত এই যামানায় খুবই দূর্লব ব্যয়বহুল। প্রথমে ইজ্জতকে বিসর্জন দিয়ে, যিল্লতিকে গ্রহণ করা, মাঝে মাঝে নিম্নশ্রেণীর মানুষের পাঁয়ে চুম্বন করত; আধ্যাত্মিক এক ভিক্ষাবৃত্তির ন্যায় কাজ কর্মে নামা। মাঝে মাঝে চিরস্থায়ী হায়াতের নূর হওয়া দ্বীনের পবিত্রতা বিসর্জন দেওয়ার আকৃতিতে ঐ বরকতহীন নিকৃষ্ট মালকে অর্জন করে। এমনকি এই অভাবী যামানায় ক্ষুধার্ত ও মুখাপেক্ষীদের কষ্টসমূহ থেকে আগত শিক্ষা যা সমমানের ও গোত্রের দ্বারা আগত ঐ বেআইনী পদ্ধতিতে অর্জিত টাকার দ্বারা আনিত স্বাদ, মানুষের বোধগম্য ক্ষমতা যদি থাকে তাহলে এই স্বাদ যন্ত্রণা প্রদান করে মনে মনে। এমন বিস্ময়কর যুগে সন্দেহময় জিনিসপত্রের মধ্যে প্রয়োজনের চাহিদা মোতাবেক যথেষ্ট তুষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক মনে করে। কেননা إِنَّ الضَّرُورَةَ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا উক্ত ব্যাকাংশের দ্বারা-হারাম মাল থেকে, জীবন বাঁচানোর পরিমান অনুযায়ী গ্রহণ করা যেতে পারে; অতিরিক্ত অগ্রহনযোগ্য; তবে হাঁ কোন নিরূপায় ব্যক্তি মৃতের গোস্ত পেঠ ভরে খেতে পারবে না। বরং কেবল বেঁচে থাকার পরিমাণ খেতে পারবে। এবং এটাও সত্য শত খানেক লোকের উপস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ স্বাদের সাথে বেশী খাওয়া যাবে না।

ইকতেসাদ (মিতব্যয়ীতা) ইজ্জতের কারণ ও পূর্ণতার-----------প্রমাণ ভিত্তিক ঘটনাঃ

একবার, দুনিয়াতে বদান্যতায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হাতিমতাই, বড় আকারে এক খাবার দাবারের দাওয়াত প্রদান করলেন। মুসাফিরদের উপঢৌকন প্রদানের সময় মরুভূমিতে বের হলেন। দেখলেন যে, একজন গরীব বয়স্ক লোক ভারী বোঝা বহন করছে। বোঝায় তার শরীরটা নুয়ে পড়েছে কাটাযুক্ত ঝোপ হওয়ায় রক্ত ঝরচ্ছিল। হাতিম তাহাকে বলিলেন যে, হাতিমতাই উপহারের পাশাপাশি মূল্যবান এক জিয়ারতের আয়োজন করেছে। তুমিও ওখানে যাও; পাঁচ পয়সার ঝোপের বোঝার বদলে অনেক পয়সা গ্রহণ করতে পার। তখন ঐ মিতব্যয়ী বলেছিল যে আমি এই কাঠাযুক্ত ভার বহন করব এটাই আমার সম্মান অর্জন হাতিমতাই এর দান আনব না। পরে হাতিমতাই কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তুমি তোমার থেকে আরও জোয়ান পুরুষ, প্রিয়, কাওকে কি পেয়েছ? হাতিম বলেছিলেন যে, এই সাহারাভূমিতে কর্মরত ঐ মিত্যবয়ী লোকটিই হল প্রিয় অনেক উন্নত ও অনেক শক্তিশালী লোক আমি মনে করি। (লাম'আলার ১৪১)

وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ * اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম থেকে স্পষ্ট হয় যেঃ রিযিক নিরঙ্কুশ ভাবে অতি সত্য কথা হল এটা আল্লাহ্র হাতে। এবং এটা রহমতের খাজিনা থেকে বের হয়। প্রত্যেক প্রানবাহিদের রিযিক, মাহান পালনকর্তার রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্তে

হওয়াতে, ক্ষুধায় মারা যাওয়া, মারা না যাওয়ার আবশ্যকতা দেখা দেয়। অথচ , বাহ্যিকভাবে দেখতে পাওয়া যায় না খাওয়ার কারনে বা খাবারের অভাবে অনেকে মরে। এই হাকিকাতের এই রহস্যের সমাধান হল এই যেঃ পালনকর্তার রক্ষণাবেক্ষণ এটাই বাস্তবতা। রিযিকের অভাবে মৃত্যুবরণ কারী আসলেই নাই। ঐ হাকিমে যুল-জালাল, প্রানবাহিদের দেহে প্রেরণকৃত রিযিক সমূহের থেকে এক প্রকারের অতিরিক্ত সতর্কতার জন্যে চর্বি ও মেদের আকৃতিতে মজুদ, সংরক্ষণ করেন। এমনকি দেহের সমস্ত সেল সমূহে প্রেরিত রিযিকের একাংশকে, ঘুরিয়ে ঐ সেল সমূহের আশপাশে গুদামজাত করেন। ভবিষ্যতে বাহির থেকে কখনও ভিতরে রিযিক প্রবেশ না করলে, ঐ সময় যেন ঐ মেদ সমূহ খাবারের ন্যায় ভারসাম্যতা রক্ষা করে। সুতরাং, এই গুদামজাত কৃত চর্বি নামক রিযিক শেষ হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করাটা, খাবারের অভাবে হয় না। বরং মন্দ ইচ্ছা শক্তির ব্যাবহারের কারনে তৈরি হওয়া অভ্যাস, এবং ঐ মন্দ ইচ্ছা শক্তি ও অভ্যাসের ছেড়ে দেওয়ার করনে যে রোগ সৃষ্টি হয় এর কারনে মারা যায়। হাঁ, প্রানবাহিদের দেহে থাকা চর্বির আকৃতিতে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক-রিযিক, যা কমবেশি চল্লিশ দ্বীন পূর্ণভাবে চলতে পারে। এমনকি কোন রোগের অথবা রুহের দাপাদাপি করনে পরিশেষে আশি দ্বীন পর্যন্ত চলতে থাকে। বলাবাহুল্য, একজন লোক লন্ডনের জেলখানায় সত্তর দিন সু-শাস্থের মাধ্যমে, কিছু না খেয়ে প্রান চালিয়ে জাওয়ার প্রমাণটা, তের বছর এখন থেকে ত্রিস বছর পূর্বে পত্রিকাতে এই ঘটনা লেখা হয়েছিল। যেহেতু চল্লিশ দিন থেকে সত্তর-আশি দিন পর্যন্ত ফিতরি-রিযকের মাধ্যমে চলতে পারে, এবং যেহেতু আল্লাহ্‌র রাযযাক নামটি অতি বিস্তৃত ভাবে জমিনের উপরে দেখা যাচ্ছে, এবং মোটেই আশা না করার এক পন্থায়, স্থন থেকে ও কাঠ-কয়লা থেকে রিযিক সমূহ ভাসছে, তার রুপ দেখাচ্ছে। এখন যদি অনিষ্টে মজ্জিত এই মানুষ, মন্দ ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রবেশ না করে, তাহলে সর্বদা প্রাকৃতিক-রিযিক শেষ হওয়ার পূর্বে, ঐ প্রানবাহি প্রাণীর কাছে রাযযাক নামের সাহায্য পৌঁছাবেই, খাদ্যের অভাবে মৃত্যুকে সুযোগ দিবে না। বাস্তবতা যখন এরকম, তাহলে ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ কারীরা যদি চল্লিশ দিন পূর্বে মারা যায়, এখন এটা অকাঠ্য ভাবে প্রমাণিত যে এটা খাবারে অভাবে হয় নাই। বরং তরকুল-আদাত-মিনাল-মুহ্লিকাত তথা মন্দের অভ্যাস বিনাশ টেনে আনে, উক্ত কথার দ্বারা বুঝা যায়, মন্দ ইচ্ছা শক্তি থেকে আগত কোন খাসলাত আর এই অভ্যাসে বিভুর থাকার কারনে ভোঁতা দেহ অভ্যাসের দূরীভূত হওয়ার ফলে যে গতির, রোগের উৎপত্তি হয় ঐটা থেকে তার মৃত্যু হয়েছে। একইভাবে, ক্ষুধা থেকে মৃত্যু অসম্ভব, তবে টেস্ট করা যেতে পারে। হাঁ, উপস্থিত প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে যে, রিযিক ক্ষমতা ও ইচ্ছার সাথে বিপরিতভাবে উপযুক্ত। যেমন, এখনও দুনিয়াতে আসে নাই এমন শিশু, মায়ের উদরে ইচ্ছা ও ক্ষমতা থেকে পুরোপুরি ভাবে বঞ্চিত সময়কালে, তার মুখকে উন্মন্থন বা নাড়ানোর ক্ষমতা নাই এমন অবস্থায় এক পন্থায় তাহাকে রিযিক দেওয়া হচ্ছে। পরে দুনিয়াতে আসার সাথে সাথে, তখন ক্ষমতা ও ইচ্ছার শক্তি নেই, কিন্তু এক প্রকার অনুভুতি শক্তি ও তেজ থাকার সাথে, শুধু মাত্র তার মুখে এটে দেওয়া পরিমাণ একটি নড়া-চড়ার প্রয়োজনের সাথে সর্বাপেক্ষা মুকাম্মাল, অতি পুষ্টি যোগানী, হজম কারক, অতি সহজ ও মোলায়েম এক পন্থায় এবং আত্যান্ত বিস্ময়কর এক স্বভাবজাত ভাবে, মায়ের স্থনের ফোয়ারাতে তার মুখ লাগানো হয়। এর পরে যখন তার ইচ্ছা ও শক্তির একটি চিহ্ন ফুটে ওঠে, তখন ঐ সহজ ও মসৃণ রিযিক, এক মাত্রার কম বয়সী শিশুর যত্ন আদরের সময়কালে শুরু হয়। তখন ঐ স্থনবৃন্ত এর ঝরনা আর দেওয়া হয় না, অন্য স্থান সমূহ থেকে তার রিযিক প্রেরণ করা হয়। তবে এখনও ক্ষমতা ও ইচ্ছার শক্তি অর্জন না হওয়ার কারনে, রাযযাকে-কারিম, মাতা-পিতার স্নেহশীলতা ও কৃপা সমূহকে, তার ক্ষমতা ও ইচ্ছার সময় পর্যন্ত সাহায্য হিসেবে প্রেরণ করেন। যখনি তার ক্ষমতা ও ইচ্ছার পূর্ণতা পাওয়া যায়, ঐ সময় রিযিক তার কাছে এসে দৌড়ায় না, রিযিক তার স্থানে দাড়িয়ে থাকে। আর তাহাকে বলেঃ " আসো এবং আমাকে খুঁজ আর আমাকে পাও ও মুখে নাও" এর অর্থ হল রিযিক ক্ষমতা ও ইচ্ছার সাথে বিপরীত ভাবে উপযোগী। এমন কি অনেক রিসালা সমূহে আলোচনা হয়েছে যে, নিরেট ক্ষমতাহীন ও ইচ্ছা হীন প্রানিরা আরও ভাল জীবন যাপন করছে, আরও ভাল ভাবে খাওয়াচ্ছে। (লাম'লার ৬৩)

اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

একের পর এক রিযিক যার হাতে পায় না, যে অক্ষম ও ক্ষমতাহীন এমন দুর্বল বেচারাদের রিযিক সমুহ; অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে, বরং গাইব থেকে, কোন ক্লুহীন অবস্থা থেকে, যেমন, সাগরের নীচের পোকাদেরকে কোন ক্লু ছাড়া তার ছানাদেরকে ধারণাতীত স্থান থেকে সমস্ত প্রাণীদেরকে প্রত্যেক মৌসুমে স্বভাবজাতভাবে, স্বাভাবিক ভাবে কেবল অদৃশ্য, গাইব থেকে তাদের সকল প্রয়োজনকে স্বহস্তে দায়িত্ত নিয়ে সরাসরি রিযিক দেওয়াটা; মহান রাজ্জাকে-যুল-জালালের রহমত সামনে ভেসে ওঠে। শুধু তাই নয়, নাস্তিকদেরকেও তাদের প্রকৃতির পর্দার নীচে ঘুরে ফিরে তিনি-ই রিযিক দেন এমনটি প্রমান, ঘোষণা দেওয়ার ন্যায়; অসংখ্য কোরআনের আয়াত ও দুনিয়ার ঘটনা সমূহ, ঐক্যমতে প্রমান করে যে প্রত্যেকটি প্রানবাহি প্রাণীর কেবলমাত্র একজন রাজ্জাকে-যুল-জালালের রহমতের সাথে তিনি পানাহার করাচ্ছেন।

হাঁ, এক প্রকার রিযিকের আগ্রহী বৃক্ষ সমূহ তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতা না থাকা সত্তে, তারা তাদের স্ব- স্ব স্থানে দাড়িয়ে থাকার বেলায় তাদের রিযিক তাদের কাছে দৌড়িয়ে আসাটা, এবং অক্ষম কচি বাচ্ছাদের খোরপোশ ব্যায় সমুহকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার নিরিখে তাদের মুখ সমূহে প্রস্রবণ ও ঐ কোলের শিশুদেরকে এক সময় যখন তারা কিছুটা ক্ষমতা ও ইচ্ছার প্রকাশ দেখায় তখন স্থনের দুধের ফোয়ারা কর্তন করা, বিশেষত মানুষের কচি বাচ্ছাদের মায়েদের স্নেহপরায়ণতা সাহায্য প্রদান, স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি প্রতীকী-প্রমান যে, হালাল রিযিক, ক্ষমতা ও ইচ্ছার সাথে সুসমঞ্জস, সংশ্লিষ্ট নহে নহে মোটেও নহে, , , বরং দুর্বলতা ও অক্ষমতার তাওয়াক্কুলের নির্ভরতার থেকে এই রিযিক আসছে।

সংখ্যাগুরু, ক্ষতির কারণ হওয়া লোভকে গতিময় কারী ক্ষমতা ও রুচি, ধারালো দেমাগ শক্তি, এক প্রকার বড় মাপের শিষ্টাচারীতার মধ্যে এবং ঐ আদব সমূহের থেকে একটি বাহানা ভিক্ষাবৃত্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর ন্যায়; হোঁচট পূর্বক, অমসৃণ দক্ষতা, এবড়-থেবড় অনেক মূর্খ মানুষের অক্ষমতার নির্ভরতা ও তাদের মাল সম্পদের অধিকারী, ধনী হওয়াটা আলোচ্য পংক্তিতে উদাহারন স্বরূপ ফুটে ওঠে। كَمْ عَالِمٍ عَالِمٍ اَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ وَ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا

কতক জ্ঞানিদের জ্ঞানি জীবন জীবিকা তাদের অস্তমিত

আর কতক মূর্খের মূর্খ জীবিপায় কায় তারা অগণিত।

হালাল রিযিক ক্ষমতা, ইচ্ছা শক্তির দ্বারা করা হয় না, পাওয়া যায় না। বরং ব্যাক্তির কাজ করা ও তার মেহনতকে গ্রহণকারী এক অনুগ্রহের দিক থেকে দেওয়া হয় এবং অভাব ও চাহিদার তরে মুখাপেক্ষিতার ক্লেশের প্রতি এক কৃপার দিক থেকে অনুগ্রহ বৈ কিছু নহে। রিযিক দুই প্রকারঃ

একঃ বসবাসের জন্যে আসল, মৌলিক রিযিক এটা এমন যে, যা পালনকর্তার রক্ষনাবেক্ষনের হাতে জব্দ রয়েছে। এমনকি এটা এতটাই সুবিন্যাস্থ যে, দেহের মধ্যে থাকা, চর্বি বা অন্যান্য পন্থায় সংরক্ষিত বাহির থেকে দেখা যায় না এমন প্রাকৃতিক রিযিক থাকার কারনে, খাবারের কিছুই যদি না থাকে তার পরও মিনিমাম বিশ মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে। জীবন চালিয়ে যেতে পারবে, মরবে না। এর মানে হল বিশ-ত্রিশ দিনের পূর্বে এবং দেহের মধ্যে থাকা তৈলাক্ত রিযিক সমূহের শেষ না হওয়ার পূর্বে যদি কেউ মারা যায় পরিষ্কার ভাবে বলা যায় যে এই মৃত্যু রিযিকের অভাবের কারনে বা খাবার না খাওয়ার কারনে হয় নাই। বরং এমন মরণ যাদের হয় তারা মন্দ অভ্যাসগত, মন্দ জীবন যাপন এর কারনে ভাল অভ্যাসের ত্যাগের কারনে রোগ, দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে তারা মারা যায়। দুইঃ খারাপ অভ্যাস, অপচয় এবং

অপব্যাবহারের সাথে অভ্যস্থ হয়ে প্রয়োজনের আওতাদিনে আনিত, অতিরিক্ত এমন কৃত্রিম ও নকল রিযিক কে বুঝায়। এই প্রকার রিযিক যা এলাহির রক্ষনাবেক্ষনের দর্পণে থাকে না, বরং তার এহসানের, কৃপার অনুগামি। কখনও দেওয়া হয় কখনও দেওয়া হয় না।

এই দ্বিতীয় প্রকার রিযিকের মধ্যে, ঐ ব্যাক্তি ভাগ্যবান যে; সৌভাগ্যের স্বাদ ও কারণ হওয়া মিতব্যয়ী ও অল্পেতুষ্টি, হালাল পথে প্রচেষ্টা কারী, এক প্রকার ইবাদাত ও রিযিকের জন্যে এক কর্মকারক দোয়া মনে করে কৃতজ্ঞতার পন্থায় কাকুতি-মিনতির উসিলায় ঐ এহসানকে কবুল করায়ে ব্যাক্তি তার জীবনকে সুখ-সাচ্ছন্দে যাপন করে যায়। আর দুর্ভাগা ঐ ব্যাক্তি যে; অভিযোগ ও লাঞ্চনার, কষ্টের মাধ্যম হওয়া অপচয় ও লোভের দ্বারা হালাল প্রচেষ্টাকে ছেড়ে দিয়ে প্রত্যেক দরজায় হাত বাড়িয়ে, অলসতার ও জুলুমের এবং অনুযোগের জীবনকে যাপন করে, এমনকি নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। (সোয়ালার ১৭২)

যেহেতু রিযিক হল নিয়ন্ত্রিত এবং এহসান করা হচ্ছে এবং দানকারী স্বয়ং মহান আল্লাহ; তিনি যেভাবে রাহমান তেমনি কারিম ও। তার রহমতের প্রতি অভিযোগ করে ও তার করিমিয়তের প্রতি অবজ্ঞা করে এক প্রকার অবৈধ পন্থায় মুখে গরম পানি দিয়ে; স্বীয় অনুভূতিতে এমনকি অনেক পবিত্রতায় ঘোষ দিয়ে উর্বরহীন, বরকতহীন এক হারাম মালকে গ্রহণকারী যেন চিন্তা করে যে, এমন আচরন কি পরিমাণ নিকৃষ্ট ও পাগলামি। হ্যাঁ, আহলে দুনিয়া বিশেষ করে আহলে দালালাত; কাউকে এমনি এমনিতে টাকা পয়সা দান করবে না। অনেক বিকল্প পথ খুজবে। এক বছরের দুনিয়ার জীবনকে মালের বিপরীত এমন এক রকম সাহায্য করবে, যা সীমাহীন আখেরাতের জীবনের প্রতি মাঝে মাঝে বিনাশ কারী হিসেবে দাম্ভিকতার, খোঁটা দেয়ার উসিলা বানায়। তার ঐ নিকৃষ্ট লোভের দ্বারা এলাহির গোস্বাকে তার প্রতি সে নিজেই আসতে দেয় এবং সে খারাপ মানুষ গুলোর সন্তুষ্টির লক্ষে কাজ করে যায়, যেন নিজেই ঠের পাচ্ছে না।

হে আমার স্নেহের ভাইয়েরা! যদি দুনিয়া মুখীদের পার্শ্বচরতা, পার্ষদ সমূহ ও আহলে দালালাতের মুনাফিকরা, আপনাদেরকে, মানবতার এই দুর্বল রক্তনালী হওয়া অতৃপ্তির লোভ দেখিয়ে প্রলুব্ধতার কারনে আক্রমন করে ,ধরে ফেলে তাহলে গত উপদেশ সমুহকে মনে করে আপনাদের এই ছোট ভাইকে শিক্ষা দৃষ্টান্ত-নমুনা হিসেবে গ্রহণ করবেন। আমার সমস্ত শক্তির দ্বারা বিশ্বাস করছি যে, অল্পতুষ্টি ও মিতব্যইতা, চাকরির বেতনের চেয়ে বেশী আপনাদের জীবনকে আরও সচল, সহজভাবে চলার এবং আপনাদের রিযিকের প্রতি আত্মবিশ্বাস তৈরি করবে। অতি বি   শেষ কথা বলছি, আপনাদেরকে প্রদানকারী অবৈধ টাকার বিপরীতে দুনিয়ার পক্ষ থেকে, আপনাদের থেকে এতে আরও হাজার গুণ বেশী চড়া মুল্য চাওয়া হবে। ফলে যেখানে প্রত্যেক ঘণ্টা চিরস্থায়ী এক খাজিনা খোলার কথা, কোরআনের খেদমতের পথে এটা একটি বাঁধ হয়ে দাঁড়াবে নতুবা সমস্যার সৃষ্টি করবে। এটা এমন এক ক্ষতি ও শূন্যতা যে, প্রত্যেক মাসে যদি হাজার হাজার টাকা বেতন দেওয়া, পাওয়া হয় তবুও ঐ যায়গা পূর্ণতা পাবে না। (মাক্তুবাত ৪১৮)

সবর / ধৈর্য

اِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (বাকারা-১৫৩)

এই আয়াতের মধ্যে হিকমত ও উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : জনাবে হক্ক আল্লাহ, হাকীম নামের তাৎপর্যের ধারানুপাতে বস্তুর অস্থিত্যের ক্ষেত্রে একটা মই এর সিঁড়ির ন্যায় বিন্যাস্থ করে রেখেছেন। ধৈর্যহীন ব্যক্তি ঠান্ডা মাথায় কর্মসম্পাদন না করার কারণে ঐ মইয়ের

সিঁড়ির ন্যায় ধাপগুলো পাড়িতে তাড়াহুড়ার কারণে সফল হতে পারে না বরং পরে যায়। এবং ক্ষতির সম্মুখীনও হয় । তার যে উদ্দেশ্য ছিল সেখান পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। তাইতো লোভ হলো বঞ্চিত হওয়ার কারণ আর ধৈর্য্য হলো বিপদের চাবিকাঠি এমনটি যে,

اَلْحَرِيصُ خَائِبٌ خَاسِرٌ * وَالصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ

আলোচ্য উদাহরণে তার প্রমাণ বিদ্যমান। অর্থাৎ মহান রবের সাহায্য ও তৌফিক ধৈর্য-ধারণকারী মানুষের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। কেননা সবর (ধৈর্য) তিন প্রকার :

১। গোনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে ধৈর্য ধারণ করা আর এই ধৈর্যই হলো তাক্বওয়া (আত্মশুদ্ধিতা)।

اِنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ যারা পরহেযগার আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন। (বাকারা-১৯৪)

২। বিপদ আপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা হল নির্ভরতা ও সমর্পণ ।

* اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ আল্লাহ্ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন। (আলে ইমরান ১৫৯)

اللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ আর যারা সবর করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। (আলে ইমরান ১৪৬)

আলোচ্য আয়াতাংশ এটার প্রমাণ দিচ্ছে। আর যদি কেহ ধের্যহীনতা প্রকাশ করে তার অর্থ হল আল্লাহর দিকে অভিযোগ তোলার শামিল। এবং কর্মসমূহে সমালোচনা করন ও তার রাহমাত সমূহের প্রতি ত্রুটিপূর্ণকরণ ও হিকমত সমূহের প্রতি অসম্মান ও অপছন্দকরণের নামান্তর।

হ্যাঁ মুসিবতের প্রক্কালে মানুষ আপত্তির নামে দুর্বল ও মুখাপেক্ষীতার ধরুন ক্রন্দন করে থাকে। কিন্তু তার থেকে আপত্তির সুযোগ নেই। হযরত ইয়াকুব (আ:) এর বলার মত হওয়া আবশ্যক। যথা:-

اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِى اِلَى اللهِ আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহ্র সমিপেই নিবেদন করছি (ইউসুফ-৮৬)

অর্থাৎ মুসিবতের কালে আল্লাহর দিকে আপত্তি হওয়া অনুচিৎ। নতুবা যেন আল্লাহ মানুষদের আপত্তি করচ্ছেন। আহ! এটা আমার কপালে আসলরে! এমন বলে অভাবী মানুষের জন্যে উদাসীন হওয়া ক্ষতিকর ও অর্থহীন।

৩। ইবাদতের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করা এমন যেন এই ধৈর্য-ধারণকারী ব্যক্তিকে মাহবুবে-খোদার নৈকট্যতায় পর্যন্ত পৌছায়। সর্বোচ্চ স্থর হওয়া এই লেবেল ইবাদতের পূর্ণাঙ্গতার তরে নৈকট্যতায় পৌছাইয়া দেয়। (মাক্তুবাত ২৮০)

২১তম কালেমার **১**ম মা**ক্বা**মে আলোচিত হওয়ার ন্যায় বলছি যে, জনাবে হক্ব (আল্লাহ) এর প্রদানকৃত সবর ক্ষমতা যদি মানুষ ভ্রান্তিমূলক কাজে ব্যয় না করে তাহলে তা অবশ্যই সকল ধরনের মসিবতের মোকাবিলাতে যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি আন্দাজের ভসীভূত হয়ে, গাফলতের সাথে ক্ষণস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী কল্পনা করার সাথে এই সবর শক্তিকে অতীত ও ভবিষ্যৎ সময়ে নষ্ট করে তাহলে বর্তমান সমস্যার জন্যে তাহা যথেষ্ট হবে না। তখন ব্যক্তির অভ্যাস স্বরূপ অভিযোগ করতে শুরু করে। স্বভাবরুচি হিসেবে (আল্লাহ না করুক) আল্লাহর প্রতি তার আপত্তি শুরু হয়ে যায় তাও আবার মানুষের কাছে করে। এমন কি অধিকারহীন অবস্থায় ও পাগলামীর ন্যায় তার অমনুযোগে ধৈর্যহীনতার পরিচয় দেয়। কেননা অতীতের সমস্ত দিন, যদি মসিবতপূর্ণ হয়

তাহলে তো তার কষ্ট শেষ কিন্তু তার আনন্দ তো বিদ্যমান আছে। যন্ত্রনা শেষ কিন্তু বিদায়ের সুখতো বিদ্যমান রয়েছে। সমস্যাগুলো চলে গিয়েছে কিন্তু তার সওয়াব চলে যায় নাই। আর এই জন্যে অভিযোগ নহে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত জরুরী। এর থেকে বিরক্ত নহে বরং খুশিমনে তার বিপরীত ভাববাসা অত্যান্ত প্রয়োজন। তার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনটা মসিবতের মাধ্যমে চিরস্থায়ী ও এক প্রকার চিরসুখী জীবনে পরিবর্তন হয়ে যায়। কষ্টকর ও যন্ত্রণাময় কল্পনার সাথে চিন্তা করতঃ সবর শক্তিকে অমূলকভাবে ব্যায় করাটা পাগলামী ছাড়া কিছু নহে।

তবে যদি ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ এমন দুশ্চিন্তা করে সেও আহাম্মাক, মুর্খতার পরিচয় দিবে কারণ ভবিষ্যৎ এখন ও আসেনি যা আগামতিে আগত অসুস্থতা মসবিত কে এখন থেকে ধৈর্যহীনভাবে প্রদর্শন করছে ও অভিযোগমুখী চিন্তা করছে। "আগামীকল্লে পরের দিন আমি ক্ষুধার্ত হব, পানি পাব না এই বলে আজকে ধারাবাহিকভাবে পানি পান করা, খাবার খেতে থাকা যে কি পরিমাণ বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। একিভাবে আগামী দিনগুলো এখনও আসেনি অদৃশ্য মসিবত ও অসুস্থতাকে নিয়ে চিন্তাকরা এবং এখন থেকে এগুলো নিয়ে বিব্রান হওয়া সাথে সাথে ধৈর্যহীনতার প্রদর্শন করণ ও এক প্রকার কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা ছাড়া কেবল নিজের সাথে জুলুম করা একশ্রেণীর নির্বোদ্ধিতা যে, স্বীয় ক্ষেত্রে সহানুভূতি ও রহমত এর তরে অনুপযুক্ত করে তুলে।

পরিশেষেঃ কৃতজ্ঞতা যেমন নেয়ামতের বৃদ্ধিকরণে স্বাক্ষর রাখে তেমনিভাবে অভিযোগও, আপত্তি, বিপদ আপদ বৃদ্ধিতে সাক্ষর রাখে। একিভাবে দয়ার প্রবণতাকে শেষ করে ফেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বছরে এরজুরম (স্থানে) এর বড় এক মালদার ব্যক্তি অসুস্থ হয়েছিলেন। আমি তার কাছে গিয়েছিলাম আমাকে তিনি বলিলেন যে একশত রাত যাবৎ আমি মাথা বালিসে রেখে ঘুমাতে পারি নাই এই অবস্থায় আছি এমনটি বলে তিনি তিক্ত এক অভিযোগ করলেন । আমি কষ্ট পেলাম এবং হঠাৎ আমার মনে হল এবং বললাম যে, আমার ভাই বিগত একশত কষ্টকর দিনগুলো এখন আরামপ্রদ একশত দিনের সমমানের দিন। কষ্টকর দিনগুলোকে চিন্তা করত: অভিযোগ কর না। ঐ দিনগুলোকে দেখে দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর আগামী দিনগুলোতো এখনও আসেনি। তোমার পালনকর্তার হিসেবে রহমান-রাহিমের উপর নির্ভর করত: কষ্ট পাবার আগে ক্রন্দন কর না। কোন কিছুর অদৃশ্যতা থেকে ভয় কর না। অদৃশ্য কিছু কে অস্থিত্ব দিতে যেয়োনা। এখনকার সময়কে চিন্তা কর তোমার মধ্যে যে সবর শক্তি এটা এখনকার মুহুর্তের জন্যে যথেষ্ট। পাগল কোন কমান্ডারের ন্যায় কাজ কর না। যে তার সৈন্যকে এমন দিকে পাঠিয়েছে যে দিকে মূলত দুশমনের সৈন্য নেই কারণ দুশমন বাম দিকের সৈন্যদের ডান দিকে নিয়ে শক্তিশালী করে রেখেছে। আর কমান্ডার পরে ডান বামে সৈন্য প্রেরণ করত: কেন্দ্রস্থলকে দূর্বল করে ফেলে এই সুযোগে দুশমন খুবই সহজভাবে কেন্দ্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমি বললাম আমার প্রিয় ভাই, তুমি এই কমান্ডারের ন্যায় এরকম কর না। তোমার সক্ষম শক্তিকে এই মুহুর্তের জন্যে ব্যবহার কর। এলাহির রহমত ও আখেরাতের মুনাফা সমূহ ও ক্ষণস্থায়ী এবং অল্প হায়াতের জন্যে লম্বা ও চিরস্থায়ী এক রূপের রূপ নিয়ে চিন্তা কর। এই যন্ত্রণাদায়ক আপত্তি, অভিযোগে, আনন্দদায়ক এক সুস্বাদু কৃতজ্ঞতাকে চিন্তা কর। তখন সেই অসুস্থ ভাই পূর্ণাঙ্গ রূপে মনোমুগ্ধকর আনন্দ পেয়ে: আলহামদুল্লিাহ বলিলেন এবং তার অসুস্থতা ১০ থেকে ১ পয়েন্টে নেমে এল। (লাম'আলার ১০)

মানব যেমন তার গঠন প্রণালীর কারণে ম্যালেরিয়া রোগ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়; তেমনিভাবে ভূমিকম্প ও ঝাকুনি এবং কিয়ামতের সাথে ঘনিষ্ট হওয়া সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প থেকে ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছে। না দেখা জীবাণু থেকে যেমন ভয় পায় একিভাবে উল্কাপিন্ড যা সর্বোচ্চ স্থর থেকে আসে তাহাকেও ভয় পায়। একিভাবে যেমন

ঘরবাড়ি কে পছন্দ করে এই বিশাল দুনিয়াকেও ঐ রকম পছন্দ করে। এভাবে যেমন ছোট একটি বাগানকে ভালবাসে তেমনী সেই চিরস্থায়ী জান্নাতকেও পাগলের ন্যায় ভালবাসে।

বলা বাহুল্য এমন এক মানুষের পালনকর্তা, রব, আশ্রয়স্থল, রক্ষাকারী, চাহিদাপূর্ণকারী ঐ রকম এক সত্ত্বা হতে পারে যে সমস্ত সৃষ্টিজগত তার হাতের কব্জার মধ্যে অনু পরমাণুর ক্ষমতা ও যার হুকুমের মধ্যে থাকবে।

আর অবশ্যই ঐ রকম এক মানুষ যে সর্বদা ইউনুস (আ:) এর ন্যায় لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ বলতে সর্বদা বাধ্যগত থাকিবে। (লাম'আলার ০৭)

আমার সুপ্রিয়, স্নেহের ভাইয়েরা!

প্রথমতঃ মোটেও বিষণ্ন ও বিচলিত হবেন না। আমাদের অধিকার হরণের প্রত্যেক ঘটনায়; যেমনটি পর্দার নীচে তেমনি ফলাফলের বিবেচনায়, একইভাবে রহমত ও অনুগ্রহের দৃষ্টিদান সমুহকে আমাদের মৃদু-হাসি সমুহকে, তার সাথে ভাগ্য, কিসমত, ন্যায়বিচার, সহানুভূতিশীলতার শিক্ষা সমূহ আমদের মাঝে থাকা ও বারংবারের অভিজ্ঞতার বাস্তবায়ন প্রতিষ্টিত থাকা সত্তেও; আমরা সর্ব উচ্চ মানের কষ্টকর ও সমস্যাবলীর সম্মুখে, ধৈর্য, সহনশীলতার পূর্ণতার মাঝে কৃতজ্ঞতা আদায়ের ক্ষেত্রে ভারার্পিত, দায়িত্তপ্রাপ্ত। এবং হযরত জিরজিছ আলাইহিচ্ছালাম যার চামড়া নিরাবরণ করা ও দেহের গোশতকে টুকরা টুকরা করে প্রাণীদের খাওয়ানোর ন্যায় সীমাহীন অত্যাচার, তার ন্যায় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুজাহিদদের জীবন ত্যাগের, ঈমানের হাকিকাত সমূহের পবিত্র খেদমতের একটি নমুনার দৃষ্টান্ত হওয়া নূর সুহৃদগণের ভোগ করা কষ্ট সমূহে, যা ঐ গত হওয়া নবী, অলি জীবন ত্যাগি স্বত্বাদের ক্ষেত্রে কিছুই না। তবে প্রদিদান ও ফলাফলের ক্ষেত্রে সকলেই এক আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতে ও তার হাদিয়া প্রদানে সমমানের হবে ইনশা-আল্লাহ্। দ্বিতীয়তঃ আমার ভায়েরা! আমাকে এগারো বার অন্যায় ভাবে অপরাধী সাব্যস্থকারী এবং চার চার বার মামলার অন্তড়ালে আইনের বেড়াজালে ঘুরায়ে তিন বার জেলখানায় প্রেরণকারী আমাদের গোপন দুশমনরা, নূর জাম'আতের ব্যাপারে তাদের অনিষ্ট প্লান সমূহের ঝরনা ঝরানোর সত্তেও, তাদের সকল চক্রান্ত সমূহের সামনে, আমি এই নগন্য মানুষের উপর ধাবিত সকল সমস্যা, অত্যাচার, আমায় একাকিত্তে ও কাহারও সাথে দেখা নাকরার অনুমতি না দিয়ে, এবং আমার রক্তনালীতে আঘাত করার সাথে ঐ অনিষ্টকারীরা অসহ্য নিপীড়ন দেওয়ানোর জন্যে তারা কাজ করে যাচ্ছে। আর আমিও ঐ যন্ত্রণাকর নিপিড়নের মধ্যে মহান মালিকের অনুগ্রহকে দেখে দেখে সহ্য করে করে তার শুকরিয়া আদায় করি। মনে হচ্ছে যে, আপনাদের থেকে দেহের তুলনায় দশ ভাগ দুর্বল ও দশগুনের চেয়ে আরও বেশী আমার উপর কৃত অত্যাচারের সহ্য ক্ষমতা, আপনাদের মতো শক্তিশালী ও উচ্চ মাকামের স্বত্বাদের, ভাইদের ক্ষেত্রে ছোট ছোট ও সাময়িক ও আংশিক অত্যাচারের সম্মুখে এটা সহায়ক কারী হয়ে আপনাদের কষ্টকে একেবারে নীচে নামিয়ে দিবে, সান্তনা দিবে বলে, আপনাদের ধৈর্য বাড়বে বলে আমার অবস্থা সমুহকে তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করচ্ছিনা। তৃতীয়তঃ এখন আপনারা এই যে আমার উপর এত এত নিস্টুর পিসা-চাকা, অত্যাচার চালানোর, নিপীড়ন করার এবং মানহানি করার কারনে বিরক্তি-বোধ করবেন না। কারণ, এই যাঁতাকল নূর জাম'আতের উপর ও সুহৃদগণের পর্যন্ত তারা পৌছাতে না পারার এটা একটি চিহ্ন, আলামত এবং তাদেরকে ধোঁকা না দিতে পারার এক নির্দেশনা। অর্থাৎ, তারা আমার ব্যাক্তিত্তকে মুল্যবান, অধিক কুশলী মনে করে আমাকে চাপাচাপি করে পিষতে চেষ্টা করছে, গুড়া করে ফেলতে চাছে। এই ছল-চাতুরিতা, তাদের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে অনেক বড় মাপের এক কল্যাণ, অসংখ্য মঙ্গল নুর জামা'তের জন্যে রয়েছে। আমি যা পূর্ণ ভাবে আমার ব্যাক্তি ক্ষেন্দ্রিক, ও নুরি খেদমত করতে পারি নাই, এই অত্যাচার চালিয়ে গিয়ে তারা যদিও না বোধক

পন্থায় তারা কিন্তু করে যাচ্ছে। ইনশা-আল্লাহ্, ঐ দৃষ্টিতে সোয়াব অর্জনের এবং আমার ভুলক্রুটি গুলোর কাফফারা স্বরূপ অবদান রাখবে।

চতুর্থতঃ গোপন মুনাফিকরা, যেভাবেই হোক সরকারি কর্মচারীদের প্রতারিত, প্রবঞ্চিত করে করে, " সাঈদের সাথে যে দেখা করবে তার বন্দু, নুরজু হবে । তাই কেউ যেন তার সাথে দেখা করতে পারে না " এভাবে বলে বলে তারা তাদের অন্তরে সন্দেহের বীজ বপন করেছে। এমনকি, হাজত খানার দারোয়ানরা ও পরিচালকরা আমার থেকে দূরে দূরে থাকছে। আমি ও আনন্দিত হচ্ছি এবং আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। আপনাদের সাথে সরাসরি দেখা না করাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমরা এক ঘরের মধ্যেই আধ্যাত্মিক, রুহ, কলব, দায়িত্ত, চিন্তা-ফিকিরে সার্বক্ষণিক এক সাথেই আছি। আমরাতো মা'নাবি ভাবে আধ্যাত্মিক ভাবে একে অপরের সাথে দেখা করছি, এটাই যথেষ্ট। (জীবনী ৫৯৩)

রিয়া / লোক দেখানো

হে শান ও মানের, সুনাম ও খ্যাতির প্রতি আগ্রহী মানুষ! আসো, এই পরামর্শ আমার থেকে গ্রহণ করো। খ্যাতি, পদবী হল আত্মপ্রদর্শন ও কপটতার (রিয়ার) আয়না স্বরূপ এবং এই আয়না অন্তর, কলবকে হত্যাকারী বিষাক্ত মধু স্বরূপ। এবং এটা মানুষকে মানুষের গোলাম বানায়। যদি তুমি এমন বালা-মুসিবতে পড়ে থাক তাহলে ইন্না-লিল্লাহি-অয়া-ইন্না-ইলাইহি- রাজিউন বল, এবং নুজেকে এই বিষাক্ত বিপদ থেকে বাচাও, , , (মাস্নাবিয়ে নুরিয়া ৮২)

যেন রাখো হে আমার প্রিয়! সৎ কর্ম ও মহৎ কাজের জীবন নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। ফ্যেসাদ এর জীবন হল আমিত্যের বীচি, লোক দেখানো ও মুনাফেকির সাথে সংশ্লিষ্ট। এবং স্বভাবজাতভাবে অনুভূতির মধ্যে থাকা প্রবণতা যা স্বয়ং আকাংখ্যার সাথে অনুমেয় অনুভূতির ভিত্তি, যা দ্বিতীয় আরেক অনুভূতি ও নিয়াতের সাথে সম্পরকের বিচ্ছেদের স্ফুলিঙ্গ দেখায়। যেমনটি আমল সমূহের জীবন হল নিয়ত। তার ন্যায়, নিয়ত ও এক দৃষ্টিতে প্রকৃতির পরিস্থিতির মৃত্যু স্বরূপ। যেমন- বিনয়তা, নীচতা ব্যাক্তিকে অকেজো করে দেয়, আত্মহংকারের নিয়ত ব্যাক্তিকে দূরীভূত, অপসারন করে দেয়, আরাম-আয়েসের নিয়ত তাহাকে উড়িয়ে দেয়, সুচিন্তা ও ভাগ্যের নিয়ত ব্যাক্তিকে পাতলা করে, এভাবে আরও যুক্তি খাটাও বুঝতে পারবে, , , (মাস্নাবিয়ে নুরিয়া ২০১)

আখলাকের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি কথাঃ হে ফাসিক! জেনে রাখো অশ্লীলতার আধুনিকতা এমন এক বিস্ময়কর কপটতা, লোক দেখানো যা বাজারে বিস্তৃত হয়ে আছে যে, আধুনিকরা এই মহা বিপদ থেকে বাঁচা মোটেও সম্ভব নয়। তার কারণ হল আধুনিক বাদীরা এই আত্মপ্রদর্শন নামী রিয়াকে শান ও মানের অহংকারের মায়াজালে এঁটে ফেলেছে। তারা এখন এক ব্যাক্তির লোক দেখানোর আত্মহংকারের বিপরীত, সাম্প্রদায়িকদের, জাতীয়তাবাদীদের, রাষ্ট্র সমূহের সামনাসামনি একে অপরকে আত্মহংকার দেখাতে থাকুক এমন অবস্থার প্রতি উৎসাহ দিচ্ছে এবং ইতিহাস তাদেরকে মনোহারি ও কৌতূহলোদ্দীপক এমনকি পত্রিকা ও, মিডিয়াও এমনটি করে করে মুগ্ধতায় নিজেদের ব্যাস্থ রেখেছে। তারা মানুষের মৃত্যুকে ভুলিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িকতায় এক মজার জীবন রয়েছে বলে বলে, জাহিলিয়াতের যুগের গাদ্দার জালিমদের সুক্ষ আক্রমনের প্রকার থেকে এক আত্মঘাতী থাবার সাথে মানব জাতীকে ছল-চাতুরীতে ও হাব-ভাব দেখিয়ে চলার (রিয়ার) তরে আকৃষ্ট করে দিয়েছে। (মাস্নাবিয়ে নুরিয়া ২৬৫)

গোপন করা, লোকানোর এবং ভয়,ভীতির উৎপত্তি হল মুনাফেকি বা রিয়া। ফরজ কাজ আদায় করাতে লোক দেখানো বা আত্মপ্রদর্শন বা রিয়া হয় না। এই যামানার সব চেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে ইত্তেহাদে-ইসলাম, ইত্তেফাকে-উখুয়্যাত। (দিওয়ানে উরফি ৫৯)

হে আমার, দাম্ভিক নফস! একটি আঙ্গুরের বৃক্ষের সাথে তোমার মিল রয়েছে। অহংকার করিও না। স্থবক গুচ্ছ ঐ আঙ্গুর বৃক্ষ নিজে নিজে তার মাঝে লটকায় নাই অন্য কেউ জোড়া লাগিয়েছে।

তুমি হে আত্মপ্রদর্শনকারী আমার নফস! আল্লাহর দ্বীনে খেদমত করেছি বলে আত্মহংকার করিও না। اِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

আল্লাহ তা'আলা কখনও পাপিষ্ঠ লোকের দ্বারা দ্বীনের সাহায্য করেন। (বুখারী জিহাদ ১৮২)

আলোচ্য হাদীসের আলোকে হয়ত তুমি বিশুদ্ধ না হওয়ার ধরুন নিজেকে ঐ পাপী ব্যক্তি হিসেবে জানা জরুরী। তোমার খেদমত, তোমার ইবাদত, বিগত ভোগকৃত নেয়ামত সমূহের বিবেচনায় শুকুর এবং স্বভাবসুলভ ওজিফার বিবেচনায় এবং সৃষ্টির কর্তব্য পরায়ণতার বিবেচনা ও সান-আতের ফলাফল হিসেবে বিবেচনা কর। আত্মহংকার এবং আত্মপ্রদর্শন থেকে নিজেকে রক্ষা কর।

হাকিকাতের ইলিম, হাকিকি হিকমত যদি তুমি চাও তাহলে জনাবে আল্লাহর পরিচয় কে অর্জন কর। কেননা সমস্ত হাকাইকে-মওজুদাত হক্ব নামের কিরণসমূহ এবং নামসমূহের আলোকপ্রদ এবং তার ছিফাত সমূহের তাজাল্লী সমূহ এর রূপস্বরূপ। বস্তুবাদী, আধ্যাত্মিক, স্বর্ণের, মাটির প্রত্যেক বস্তুর, প্রত্যেক মানুষের হাকিকাত একেকটি নামের নূরে নুরান্নীত হাকিকাতের প্রতি সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। নতুবা হাকিকাত বিহীন গুরূত্বহীন একটি সুরত, বিশতম কালেমার শেষের দিকে এই রহস্যের সাথে সম্পর্কিত একটি তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে।

হে আমার নফস! যদি তুমি এই দুনিয়ার হায়াতের প্রতি আগ্রহী হও, মৃত্যু থেকে পলায়ন কর; তাহলে মনে রেখ যে, তোমার ধারণায় ব্যাপ্ত যে হায়াতের অবস্থা; যেন এটা কেবলমাত্র একটি মিনিট ছাড়া কিছু নহে। ঐ মিনিটের পূর্বে সমগ্র সময়ের এবং ঐ সময়ের মধ্যকার দুনিয়াবী ভোগ্যবস্তু সমূহ যা ঐ মিনিটের পরে সমস্ত সময়ের এবং তার ঐ মুহুর্তপূর্ণ মিনিটে বিলুপ্ত স্বরূপ, বিলোপকৃত। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস করা এই বস্তুবাদী হায়াত কেবল একটি মিনিট মাত্র। এমনকি এক প্রকার বিজ্ঞরা বলেছেন ইহা একটি সেকেন্ডের ৪৮০ মুহুর্তক্ষনের একটি ক্ষণ মাত্র, বরং এর চেয়ে আরও অল্পক্ষণ।

সুতরাং এই রহস্যের শিক্ষা হল যে, অধিকাংশ আহলে ওলায়েত (অলীগন) দুনিয়ার দুনিয়া দৃষ্টিকোণে না হওয়া অনস্থিত্বতা হুকুম প্রদান করেছেন। আর যেহেতু ব্যাপারগুলো এরকম, তাহলে এই বস্তুবাদী মনের জিন্দেগী কে ছেড়ে গত অন্তর, রূহ, রহস্যের হায়াতের ধাপে প্রবেশ কর, দেখ, কি পরিমাণ প্রশস্থ এক হায়াতের স্থর বিদ্যমান রয়েছে। তোমার জন্যে মৃতু হওয়া অতীত, ভবিষ্যত যা ঐগুলোর জন্যে চিরঞ্জীব, জীবন এবং অস্থিত্বশীল। হে আমার নফস যেহেতু এরকম, তাহলে তুমিও আমার অন্তরের সাথে কাঁদ চিৎকার কর এবং বল যে, আমি অস্থায়ী অস্থায়ীকে আমি চাই না। আমি অভাবী, অভাবী হওয়াকে চাই না। আমার রূহকে রহমানের কাছে হস্থান্তর করে দিলাম। অন্য কিছুকে চাই না। চাই তবে কেবল চিরস্থায়ী স্থলকে চাই। অনুবিহীন কিছুই নহে আমি তবে আমি, শমছে-ছরমেদ (চিরস্থায়ী সূর্য) কে চাই। নেই এর মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমি এই মওজুদাত কে এক আল্লাহর কাছ থেকে চাই। (সোজলার ৪৭৩)

রিয়া (লোক দেখানোর) এর সাথে সম্পৃক্ত তিনটি পয়েন্ট-

প্রথমঃ ফরজ বা ওয়াজিব এবং ইসলামের স্মৃতি দর্শন প্রকাশকরনে ও নবীজির সুন্নাতের উপর আমল করাতে এমনকি হারাম থেকে দূরে থাকালে রিয়া হবে না। এই সব পালনে আত্মদর্শন হতে পারে না। কিন্তু অতি দুর্বল ঈমানের সাথে ফিত্রাত অনুযায়ী লোক দেখানো হতে পারে। বরং ইসলামের আদর্শকে স্পর্শ কারী কর্মের প্রকাশকরনটা লোকানো থেকে আরও বেশী সোয়াব হওয়ার ব্যাপারে ইমাম গাজ্জালি রহঃ এর ন্যায় বড় বড় স্বত্বাগণ বর্ণনা করেছন। আবার অন্যান্য নফল কাজ সমূহের গোপন করাটা অনেক সওয়াবের কাজ হওয়ার ধারাবাহিকতায়ঃ ইসলামের নিদর্শনকে স্পর্শ কারী, বিশেষ করে এরকম বেদ'আতের যুগে নবীজির সুন্নাতের তাৎপর্যকে প্রদর্শন কারী এবং এরকম বড় বড় কবিরা গুনাহের কাজ সমুহকে ছেড়ে দিয়ে প্রকাশ করনটা এটা রিয়া নহে বরং গোপন করা থেকে আরও বেশী সওয়াবের কাজের এক আলামত।

দ্বিতীয়ঃ মানুষকে রিয়া বা লোক দেখানোর কাজে উৎসাহ কারী কিছু কারণ সমূহ।

১। ঈমানের দুর্বলতাঃ যে আল্লাহ্ কে নিয়ে চিন্তা করে না, সে এক সময় প্রকৃতি মুখী হয়ে পড়ে। জনগণকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে, লোক দেখানোর এক প্রত্যক্ষবাদী মনোভাব দৃষ্টিগুচর করে। এই সব ক্ষেত্রে রিসালে নূর সুহৃদগণ, রিসালে নূর থেকে অর্জিত তাহকিকি ঈমানের শিক্ষা সমূহের শক্তির দ্বারা, হেতু ও উপকরণ সমূহের এবং মানুষের প্রতি ইবাদাতের বিষয় বস্তুতে কোন মুল্য কোন গুরুত্ত তারা দিচ্ছে না যে, তাদের ইবাদাতে এই সব আত্মপ্রদর্শনীয় কাজে লোক দেখানোর মত ব্যাপার ফুটে উঠবে।

২। লোভ ও প্রলুব্ধতাঃ এটা অভাবের দুর্বলতার গন্থব্যে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে ক্ষেন্দ্র হওয়া লোক দেখানোর মতো পরিস্থিতির ধাপকে উপস্থাপন করে। এর ঔষধ হিসেবে এই রিসালে নূর বন্দুগন মধ্যপন্থা, অল্পতুষ্টিতা, তাওয়াক্কুল ও কিসমতের উপর নির্ভরশীলতার ন্যায়, রিসালে নুরের পাঠ সমূহ থেকে আনিত শিক্ষার মূল শক্তি ঈমানের সম্মানের দ্বারা, ইনশা আল্লাহ্ তাদেরকে রিয়া থেকে ও পার্থিব লাভ সুবিদার দুনিয়াকে তাদের প্রতি আগ্রহী করার ক্ষেত্র সমূহ থেকে বাঁধা দিবে।

৩। প্রবৃত্তির সুনাম ও মনোহারীতাঃ দুনিয়াতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার রুচি, এর মত আরও প্রাধান্য মূলক লেভেল অর্জন করার ন্যায় সকল লোভ সমূহ এবং মানুষদের কাছে নিজেকে ভাসিয়ে তুলা, ধোঁকাবাজি, ছল-চাতুরির দ্বারা সীমা রেখার বাহিরে নিজেকে তাৎপর্যময় করে তুলা, আসো আসো আমি-ই সব এমন ভাব উপস্তাপন করা, এমন সকল আচরন রিয়া বা অকপটতা, মুনাফেকি কে সাব্যস্থ করে । এই সকল হাব-ভাব থেকে রিসালে নূর সুহৃদগণ " আমি আমি ভাবের আমিত্তকে আমরাতে (মিনাল-আনা- ইলা- নাহ্নু) রুপান্তর করে, অর্থাৎ আত্মহংকারকে ছেড়ে দিয়ে, রিসালে নুরের গণ্ডি, পরিধির, চৌহদ্দির আধ্যাত্মিক ব্যাক্তিত্তের বিবেচনায় কাজ করে যাওয়া, আমি এর স্থলে আমরা বালাটা, , , এবং আহলে তারিকাতের ধারানুসারে শেখের প্রতি ফানি হওয়া, নিঝুম হওয়া, এর ন্যায় নফসে আম্মারাকে হত্যাকারী এমন অনেক সাবলিল পন্থা সমূহ দ্বারা রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যম সমুহকে বিশেষ করে এই যামানায় " ফেনা- ফিল- ইখওয়ান" ভ্রাত্তিত্তের প্রতি ফেনা হওয়ার নিয়মকে ব্যাবহার করে আত্ম-বিসর্জনের শক্তি দ্বীনই ভাইদের জন্যে সার্বজনীন ভাবে ব্যাবহার করার কারনে, ইনশা আল্লাহ্ রিসালে নূর সুহৃদগণ ও আহলে হাকিকাত যেভাবে তাদেরকে হেফাজত করেছেন তাদের ন্যায় তারা ও নিজেকে বাঁচাতে, রক্ষা করতে, হেফাজত করতে পারবে।

তৃতীয়ঃ দ্বীনের খেদমতের দায়ীত্তশীল হিসেবে, মানুষদের কাছে কাজকে সুন্দর করে ভাসিয়ে তুলা, এবং স্বীয় লেভেলের ক্ষেত্রে ধাপ, স্থর ও অবস্থানকে উত্তম ও উন্নত পন্থায় আদায় করা রিয়া হিসেবে বিবেচনা হয় না, বা না হওয়া উচিৎ। তবে ঐ ব্যাক্তি যদি তার নিজ নফসের আমিত্যকর প্রবনতার অনুসারী হয়, ঐ পন্থায় ব্যাবহার করলে এটা আত্মপ্রদর্শন বিবেচিত হবে।

হ্যাঁ, একজন ইমাম তিনি তার ইমামতির দায়িত্তে থাকা কালে তাসবিহ সমূহ অটোমেটিক প্রকাশ হয়ে যায়, দায়িত্ত অনুসারে বা বেখেয়ালে তা শুনা গেলে, কস্মিনকালে ও তা রিয়া হবে না। তবে তার দায়িত্তের বাহিরে যদি ঐ তাসবিহ সমুহকে মুসল্লিদের, জনগনের কর্ণে শুনানোর চেষ্টা করেন এটা এক প্রকার আত্মপ্রদর্শন হওয়ার কারনে তার গুপনিয়তা আরও সওয়াবের কাজ হবে।

রিসালে নুরের হাকিকি সুহৃদগণ, দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত প্রচার-প্রসার ও সুন্নাতের সাথে অনুসরনীয় ইবাদাত সমূহে, এবং কবিরা গুনাহ সমূহ থেকে দূরে থাকার তাকওয়া, আত্মসুধিতার ক্ষেত্রে চলা মানে হল তাদের এই চলন কোরআনের দৃষ্টিতে হিসাবকৃত। ইনশা আল্লাহ্ এমনটি রিয়া বা আত্ম-প্রদর্শন হবে না। তবে রিসালে নুরের ভিতরে অন্য দুনিয়াবি উদ্দেশ্য হাসিল করার নিয়তে প্রবেশ করে থাকলে না ইহকালে না পরকালে সফলতার চেহারা দেখতে পারবে । আরও লেখতে চেয়েছিলাম একটি নির্ভরশীল অবস্থান লিখতে বাঁধা হয়েছে। (কাস্তামুনু ১৮৪)

মন্দ ধারনা / ছু'এ যান্ন

শয়তান সর্ব প্রথম সন্দেহ কলবের মধ্যে সৃষ্টি করে। যদি অন্তর এটাকে গ্রহণ না করে তখন সন্দেহ থেকে ভর্ৎসনায় ফিরে। কল্পনার ঠিক বিপরীত তিরস্কার মিলে অধিকাংশ মন্দ বাক্যাদী ও আদরের বিপরীত নিকৃষ্ট অবস্থাসমূহকে আকৃতি প্রদান করে এই তিরস্কার। অন্তরে বাহ্ এভাবে বলায়, হতাশায় নিমজ্জিত করায়। কুমন্ত্রীত ব্যক্তি ধারণা করে যে, অন্তর আল্লাহর সম্মুখে মন্দ ব্যবহারে বিদ্যমান। আবশ্যিক এক অপদস্থ ও অশান্তি অনুভব করে। এর থেকে রক্ষা পেতে শান্তি থেকে পলায় করত; গাফলতে প্রবিষ্ট হতে চায়। এই ক্ষতের ঔষধ হল এই যে,

দেখো হে ওয়াছ-ওয়াছায় বেষ্টিত অসহায় ব্যক্তি! ক্ষতিগ্রস্থ হইও না। কারণ তোমার স্মৃতিতে আগত এটা ভৎর্সনা (শেতম) নহে। বরং এটা কল্পনা (তাহাইয়ুল)। কুফুরের কল্পনা করন কুফুরি না হওয়ার ন্যায় ভৎর্সনাময় কল্পনা ও ভৎর্সনা নয় যদিও যুক্তির নিরিখে কল্পনা করণ কোন হুকুম সাব্যস্থ করেনা । তবে যদি ভৎর্সনা হয় তাহলে হুকুম হবে। এবং এর সাথে বরাবর ঐ মন্দ কথাবার্তা তোমার অন্তরের কথাগুলো নহে। কেননা তোমার অন্তর এর থেকে প্রভাবিত ও দুঃখিত। বরং অন্তরে নিকটবর্তী হওয়া শয়তানী কুমন্ত্রনা থেকে এই মন্দতা আসছে। কু-মন্ত্রণার ক্ষতিই সন্দেহের সম্পর্কিত ক্ষতি। অর্থাৎ তাহাকে ক্ষতিকর সন্দেহ করার সাথে অন্তর্গতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া বুঝায়। কেননা হুকুম বিহীন কোন কল্পনার হাকিকাতকে সন্দেহময় করে। শয়তানের কাজকে স্বীয় অন্তরে জাল হিসেবে বিবেচিত করে। তার কথাগুলো তার নিজের থেকে মনে করে। ক্ষতিটা বুঝে ক্ষতিতে লিপ্ত হয়। মূলত শয়তানের ইচ্ছাটাই হল এটা তৈরী করা। (সোজলার ২৭৪)

সামাজিক জীবনের জন্যে যদি নীতিমালা চাও তাহলে এগুলো হচ্ছে, সুযোগ বাদী, সাম্যহীন বিচার ফয়সালা, প্রথমেই এটা আদালাত নহে, জুলুম। এখন যদি এই বিচার ব্যাবস্থা সমানবাদী হয় তাহলে, এটা নিরোধী, বৈপরীত্যের অনেক গুরুত্তপূর্ণ এক কারণ সুলভ। আবার যদি দূর- উপযোগী হয় তাহলে এই আইন, বিচার হবে পারস্পরিক বলে পৃষ্টপোষকতার সাহায্যে বলিয়ান হওয়া। ব্যাক্তির অবহেলা ও শিশু বেলার কালটা হল অহংকারের উৎসমুখ কাল। আধ্যাত্মিক শক্তিহীন দুর্বল কলবের সময়টা হল তাকাব্বুরের লোহা। অভাবের দেখা দেওয়ার অর্থ হল বিরুধীতার প্রারম্ভিকা। চিন্তা-ফিকিরের আলামত হল জ্ঞানের সাথে শিক্ষকতার সম্পৃক্তই। প্রয়োজন, চাহিদা হল সতর্কতার উন্নতির উস্তাদ। সমস্যাবলী হল হারামের পথে অগ্রসর হওয়ার, অশ্লীলতার শিক্ষক। এতে বুঝায় নোংরামির সংশ্লিষ্টতা সমস্যার সাথে জড়িত। আর সমস্যা, মুসীবত এরা হল হতাশা এবং মন্দ ধারনার সহোদর ও উৎস। উল্লেখিত সবকটি হল ফিকিরের পথভ্রষ্টতা, কলবের জুলুম, দেহের বেহুদা অপচয়। (সোজলার ৭২৬)

কোরআনের দ্বারা (তাফা'উল – পৃষ্টা উল্টিয়ে আয়াত দেখে অর্থ নিয়ে ভাগ্য চয়ন) কপালের প্রকৃষ্টিতা ও স্বপ্নের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা বিজ্ঞ মুহাক্কিকগণের রুচি, সম্মতি পাওয়া যায় না। কারণ কোরআনে-হাকিম আহলে কুফুরকে অধিকভাবে, কঠোর ভাবে আঘাত করচ্ছে। এখন স্বপ্নে দেখল কাফিরকে আঘাত করছে, আবার তাফা'উল কারী দেখল আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে, এমন অবস্থায় হতাশা বাড়ে; পরিষ্কার কলবকে খিচুরি করে মুচড়িয়ে ফেলে। আবার স্বপ্নে ভাল কিছু দেখার পর; বাস্তবতা বিপরীত দেখার কারনে মন্দ, খারাবি উত্তেজিত হয়ে ব্যাক্তির ঈমানে ঝঙ্গার ধরায়; হা-হুতাসায় পতিত করে, আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে আক্রান্ত করে, মন্দ ধারনার প্লাবন শুরু হয়। এমন অনেক স্বপ্ন রয়েছে যে, যার দেখাটা অত্যান্ত আক্রমণাত্মক, ক্ষতিকর, অপরিচ্ছন্ন হওয়ার পরও; তার ব্যাখ্যা ও অর্থ খুবই সুন্দর হয়। সুতরাং সবাই স্বপ্নের আকৃতি থেকে তার উদ্যেশ্যকে হাকিকাতের দৃষ্টিতে সংশ্লিষ্টতা না বুঝার না পাওয়ার কারনে; অপ্রয়োজনীয় ভাবে অহেতুক চেষ্টায় পেরেশানিতে ব্যাস্থ হয়, নিরাশ হয়, কষ্টে নিপাতিত হয়। অতএব এই সব ব্যাপারে এটাই বলি যে, আহলে হাকিকাতের চিন্তার ন্যায় এবং ইমাম রাব্বানি রহঃ এর মত স্বত্বা গনের ন্যায় – আমি না রাত্র না রাত্রি বাদী। (মাক্তুবাত ৩৪৭)

মানুষের সামাজিক জীবনকে ধ্বংসকারী একটি শয়তানী ষড়যন্ত্র হল এটা যে, একজন মুমিনের একটি মাত্র পাপ-ত্রুটির কারণে মন্দ ধারনা প্রসূত সমস্ত পূণ্যকর্মকে ভূলে গিয়ে পর্দাবৃত করা। তাই শয়তানের এই চক্রান্তময় ষড়যন্ত্র অনুসরনকারী বেইনসাফি মানুষেরা একজন মুমিনের সাথে শত্রুতা ভাবাপন্ন ব্যবহার করে। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা হাসরের ময়দানে সুনিপূন ইনসাফ আদালতের দ্বারা সর্বোচ্চ মিযানের দাড়িপাল্লায় বান্দার কর্ম সমূহকে যখন মাপ দিবেন তখন তিনি ভাল ও মন্দের দৃষ্টিতে পূণ্যতাকে ভারি ও পাতলার বিবেচনায় হুকুম দিবেন। একি সাথে পাপের মাধ্যম সমূহ অনেক ও তার সম্পাদন সহজতর হওয়াতে ক্ষেত্র বিশেষে একটি মাত্র পূণ্যের সাথে অনেক পাপকে পর্দাবৃত করবেন। অর্থাৎ এই দুনিয়াতে ও খোদায়ী আদালতের ন্যায় জীবন যাপনে ব্যবহার করা জরুরী। যদি কোন ব্যক্তির পূণ্যকর্ম সমূহ মন্দকর্ম সমূহ থেকে অধিক পরিমান নতুবা গুণের ক্ষেত্রে বেশী গুনপুর্ণ তাহলে ঐ ব্যক্তিতো ভালবাসা ও সম্মান পাওয়ার অধিকারী। এমনকি মূল্যবান কোন উত্তমকর্মের কারণে তার অন্যান্য বেশকিছু গুণাহের সম্মুখে রহম, ক্ষমার দৃষ্টিতে থাকানো উচিত। অথচ মানুষ স্বভাব প্রকৃতির শিরার ধারাবাহিকতায় এবং শয়তানের প্ররোচনার দ্বারা একজন ব্যক্তির শত খানিক নেক আমল থাকার পরও একটি মাত্র মন্দ গুণের কারণে বাকী সকল গুনপূর্ণ কর্মকে ভূলে যায়। একজন মুমিন ভাইয়ের সম্মুখে দুশমনির চোখে আচরণ করে। ফলে গুনাহের মধ্যে পতিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরুপ যেমন কোন মাছির ছোট পাখাকে যদি চুখের উপর রাখলে বিশাল আকারের একটি পাহাড়কেও পর্দাবৃত করে, দেখতে পারে একই রকম ও মানুষ অসৎ নিয়তের ধরুন ছোট এই মাছির ডানার ন্যায় একটি মাত্র

পাপের কারণে পাহাড় তুল্য পূণ্যকর্ম সমূহকে আবৃত করে নেয় ভূলে যায়। মুমিন ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। মানুষের জন্যে সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে এক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের কারণ হয়ে দাড়ায়।

শয়তানের এই ষড়যন্ত্রের ন্যায় অন্য **আরেকটি চক্রান্ত** হল মানুষের চিন্তা ফিকিরের বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করা ঈমানের হাক্বিক্বাত সমূহের ঠিক বিপরীত সুষ্ট বিচার বিশ্লেষন নষ্ট করে এবং প্রতিষ্টিত সুষ্ট চিন্তা চেতনাকে ধাধায় ফেলে বিনষ্ট করে থাকে। উদাহরণ হল এমন যে, একটি ঈমানের হাক্বিক্বাতের সাথে সংশ্লিষ্ট শত শত প্রমানিক দলিল সমূহের হুকুমকে নেতিবাচক পথে সরবরাহকারী এক হুকুমের সাথে ঈমানী শক্তিকে নষ্ট করতে চায়। অথচ **প্রতিষ্টিত নিয়ম হল কোন প্রমানকারী দলিল অসংখ্য বাতিল প্রমানের চেয়ে অধীক গ্রহনীয়তার যোগ্য**। একটি মামলার স্পষ্ট সাক্ষী অসংখ্য অস্বীকার কারীর বিপরীতে প্রাধান্য যোগ্য এই হাক্বিক্বাতকে নিম্নের উপমাতে লক্ষ কর। একটি প্রাসাদের শত শত দরজা বন্ধ রয়েছে। একটি মাত্র খোলা রয়েছে। এই দরজা দ্বারা ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করা সম্ভব। প্রবেশ করে অন্যন্য দরজা ও খোলা যায়। এখন যদি সমগ্র দরজা খোলা থাকে এক দুটি যদি বন্ধ করা থাকে তাহলে এটা বলা যায় না যে, ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করা যাবে না। সুতরাং ঈমানের হাক্বিক্বাত সমূহ হল ঐ প্রাসাদতুল্য। ঈমানের পক্ষের প্রত্যেকটি দলিল হল একেকটি চাবি যা তার পক্ষের অবস্থানকে প্রমাণ করে এবং দরজা সমূহকে উন্মুক্ত করে। এখন একটি মাত্র দরজা বন্ধ হওয়ার দ্বারা ঐ অসংখ্য ঈমানের হাক্বিক্বাত সমূহ থেকে বিরত থাকা যায় না এবং মুখ ফিরিয়ে অস্বীকার করা যায় না। ঠিক এই প্রেক্ষাপটে শয়তান বেশ কিছু মাধ্যমের উপর ভিত্তি স্থাপন করে কিংবা অবহেলা নতুবা অজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষকে বন্ধ থাকা একটি দরজাকে সামনে তুলে ধরে প্রতিষ্টিত সমস্ত ঈমানী হাক্বিক্বাত সমূহকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে দেয় ফলশ্রুতিতে এভাবে বুঝায় যে, এই প্রাসাদে প্রবেশ করা অসম্ভব হয়তু এটা কোন প্রাসাদই নহে এর ভিতরে আসলে কিছু নেই। বলে বলে ধোকায় ফেলে।

সুতরাং হে নিরুপায় মানুষ তুমি শয়তানের ষড়যন্ত্র সমূহে বন্ধি হয়ে আছো। যদি তুমি দ্বীনদারীর জীবন ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজীক জীবনের শান্তির কথা বলতে চাও এবং যদি তুমি শূষ্ট চিন্তা ফিকির সুদৃঢ় অবস্থান এবং অন্তরের প্রশান্তি চাও তাহলে ক্বোরআনের সুস্পষ্ট বিধিবিধানের পাল্লার দ্বারা এবং নবীজির আদর্শের নিক্তির দ্বারা স্বীয় আমল সমূহ ও স্বীয় চিন্তা-চেতনাকে মেপে নাও। সর্বক্ষন ক্বোরআন ও নবী সা. এর সুন্নাতকে রাহবার হিসেবে গ্রহণ করা এবং

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم বলে বলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। (লাম'আলার ৮৮)

প্রকৃতপক্ষে, মানুষ হল উত্তম ধারনার প্রতি কর্মচারী। মানুষ সবার চাইতে নিজেকে উত্তম মনে করা তার ফিতরাত, স্বভাব। তবে মানুষ যেন এটা না করে যে নিজের মাঝে থাকা খারাপ চরিত্র, মন্দ ধারনার দ্বারা অন্যদেরকে ও তার মতো মনে করা। অন্যান্যদের অনেক চলা ফেরার, হেকমতের ধরনকে না জানার কারনে, তার অনুচিত তাদেরকে অবহেলা করা, খারাপ মনে করা। এরই ধারাবাহিকতায়, আমাদের মর্যাদাবান পূর্বসূরিদের হেকমত সমূহের অনেকটাই আমরা না জানার কারনে তাদের অনেক অবস্থা সমুহকে অপছন্দ করা নিরঙ্কুশ ভাবে মন্দ ধারনা বৈ কিছু নহে। যদি মন্দ ধারনা হয় তাহলে মনে রাখবেন আমাদের বস্তুগত, বাহ্যিক ও তাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক সামাজিক মূল্যবোধে ক্ষতিকর কিছু ছাড়া আর কিছু আসা করা যায় না এটা কেবল বাড়তেই থাকবে। (মাস্নাবিয়ে নুরিয়া ৬৬)

যাদের প্রতি মন্দ ধারনা করি আমাদের এই ধারনায় তাদের কি-ইবা ক্ষতি আছে?

তাদের এক অংশ আপনাদের ন্যায় তত্ত বিহীন, তাহকিক বিহীন চলা ফেরা করে । তারা (তাক্লিদের) অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামের বাহ্যিক বিষয়াদিকে জানে। এখন যদি তারা এমন অনুসারী হয়, তাহলে মন্দ ধারনার কবলে পরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায়, বেশীরভাগই - বিশেষ করে দ্বীনের পথে গভীর দক্ষতা না থাকায়, (ফলসফা) দর্শনের প্রতি যদি প্রচন্ড আগ্রহী হয়ে যায় – আপনাদের দেওয়া নাস্তিক তকমা পাওয়ার পর, বেশীকাংশে তারা সিদ্ধান্ত হীনতায় পড়বে, সে ইসলামের সুমহান গণ্ডি থেকে বের হয়ে গিয়েছে এমন ধারনার বাহানায় প্রবৃত্তির অয়াছওয়াছায়, ধোঁকায় পড়ে " যা হবার হবে" এমনটি বলে আশাহীন হয়ে এমনকি একঘেয়েমির পেরেকে বন্দি হয়ে ইসলামের শালীনতার সাথে অভদ্রতায় ব্যাস্থ হয়ে যাবে। সুতরাং হে বে-ইনছাফগন! আপনারা বুঝতে পারছেন, দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে অনেক মানুষের জন্যে আপনারা পথভ্রষ্টতার কারণ হচ্ছেন। মাথা গুঁড়া কোন লোক কে " তুমি ভাল, তুমি ভাল" এভাবে বলিলে যেমন ভাল হওয়ার এবং ভাল মানুষকে যেমন " তুমি খারাপ তুমি খারাপ" বলতে থাকলে সে খারাপ হওয়ার ঘটনা অনেক অনেক আপনাদের জানা থাকার কথা। (মুনাযারাত ৪২)

কৃতজ্ঞতা / শুকরিয়া

হাঁ, ক্বোরআনে-হাকীম যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে সৃষ্টির রহস্য হিসেবে তুলে ধরেছে তেমনিভাবে ক্বোরআনে-কাবীর হওয়া এই পৃথিবী ও প্রদর্শন করছে যে, এই পৃথিবীর সৃষ্টির সর্বোচ্চ মর্মময় উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টার প্রতি শুকর-গোজার হওয়া। তার কারণ হিসেবে যদি ভূ-পৃষ্ঠের দিকে লক্ষ করা হয় তাহলে দেখা যায় যে, এই দুনিয়ার সাজসজ্জা কৃতজ্ঞতাকে আবশ্যকীয় করে এমন রকমের প্রত্যেক বস্তুই এক ধরনের প্রস্তুতিমূলক ভাবে অবস্থানে রয়েছে ঐ দিকে তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি তার মোড় ঘুরাচ্ছে। আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাতে স্পষ্ট হয় যে এই মহান সৃষ্টির বৃক্ষ (দুনিয়া) থেকে এর প্রধান ফলই হল শুকুর গোজার হওয়া। অন্য কথায় এই ভূ-মন্ডলের কারখানার থেকে বের হওয়া বস্তুর উত্তম ও উচ্চ পর্যায়ের জিনিসটার নাম হল শুকুর।

কেননা ভূ-মন্ডলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই অস্থীতিশীল পৃথিবীকে একটি তলা বিশিষ্টের রূপ ধারণ করিয়ে তার মধ্যে জীবনকে সৃষ্টি করেছেন কেন্দ্র বিন্দু স্বরূপ, যার ফলে সমস্ত সৃষ্টি ঐ "জীবন কে লক্ষ করত: জীবন নামের সৃষ্টিকে খেদমত করে যাচ্ছে।" এমন কি জীবনের সমস্ত প্রয়োজন ও মিঠাচ্ছে।

অর্থাৎ পৃথিবীকে সৃষ্টিকারী সত্ত্বা যিনি, তিনি সমস্ত সৃষ্টি থেকে ঐ জীবনকে নির্বাচন করছেন। আর পরে আরও দেখছি যে, জীবনের দুনিয়াকে (সৃষ্টিকে) একটি স্তরের অবস্থানে তৈরী করে মানুষের কেন্দ্র বিন্দু হওয়া একটি সিস্টেমে তাহাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আর স্বভাবত জীবনের থেকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য স্বরূপ তাহাকে কেন্দ্রস্থল হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর সমস্ত জীবনকে তার আশেপাশে রেখে তার প্রতি খেদমত করাচ্ছেন এবং তার অনুগত করাচ্ছেন। আর সমস্ত সৃষ্টিকূল কে অনুগত করে মানুষকে হাকিম (নির্দেশক) হিসেবে স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ খালিকে-যুল-জালাল মহান আল্লাহ, সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষকে নির্বাচন করে দুনিয়াতে তাহাকে অবস্থানী করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

আমরা আরও দেখাচ্ছি যে, মানবের এই পৃথিবীতে এমনকি প্রাণীকূলের পৃথিবী ও বঠে এখানে যেন একটি আবাসস্থলের ন্যায় স্থানের রূপ নিয়েছে এবং এই স্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে যেন খাবার দাবার কে তাদের জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর এই সমস্ত মানব ও জীবজন্তুকে খাবারের প্রতি স্বভাবত একান্ত আগ্রহী করে তাদের প্রতি রিযিককে খাদিম হিসেবে কাজ করার নির্দেশাবলী প্রদান করেছেন। তাদেরকে আদেশকারী ও বানিয়েছেন আর তা হল রিযিক। আর রিযিককে ঐ পরিমাণ প্রশস্থ ও ঋণী করে তৈরী করেছেন যে, অসংখ্য নেয়ামত

সমূহ যেখানে সন্নিবেশিত। এমন কি রিযিকের অসংখ্য প্রকার সমূহ থেকে মাত্র একটি প্রকারের স্বাধকে জানার, আস্বাধন করার জন্যে জিহ্বার মধ্যে স্বাদগ্রহণের একটি ক্ষমতা প্রদান করতঃ ভিন্নমুখী খাবারের সংখ্যার ক্ষেত্রে অসংখ্য ও ব্যতিক্রমী স্বাধের পরিমাপের ধারণ ক্ষমতা রেখে দিয়েছেন। অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিশ্ময়কর সর্বোচ্চ মাহাত্মপূর্ণ, মাদুর্যময়, সর্বোচ্চ ব্যাপক ও সর্বোচ্চ চমৎকার বাস্তবতা হল রিযিকের মধ্যে।

এখন আমরা দেখছি যে, সকল বস্তু যেন রিযিকের আশপাশে একত্রিত করা হয়েছে আর সবাই ঐ রিযিকের দিকে থাকাচ্ছে, আর একিভাবে রিযিক ও সমস্ত সৃষ্টির জীবদের দিকে আধ্যাত্মিকগত ও বস্তুগত, পরিস্থিতিগত ও ভাষাগত সবক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার সাথে সে দাড়ানো ও উপস্থিত। যা কৃতজ্ঞতার দ্বারা হচ্ছে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে বাস্তবায়িত করছে স্বীয় সত্ত্বায় এবং শুকুরকে প্রদর্শন করছে।

কেননা রিযিকের প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ ও চাহিদা হচ্ছে এক রকমের স্বভাবসুলভ কৃতজ্ঞতা। এবং স্বাদ ও আস্বাদনের ক্ষেত্রে এটা একটা অনিচ্ছাকৃত কৃতজ্ঞতা যে, যাহা সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে কেবল মানুষ এই স্বভাবজাত কৃতজ্ঞতাকে কুফুরী ও ভ্রষ্টতার দ্বারা তার গুরূত্বকে পরিবর্তন করে যাচ্ছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশতো করছেই না বরং শিরকের প্রতি ধাবিত হচ্ছে।

আর রিযিক হওয়া যত নেয়ামত সমূহ রয়েছে সবকিছুতে অসংখ্য নিরব আকৃতি সমূহ, অসংখ্য লালসাময়ী ঘ্রান সমূহ অসংখ্য মজাদার স্বাধসমূহ: সবকিছুই যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে আহ্বান করছে জীব সমূহকে যেন আহ্বান করে তার প্রতি আগ্রহী হতে আর এই মজাদার আগ্রহের সাথে এক প্রকার আনন্দ ও মর্যাদা কে প্রদর্শন করছে যার ফলে এক আধ্যাত্মিক কৃতজ্ঞতাকে মনোবল রূপে তৈরী করে পাশাপাশি জীবনের সম্মুখে এসে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আনন্দ উল্লাসের প্রতি উৎসাহি করে। নেয়ামত সমূহের প্রতি সম্মান প্রদানে তাহাকে উদ্দীপ্ত করে। এবং তার সাথে অবস্থান করে ভাষাগত ও কর্মগত ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতাকে পথ প্রদর্শক রূপে প্রদর্শন করে এবং পরিশেষে তাহাকে দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায় এমনকি শুকুরের ভিতরে থাকা যে উচ্চতর স্বাধ রয়েছে ও মজাদার বস্তু রয়েছে তাহাকে আস্বাধন করায়। অর্থাৎ দেখাচ্ছে যে, এই অনুভূতি মজাদার রিযিক ও নেয়ামত রাজী অল্প ও সুনির্দিষ্ট এক প্রত্যক্ষময় স্বাদের পাশাপাশি এমন জিনিস তুমি অর্জন করবে সেটা হলো, মহান রহমানের অনুগ্রহীপূর্ণ চিরস্থায়ী ও বাস্তবীক স্বাধ এটা অর্জন সম্ভব কেবল তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে। অর্থাৎ রহমতের ভান্ডারের মালিক মহান করীম অসংখ্য স্বাধময়ী হওয়া তার আদর স্নেহকে চিন্তা করে এই দুনিয়াতে ও যেন জান্নাতের চিরস্থায়ী এক স্বাধ আস্বাধনের অর্জন আধ্যাত্মিকভাবে যেন করাচ্ছে। সুতরাং রিযিক শুকুরের (কৃতজ্ঞতার) কারণে ঐ পরিমাণ মূল্যবান ও মাহাত্মপূর্ণ একটি সার্বিক গুদাম জাত করণ হওয়ার অবস্থায় সুস্পষ্ট যে, অকৃতজ্ঞতাকে অসংখ্য নিম্নস্থরের স্থির নিক্ষেপ করে। কৃতজ্ঞতার তাৎপর্য তুলে ধরে।

৬ষ্ঠতম কালেমায় উল্লেখিত হওয়ার ন্যায়! (এখানে ও বলছি) জিহ্বার মধ্যে যে স্বাধ অনুভূতি রয়েছে সেটাকে মহান রবের বিবেচনায় চিন্তা করলে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মনোভাব নিয়ে কৃতজ্ঞতার প্রকাশকরণের সাথে যখন রিযিককে অনুভব করা হয় ঠিক ঐ সময়টাতে যা হয় তা হল ঐ এই স্বাধের যন্ত্র জিহ্বার স্বাধ অনুভূতিটা অসংখ্য রহমতের এলাহি যিনি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ও তদারককারী এবং প্রসংশাকারী এক সর্বোচ্চ অসীম মর্যাদার সমাসীন স্থরের স্থরে আধিষ্ঠিত।

অন্য দিকে যদি নফস এর বিবেচনায় এই জিহ্বার অনুভূতিকে চিন্তা করা হয় তখন ফলাফল দাড়ায় অর্থাৎ রিযিককে নেয়ামত হিসেবে সাব্যস্থকারী যে শুকুর (কৃতজ্ঞতা) রয়েছে তাহার প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ না করে

জিহ্বার অনুভূতিশীল ক্ষমতা সর্বোচ্চ সম্মানে সমাসীন স্থর থেকে বের হয়ে খাবারের স্থল পেট যেন এক নিষিদ্ধ কারখানা ও জ্ঞানহীন জানোয়ার প্রাণীর পেটের স্থর স্বরূপ সাব্যস্থ হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। না এটা নেয়ামতের স্থল না রহমতের হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার কিভাবে যে এই রিযিকের খাদেম মানুষ অকৃতজ্ঞদের সঙ্গী হয়ে এই পরিমাণ নিম্নের স্থরে নিক্ষিপ্ত নিজে নিজেকে করে। শুধু এটা নহে সে রিযিকের মান মর্যাদাকে এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী খাদেমদেরকেও সে অসম্মান ও নাস্তানাবোধ করচ্ছে। সর্বোচ্চ একটি অবস্থান থেকে সর্বনিম্ন স্থরে তাহাকে নিয়ে আসছে। এই জন্যে তারা এমনটি করে যে এই কায়েনাতের মালিকের সৃষ্টির রহস্যের ঠিক বিপরীত অবস্থান নিয়ে এক কার্যক্রমে ব্যস্থ রয়েছে কৃতজ্ঞহীন অবস্থায় অবস্থান রেখে রেখে। শুকুরের (কৃতজ্ঞতার) মানদন্ড হল; পরিতৃপ্তিতা ও মিতব্যয়ীতা, সন্তুষ্টিতা ও কৃতজ্ঞতা--। অকৃতজ্ঞের পাল্লা হল; লোভ ও অপচয় এবং অমর্যাদা ও খাবারে হালাল হারামের তোয়াক্কা না করা । আর অবশ্যই লোভ অকৃতজ্ঞতার পরিণাম হওয়ার ন্যায় যেমনটি দুর্ভাগার কারণ তেমনি আপদস্থতারও কারণ। এমনকি সামাজিক জীবনের অংশ হিসেবে নিরংকুশ পিপিলীকা ও এই লোভের শাস্তির মুখোমুখী হয়ে যেন পায়ের নিচে পড়ে তারা নিহত হয়। কেননা পরিতৃপ্ত না হয়ে, বছরে কয়েকটা গম পর্যাপ্ত হওয়ার পরও হাতে হাজার খানিক গম মজুদে এক দরনের কাজে ব্যস্থ থাকে, আবার পবিত্র মৌমাছি পরিতৃপ্ততার কারণে শুরূ করে উপরে উড়ে পরিতৃপ্ত হওয়ার কারণে তার মধুকে মানুষের জন্যে আল্লাহর হুকুমে দয়াপ্রবণ হয়ে তা এহছান করে তার মধু মানুষকে খাওয়ায়। হাঁ, মহান পবিত্র সত্ত্বার জাতিগত নাম ও ইসমে-আযম হওয়া শব্দ “আল্লাহ এর পরে সর্বোচ্চ মহান নাম হল রহমান” যা রিযিক সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং রিযিক থেকে উৎকৃষ্ট কৃতজ্ঞতা ঐ রিযিককে আবার তৈরী করে। আর এটা স্পষ্ট যে, এই রহমান শব্দের প্রস্ফুটিত এক অর্থ হল রিযিক্দাতা (রাজ্জাক)। আর অবশ্যই কৃতজ্ঞতার শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে আর তার শ্রেষ্ঠতম শ্রেণী ও অনির্দিষ্ট ক্ষমতাবান প্রকারের সুচি হল “নামাজ”।

বলাবাহুল্য, কৃতজ্ঞতার ভিতরে পরিষ্কার ঈমান রয়েছে এবং বিশুদ্ধ এক একত্ববোধ ও পাওয়া যায়। কেননা একটি আপেল কে ভক্ষণকারীও “আলহামদুল্লিাহ” দিয়ে শুকুর আদায়কারী ব্যক্তি ঐ কথার ঘোষণা দিচ্ছে যে, এই আপেল হল কুদরতের বিধানের এক দর্শন এবং সুস্পষ্টভাবে রাহমানের গুদাম থেকে এক উপহার স্বরূপ। এভাবে বলে ও বিশ্বাস স্থাপন করে প্রত্যেক বস্তুর আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ অবস্থান যাই হোক না কেন মহান মালিকের প্রতি সমর্পন করচ্ছে। আর সে প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রে রহমতের আলোকে জানে ও দেখে। বাস্তব এক ঈমান ও বিশুদ্ধ এক একত্ববাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার সহিত তার মনোভাব প্রকাশ করচ্ছে। মানবিক অবহেলা ও নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ ও অস্বীকৃতি সে কি পরিমাণ নিম্নশ্রেণীর একটি ক্ষতিকর বিষয় অনেক অনেক কারণ ও দিক সমূহ থেকে একটি আমরা বর্ণনা করছি এটা হল যে, মজাদার কোন খাবার যদি মানুষ ভক্ষণ করে এবং তার কৃতজ্ঞতা ও স্বীকার করে, তখন ঐ ভক্ষণকৃত নেয়ামত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা এক নুরে (আলোতে) রূপান্তরিত হয়। এটা পরকালের জন্যে একটি জান্নাতের ফলের রূপও নেয়। আস্বাধিত ঐ স্বাধ কে যখন মহান আল্লাহর রহমতের কৃপা স্বরূপ চিন্তা করতঃ ভোগ করার ফলে এটা বড় ও চিরস্থায়ী স্বাধ ও মজা প্রদান করে। এটার ন্যায় আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ও সারাংশ এবং বস্তুময় কোন ফলের বাকল কে অদৃশ্য এক উচ্চ পর্যায়ে প্রেরণ করত: সাধারণ বা নিম্নময়ী কোন কিছু যা আমরা খাবারের পর ফেলে দেই কিন্তু যদি এটাকে ও কৃতজ্ঞতার নিরীখে চিন্তা করে তা কিন্তু আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের দৃষ্টিতে ডাস্টবিন না হয়ে নেয়ামতের রূপে রূপ নিয়ে আখেরাতের ফল স্বরূপ রূপান্তরিত হয়। অন্য দিকে যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা না হয় তাহলে সুনির্দিষ্ট ও সীমিত ঐ স্বাধ দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথে এক কষ্টের কারণ ও হতাশার কারণ হয় এমনকি স্বয়ং

ব্যক্তিও নিকৃষ্টতার অংশ হয়। তখনকার অবস্থা হীরার মাহাত্ম কয়লার ন্যায় হয়ে যায় । কিন্তু কৃতজ্ঞতার সাথে খেলে ও চিন্তা করলে শেষ হয়ে যাওয়া ফল ও খাবারের স্বাধ চিরস্থায়ী রূপে রয়ে যায়।

কৃতজ্ঞহীন হলে খুবই সুন্দর আকৃতিটা নিকৃষ্ট আকৃতিতে রূপ নেয়। কেননা ঐ গাফেল লোকটির মতে ফল খাবার পর তার শেষাংশ নষ্ট হয়ে যায় আর কোন উপকারে আসে না। হাঁ, রিযিকের প্রেমে প্রেমাস্বদ হওয়ার একটা খাদ আকৃতি বা ভাব রয়েছে আর এটা প্রস্ফুটিত হয় কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে। নতুবা আহলে গাফিল ও ভ্রষ্ট লোকটি তো চতুষ্পদ প্রাণী ছাড়া অন্য কিছুর ন্যায় রিযিকের প্রেমে পড়ে না। আর এর বিশেষ পন্থাকে যদি তুলনা কর তুমি বুঝতে পারবে যে, অবহেলায় জীবনযাপনকারীরা ও ভ্রষ্ট ব্যক্তিরা কি পরিমান নিম্নশ্রেণীর স্থরে ক্ষতিক্ষর অবস্থায় গেরাও রয়েছে।

জীবন বহনকারী সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে রিযিকের জন্য বেশি মুখাপেক্ষী হল "মানুষ"। মহান মালিক মানবকে এই পৃথিবীর খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে গুণাবলী রয়েছে তা হল এই মানুষকে তিনি তার নাম সমূহ শিখিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়না প্রদান করেছেন এবং এই মানুষকে রহমতের গুদামের ভান্ডারসমূহের অনুভূতি ও অনুভব করার জন্যে পঞ্চইন্দ্রিয় ক্ষমতাময় এক অস্ত্র তাহাকে দিয়েছেন যা কুদরতের অলৌকিক এক নিদর্শন। এবং এই মানুষকে যে নাম সমূহ শিখিয়েছেন এগুলোর তজল্লী ও এগুলোর মধ্যে বিশেষজ্ঞ হওয়ার যে সূক্ষ সূক্ষতা পরিমাপ করার ক্ষমতা ও তাহাকে দিয়ে তিনি এই বিশাল পৃথিবীর খলিফা রূপে সৃষ্টি করেছেন। আর এই জন্যে মানুষকে অসংখ্য প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী করতঃ বস্তুবাদিক ও আধ্যাত্মিক সর্বশ্রেণীর রিযিকের মুখাপেক্ষী করেছেন। আর মানুষ এই ব্রত গুণাবলীর প্রেক্ষিতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থলের এক অধিকারী হওয়া "আহসানে তাক্বীম" (সুন্দরতম অবয়ব) এর মালিক হওয়ার মাধ্যম কেবল শুকুর গোজার হওয়ার জন্যে করেছেন । যদি শুকুরিয়া প্রকাশ না করে তাহলে সে নিচ থেকে নিচে নামবে এবং ফলাফলে স্বীয় তরে সাথে অসীম জুলুমকারী হিসেবে সাব্যস্থ হবে। (মাক্তুবাত ৩৬৪)

আহলে গাফলাত ও রূহ এর দৃষ্টিতে যারা উন্নত হয়নি এবং কৃতজ্ঞ হওয়ার মাসআলায় তরক্কী হয় নাই এমন লোকেরা আসলেই এক দারোয়ানের ন্যায়ই। তাই তার স্বাদের খাতিরের জন্যে অপচয়ে ও একগুনের স্থলে দশগুণ মূল্য দেওয়া থেকে বিরত থাকা দরকার। অপর দিকে যারা আসলেই কৃতজ্ঞ ও আহলে হাক্বিক্বাতের এবং আহলে ক্বলবের স্বাদেন্দ্রীয় ৬ষ্ঠ কালেমায় বর্ণনা করার ন্যায় স্বাদেন্দ্রীয় এলাহীর রহমতের রান্নাঘরের এক পরিদর্শক ও তত্ত্বাবদায়কের ন্যায় কাজ করে। এবং ঐ স্বাদেন্দ্রীয়তে খাবারের সংখ্যাও পরিমাপকের দ্বারা এলাহির নেয়ামত সমূহের প্রকার সমূহকে জানা,ওজন করা; এক আধ্যাত্মিক কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেহকে, পাকস্থলীকে সংবাদ প্রদান করে অত:এব এই পদ্ধতিতে স্বাদেন্দ্রীয় কেবল এই গোস্তের দেহকে লক্ষ করছে না, বরং ক্বলবকে, রূহকে, জ্ঞানকে ও সম্পর্ক রেখে খেয়াল রাখার দৃষ্টিতে পাকস্থলীর উপর তার ধাপ রয়েছে স্থর ও রয়েছে। অবপ্যয় না করার শর্তে কেবল কৃতজ্ঞতার আত্মপ্রকাশ কে তার স্থলে আনতে এবং নেয়ামতের রকমারী বিদ্যমান স্বাদকে অনুভব করে তার সাথে পরিচিত হওয়ার তরে ও শরীয়ত সম্মত হওয়া এবং লাঞ্চনা ও ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যম না হওয়ার শর্তে তার স্বাদকে পরিলক্ষিত করতে পারে। এবং ঐ স্বাদেন্দ্রীয় কে, বহনকারী জিহ্বা শুকরিয়াতে ব্যবহার করার জন্যে সুস্বাদু খাবার সমূহ নির্বাচন করতে পারে। (লাম'আলার ১৪০)

একজন বাদশাহের রান্নাঘরের খাবার থেকে একজন বাবুর্চি যদি খাবার এনে দেয় তাহলে সে অবশ্যই একটা মূল্যের আশাবাদী থাকে আর যখনী তাহাকে মূল্য বা বখশিশ প্রদান করতঃ যদি এই মূল্যবান খাবারের

নেয়ামত কে স্বাভাবিক খাবার মনে করে এমন কি এই খাবারের মূল্য, আসল দানকারী কে যদি না চেনে তাহলে তো এটা অসংখ্যতীত নিম্নস্থরে পথিত হওয়ার ন্যায় এক নির্বোদ্ধিতা ছাড়া কিছুই হবে না। আর মহান পরাক্রমশালী রব যিনি অসংখ্য ও রকমারী নেয়ামত সমূহ পৃথিবীর বুকে মানুষের জন্যে প্রদান করেছেন। আর তিনি ঠিক এই দানের বিপরীত শুকুর (কৃতজ্ঞতা) চাচ্ছেন তার মূল্য হিসেবে। যদি ও এই নেয়ামতের প্রত্যক্ষ অধিকারী বা মালিক যেন ঐ বাবুর্চির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ঐ নামদারী খাবারের বন্দোবস্তকারী বাবুর্চিকে মূল্য দিচ্ছি তাদের কাছ থেকে কত কিছু আশাবাদী রয়েছি। যদিও তারা এতটাই উপযুক্ত নহে যতটুকু আমরা তাহাদেরকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। অথচ যেখানে আসল মুনিব যিনি ঐ সহায়তার করণসমূহের থেকে সীমাহীন নেয়ামতের আবেদন গ্রহণকারী মালিক সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে তিনি কৃতজ্ঞতার হক্বদার। সুতরাং তার কৃতজ্ঞতা এভাবে প্রকাশ করা আবশ্যকীয় যে, তিনিই এই অসংখ্য নেয়ামতের নিঃসন্দেহে মালিক ঐ নেয়ামত সমূহের মূল্য নির্ধারণ এবং তার থেকে নেয়ামতের মুখাপেক্ষী আমরা এটা অনুভব করাই হচ্ছে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

সুতরাং রমজান শরীফের রোজা, মৌলিক ও বিশুদ্ধ মর্যাদাময় ও অনির্দিষ্ট এক কৃতজ্ঞতার চাবিকাটি। তার কারণ হল, বিভিন্ন সময়ে মানুষ যখন কোন বাধ্যবাধকতায় না পড়ে এবং ক্ষুধার্থ হয়না ঠিক তখন সে নেয়ামতের মূল্য ও মাহাত্ম বুঝতে ও প্রধান করতে সক্ষম হয় না। ছোট্ট একখানা রূটির শুকনো টুকরা, এর মূল্য পেট ভর্তি লোকেরা বা যদি ধ্বনী হয় তাহলে এই নেয়ামতের লেবেল বুঝতেই পারে না। অথচ এই শুকনো রূটির টুকরা যখন ইফতারের সময় হয় একজন মুমিনের দৃষ্টিতে খুবই গুরূত্বপূর্ণ ও জরূরী হওয়া এলাহীর নেয়ামতের ব্যাপারটা বুঝশক্তিকে প্রশ্ন করলেই তার সাক্ষী প্রদান করবে। বাদশাহ থেকে সুদুর একজন গরিবের কাছ পর্যন্ত সকলেই রামযান মোবারকে ঐ নেয়ামতের মূল্যটা বুঝতে এক আধ্যাত্মিক কৃতজ্ঞতার প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত। আবার যদি দিন দুপুরের খাবারের তৃপ্তিকর অবস্থার দৃষ্টিতে চিন্তা করি যে, "আসলে এই নেয়ামত সমূহ আমার মালিকানার নিয়ন্ত্রণে নহে। আমি এগুলোর অর্জন ভোগে স্বাধীন নই। অর্থাৎ এই নেয়ামত রাজী অন্যের মাল এবং অন্যের দান। তারই হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে এভাবে বলে বলে নেয়ামতকে নেয়ামত হিসেবে চিনে; এবং আন্তরিক আত্মশুদ্ধির দ্বারা শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। তাই এই রূপ ও ফিকিরের ধারাবাহিকতায় রোজা অনেক দৃষ্টিতে মৌলিক মানুষের আসল পরিচয় হওয়া কৃতজ্ঞতার এক অমূল্যময় চাবির হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হয়। (সোজলার ৩৯৯)

অবশ্যই বস্তুর ইক্তিরান বা সম্পর্ক, সম্পৃক্ততা আলাদা বিষয়, ইল্লাত বা কারণ, হেতু আলাদা বিষয়। একটি নেয়ামত তোমার কাছে আসছে; কিন্তু একজন মানুষের তোমার প্রতি তার এহসান করার নিয়ত, এটা ঐ নিয়ামতের প্রতি তুলনাকারী, সম্পর্ক কারী হয়েছে; কিন্তু তার হেতু বা ইল্লাত হয় নাই। এখানে ইল্লাত হল এলাহির রহমত। হাঁ এটা সত্য যে ঐ লোকটি যদি দয়া, এহসান করার নিয়ত না করিত, তাহলে ঐ নিয়ামত তুমার কাছে আসতো না। তখন নেয়ামতের না হওয়াটা না আসাটা ইল্লাত বা হেতু হতো। কিন্তু উল্লেখিত কায়দার নিয়ম অনুসারে, ঐ লোকটির এহসান করার নিয়তের ঝোঁক বা প্রবনতাটা, ঐ নেয়ামতের ইল্লাত হওয়া অসম্ভব। হাঁ, অসংখ্য শর্ত সমূহের থেকে একটি শর্ত হতে পারে। যেমনঃ রিসালে নুরের ছাত্রদের মধ্যে থাকা বেশ কিছু আল্লাহ্‌র নেয়ামতের অন্বেষণ কারী স্বত্বাগন (হুসরেব, রাফাত এর ন্যায়) তারা ইক্তিরানকে তথা সম্পর্ককে ইল্লাতের সাথে তথা হেতুর সাথে মিলিত করে ফেলছিল। তাদের উস্তাদকে অতিরিক্ত সম্মান ভক্তি দেখাচ্ছিল। অথচ মহান আল্লাহ্‌ তাদেরকে কোরআনের শিক্ষার প্রধান কৃত অর্জিত নেয়ামতের সাথে, তাদের উস্তাদকে তাদের জন্যে এহসান করাটা নেয়ামতের ব্যাপারতাকে নিয়ে এসেছেন, এখানে সম্পৃক্ততা দান করেছেন। এখানে তারা বলছে যে, "যদি আমাদের উস্তাদ এখানে না আসতেন, তাহলে আমরা এই

শিক্ষা পেতাম না, আর যেহেতু ব্যাপার এরকম তাহলে আমাদের এই ফায়দা, উপকারটা হল ইল্লাত"। এখন আমি ও বলছি যেঃ " হে আমার ভাইয়েরা! মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার ও তুমাদের কাছে কৃপাকৃত নেয়ামত সলে এক সাথে এসেছে। আর এই দুনোটি নেয়ামতের ইল্লাত ও এলাহির রহমত স্বরূপ। আমি ও এক সময় তুমাদের ন্যায় অনেক মুহতারাম, হিরা তুল্য সৎ খানেক সুহৃদগণের ব্যাপারে আমার প্রতি ছাত্র হওয়ার অনেক এহসান কারী হিসেবে অনুভব করছিলাম। এবং আমি বলছিলাম যে এই ছাত্ররা যদি না আসতো তাহলে আমার ন্যায় অর্ধ মূর্খ মানুষ কীভাবে এত উচ্চ মানের খেদমত করতে পারত। পরবর্তীতে বুঝলাম যে, আপনাদেরকে কলমের মাধ্যমে নির্বাচনের পবিত্র নেয়ামতের পরে, আমাকে ও তিনি এই খেদমতের তরে উপযুক্ততা দান করেছেন। একে অপর কে সম্পর্কিত করেছেন, তবে একটি অপরটির ইল্লাত হতে পারে না।আমি আপনাদের কৃতজ্ঞ নয় বরং আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই, আপনারা ও আমার প্রতি এমন অতিরঞ্জনীয় ভাব না দেখিয়ে, তার পরিবর্তে দুয়া ও অভিনন্দন জানাতে পারেন। এই আলচনায় গাফলত কি পরিমাণ আমাদের মাঝে থাকতে পারে তা সহজ ভাবে এখন অনুমেয়। (লামলার ১৩৪)

জেনে রাখো হে প্রিয়! শ্রবণ শক্তি, চক্ষু, মুখ, নাক, জ্ঞান, বাতাস, পানি, মুখের আওয়াজ, খাবার, আলো, অন্ধকার, এর ন্যায় সীমাহীন অনির্দিষ্ট নেয়ামত সমূহ আরও তাৎপর্যময়, গুরুত্ত বহন করে। কীভাবে এই নেয়ামত তুমি পেলে? শুকরিয়া আদায় করেছ কি? প্রশ্নগুলো নীজে কে করতেই হবে। এগুলো আরও বেশী গুরুত্ত বহনের দৃষ্টিতে ব্যাক্তি বিশেষিত নেয়ামত সমূহ থেকে স্থরে স্থরে শুকরিয়ার মুল্যায়ন ও অধিকারকে প্রযোজ্যতার দাবি রাখে। এই ধারানুসারে, এরকম নেয়ামত সমূহের সম্মুখে অকৃতজ্ঞতা করা, শুকরিয়া আদায় না করাটা সব চাইতে নেয়ামতের অস্বীকার বিবেচিত হয়। অবস্থা এমন ক্ষেন্দ্রবিন্দু হওয়ার বেলায়, কিছু মানুষের ব্যাক্তিত্তের সাথে সম্পর্কিত এমন সাহায্য, নেয়ামতের সম্মুখে যদি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেও, এই অসিম নেয়ামত যেন ফিকিরে- চিন্তায় আসছে-ই না। অথচ, সব চাইতে বড় নেয়ামত হল দেখতে পাওয়া সধারন ও আমাদের জীবনে সার্বক্ষণিক চলতে থাকা এনায়েত, নেয়ামত, আল্লাহ্র অনুগ্রহ সমূহ। সাধারণ নেয়ামত সমূহ পুরনাঙ্গতার, গুরুত্তের দলিল হওয়ার ন্যায় চলতে থাকা হর-হামেসা অনুগ্র গুলিও উচ্চ মাপের প্রমান স্বরূপ। (মান্নাবিয়ে নুরিয়া ২৩৯)

সমালোচনা / তানকীদ

এই ক্বোরআনের খেদমতের সংশ্লিষ্ট ভাইদের ক্ষেত্রে সমালোচনা না করা, এবং তাহাদের উপরে হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ রকমের কিছুতে অবস্থা না নেওয়ার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের এখলাসকে অর্জন এবং হেফাজত করতে পারবেন এমনকি আগত সকল প্রকার ঐক্যহীনতার ধুম্রজালকে প্রতিহত করার একটি আধ্যাত্মিক শক্তি এটা। কেননা, যেমন মানুষের এক হাত অন্য হাতের বিপরীত কিছু করে না। এক চক্ষু অন্য চক্ষুর আচরণে বিরক্তি উদ্রেক করে না। কথাবার্তার ক্ষেত্রে শ্রবণে কোন আপত্তি করে না। অন্তরের মন্দ কৃষ্টতায় মন কোন আপত্তি লক্ষ করে না। বরং একে অপরের ক্ষতির ক্ষেত্রে একে অন্যকে সাহায্য ও পূর্ণতার চেষ্টায় নিয়োজিত ভূল-ক্রটিকে ভারসাম্যতায় নিয়ে আসে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহযোগীতা করে। কর্মসূচী পূর্ণতায় সাহায্য করে। তা না হলে ঐ মানব শরীরের হায়াত শেষের দিকে ধাবিত হলে যে পরিণতিতে দেহ থেকে রূহ পলায়নকারী হবে, শরীর ছিটকে যাবে। তেমনি কোন কারখানার কর্মচারিরা একে অন্যের সাথে প্রতিহিংসা করতে পারে না একে অন্যের থেকে উচ্চস্থর অর্জনের ক্ষেত্রে নির্দেশ দিতে পারে না। একে অন্যের ক্রটিসমূহ দেখার সাথে সমালোচনা করে করে কাজের স্বাধ ভেঙ্গে অলসতায় প্রচেষ্টা করতে পারে না। বরং সমস্ত যোগ্যতার সাথে একে অন্যের অনির্দিষ্ট

উদ্দেশ্যে সফল করতঃ ভাল করে বুঝাবুঝি করে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিবে। বাস্তবতার তরে মেহনতের ফলাফলের ভারসাম্যতা রক্ষা করে এক ঐক্যতার সাথে ঐক্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যের দিকে হাটবে।

যদি তারা অল্প পরিমাণ কোন মতবেদ মূখী মনোমানিল্যতা, একে অপরের সহিত চাপাচাপি সৃষ্টি করে। তাহলে ঐ কারখানার রূহ সন্দেহাতীত ধ্বংস হওয়ার যোগ্য ও কারখানার দেহ নামীয় ঐক্য অসীম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কারখানার মালিক ও ঐ কারখানাকে চূড়মার করে সর্বশেষ করে ফেলবে। সুতরাং হে রিছালে নূরের ছাত্রগণ ও কোরআনের খাদিমগণ! আপনারা ও আমরা ঐ রকম এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের নামে সংশ্লিষ্ট এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের দেহের অংশবিশেষ------এবং চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চিরস্থায়ী সুখীদের ফলাফল প্রদানকারীর এক কারখানার কর্মীদের মধ্যে সন্নিবেশিত +++ এবং শান্তির প্রাপ্ত হওয়া দারূসসালাম (শান্তির কেন্দ্র) মুহাম্মদ (স:) এর উম্মতের অন্তর্ভূক্ত হওয়া এক খোদায়ী জাহাজের মধ্যে আমরা সবাই খাদেম ও কর্মী। মূলতঃ চার ব্যক্তি থেকে এক লক্ষ এগারো ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ক্ষমতা স্থীর করতঃ এখলাছের মাহাত্ম অর্জনের সাথে একে অপরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রতি ও মৌলিক ঐক্যের প্রতি আমরা মুখাপেক্ষী ও বাদ্য। হাঁ তিনটি আলিফ একত্রিত হলে একশত এগার আলিফ হবে হরফের লম্বা ঐক্য যদি না হয়, তিনটা একেকটি আলিফ হিসেবে মূল্য বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু এটা সত্য একেকটি আলিফ তারা একা । সচরাচর গোপন মাহাত্মের সাথে যদি ঐক্যতা হয় তাহলে তিনটি আলিফ একত্রিত হলে একশত এগার আলিফ হবে ১১১ ক্ষমতা অর্জিত হবে। চার বার চার যদি পৃথক পৃথক হয়, তাহলে ১৬টি আলাদা মূল্যায়ন ক্ষমতা রয়েছে। যদি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ঐক্যতার উদ্দেশ্য ও কর্মের ঐক্যতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এক লাইনের উপর কাঁদে কাধ মিলিয়ে যদি দাড়ায় তাহলে তখন ৪৪৪৪ ক্ষমতায় ও মূল্যমান হওয়ার ন্যায় আসল এখলাছের শুদ্ধিতায় ১৬ জন উৎসর্গ বন্ধুদের মূল্য ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় ৪ হাজার থেকে উপরে গিয়ে অনেক অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষীস্বরুপ থাকবে। এই মূল নীতির পন্থা হল এই যে, আসল ও সহনশীল এক ঐক্যবদ্ধতায় প্রত্যেক ব্যাক্তি অন্য ভাইদের চক্ষুদ্বারা থাকাতে পারে এবং কর্নদ্বারা ও শ্রবন করতে পারে একই পন্থায় আন্তরিক তারা। কল্পনানুসারে ১০জন মৌলিক ঐক্যবদ্ধ ব্যক্তিরা প্রত্যেকই ২০ টি চক্ষু দ্বারা দেখতে ১০ টি মাথা দিয়ে চিন্তা করছে ২০টি কর্ন দ্বারা শ্রবণ করছে ২০ খানা হাত দিয়ে কাজ করছে কর্ম করছে এদের মধ্যে এক প্রকার আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন ও ক্ষমতা রয়েছে।

ব্যাখ্যা:- হ্যাঁ এখলাছের পরিশুদ্ধতার সাথে সহনশীল ভারসাম্যতার ইত্বেহাদ অসীম উপকারের মাধ্যম হওয়ার ন্যায় ------- ভীতুদের এমন কি মৃত্যুর সম্মুখে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ এক আশ্রয়স্থল ও নির্ভরশীলতার অবস্থানে স্থীরকৃত। কেননা যদি মৃত্যু আসে; একটা রুহ নিবে হাকিকতের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টের রাস্তায় আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্টতায় কার্যক্রমে সংখ্যায়িত ভাইদের রুহ সমূহ এক রুহ হওয়ার ধারাবাহিকতায় যদি কেউ মারা যায় অন্যান্য আমাদের রুহ সমূহ হেফাজতে থাকুক, কারণতুল্য ঐ রুহসমূহ সবসময় আমার উত্তম কর্মসমূহ অর্জন করণ আধ্যাত্মিক এক চলন জিন্দেগীর থেকে আমি মৃত্যু বরণ করি না এই ভাবে বলে বলে আনন্দের সাথে মৃত্যুকে গ্রহণ করছে তারা এবং ঐ রুহসমূহের মাধ্যমে পূর্ণের বিবেচনায় বেচে আছে আর কেবল গুনাহের বিবেচনায় মৃত্যু বরণ করছি। এভাবে বলে প্রকাশিত এখলাছের পরিশুদ্ধতার সাথে সহনশীল ভারসাম্যতা অর্জন করে । (লাম'আলার ১৬০)

আমার সুপ্রিয়, সত্যবাদী ভায়েরা! এই আগ্রাসী বস্তুগত ও তাত্বিক শীতের কালে সব কিছুর মুল্য চড়াদামে চলছে, এবং যা-ই আমাদের হাতে আছে তার মধ্যে আবার দুর্ভিক্ষ, আকালপূর্ণ এবং জীবনের যাপনই খরচাদির ভারি এক চাপের মুখে, বেশির ভাগই যাঁতাকলে থাকা রিসালে নূর সুহৃদগণের এই আক্রমণাত্মক অবস্থার সম্মুখে কম্পন সমূহ ও পারস্পরিক বলে বলিয়ান হওয়ার হিম্মত সমূহের ভেঙ্গে পড়ার দুশ্চিন্তায় একটু বেশী চিন্তাগ্রস্থ হচ্ছি। আপনারা জানেন তো আপনারা সকল সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত এই সকল ঝড়ের মধ্যে পরস্পরে সহযোগিতায় এবং একে অপরের

ঐক্যতায়, পারস্পরিক ভুল-ত্রুটির দিকে লক্ষ না দেওয়া, পারস্পরিক সমালোচনা না করা, রিসালে নুরের ঈমানি-পবিত্র-দায়িত্ত এর দৃষ্টিতে মুখাপেক্ষী ও ভারার্পিত। কঠোর সতর্কমূলক ভাবে বলছি আপনাদেরকে কখনও একে অপরকে আঘাত করবেন না এবং সমালোচনা করবেন না। নতুবা যদি এমনটি দুর্বলতার কাজ করেন, তাহলে মুনাফিকরা সুবিদা ভোগ করে আপনাদেরকে নিশ্চিত বড় রকমের ক্ষতির সম্মুখীন করবে। জীবন যাপনীয় প্রয়োজনাদীর ক্ষেত্রে মিতব্যয়ীতার ও অল্পতুষ্টিতার সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অতি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দুনিয়ার মানফা'আত (লাভ সুবিদা), অসংখ্য আহলে হাকিকাতকে, আহলে তারিকাতকেও বঠে ঈর্ষাপরায়নতার ধুম্রজালে আক্রান্ত করার কারনে আপনাদের নিয়ে আমি প্রচন্ড দুশ্চিন্তার মাঝে আছি। রিসালে নুরের সুহৃদগণকে এখন ও পর্যন্ত এই জাতীয় পরিস্থিতি দেখতে হয় নাই। ইনশা আল্লাহ্ এমন কিছু বাড়বে না। তবে কথা হল সবাই এক আখলাকের হয় না। অনেকে, যদিও ন্যায় নীতির পথে চলতে চাইলেও তাদের প্রতি খবরদার আপত্তি তুলবেন না। নিত্য প্রয়োজনে পতিত কোন সুহৃদ যাকাত গ্রহণ করতে পারে। রিসালে নুরের সাথে পূর্ণ সময় ব্যায় কারী কোন ভাইকে, রুকুন কে, পরিশ্রম কারীদেরকে যাকাতের মাল দিয়ে সাহায্য, সহযোগিতা করাটা ও, রিসালে নুরের এক প্রকার খেদমত করার শামিল।

সাহয্য তো করবেন বঠে, কিন্তু লোভ ও তুষ্ট না হওয়া পেটুকের লালসা, এবং উপস্থিত বাহানা দ্বারা কেউ যেন না চায়, না চাওয়া আবশ্যকীয়। নতুবা, আহলে দালালাত যারা লোভ ও লালসা কামনার পথে তাদের দ্বীনকে নষ্ট করে দিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে নফসের কুচক্রিতার যুক্তিতে, " রিসালে নুরের এক প্রকার ভাইয়েরা দ্বীন কে দুনিয়ার তরে অস্ত্র বানাচ্ছে"। এমনটি অপরাধ করে করে ধ্বংসাত্মক আক্রমনের দরজা তারা খুলছে । আপনারা, মাঝে মধ্যে, এখলাস রিসালে মিতব্যয়ীতার রিসালে এবং আক্রমনের রিসালে (২৯ নং মাক্তুবের ৬নং খন্ড) সকলে মিলে একসাথে পড়বেন। এখন পর্যন্ত আপনাদের স্বাভাবিকভাবে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাময়, সু-পরিকল্পিত প্লান, পরস্পরে বলিয়ান হওয়া, আপনাদের ঐক্যতা এই জাতির জন্যে গৌরবের ব্যাপার হবে, এবং আপনাদের এই হিম্মত ভবিষ্যতের জন্যে রক্ষা কবজ হবে। আপনারা খুবই সতর্ক থাকবেন! এই নতুন ঝড়, আপনাদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে যেন নষ্ট, ধ্বংস না করে। (কাস্তামুনু ২২৩)

ওয়াছওয়াছা / কুমন্ত্রণা / হতাশা

শয়তানের সবচেয়ে ভয়ংকর ফাঁদ হল এই যে, অনেক অনুভূতি ও আবেগ প্রবণ, পরিচ্ছন্ন মানুষের অন্তরে কুফুরির কেবল কল্পনা করাকে সরাসরি কুফুরি হয়েছে এমন প্রভাবে কল্পনা করিয়ে ভেজালে ফেলে দেয়। পথভ্রষ্টার কল্পনাকে যেন বাস্তব পথভ্রষ্ট কল্পনা হিসেবে ধর্তব্য করতঃ এমনভাবে সে কুমন্ত্রণা দেয়। এবং পবিত্র স্বত্বা এবং বিশুদ্ধ বস্তু বিষয়াদীকে খারাপ ও নোংরা হিসেবে অন্তরে ফুতকার দেয়। এমনটি চিন্তা করায়। এবং সম্ভাব্য বিষয়কে বুদ্ধি সুলভ সম্ভাব্য হিসেবে অন্তরে ফুটিয়ে তুলে ঈমানের বিশ্বস্থতার সামনে তার বিপরীত এক সন্দেহের উদ্রেক উপস্থাপন করে। এবং ঐ সময় ঐ সরলমনা ব্যক্তি নীজেকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়েছে কল্পনা করায়ে ঈমানের দৃঢ়তার ব্যাপারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এমনটি ধারণা সৃষ্টি করায়। নিরাশায় লিপ্ত করায় আর ঐ হতাশার কারণে শয়তান তাকে নিয়ে হাসি তামাসা করে। শয়তান যেমন ঐ সরলমনা মু'মীনের হতাশাকে তেমনি তার মাঝে দূর্বল অনুভূতিকে একই সাথে প্রভাব বিস্তার করেছে তার অন্তরের মধ্যে এগুলোকে মন্দতায়

ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। ফলে ব্যক্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পাগল হয় নতুনা বলে “যা হবার হোক” এভাবে চলতে চলতে পথভ্রষ্টতার ঘরে প্রবেশ করে।

বস্তুতঃ শয়তানের এমন প্ররোচনা কি পরিমাণ ভীত্তিহীন হওয়াটা অন্যান্য রিছালাতে আলোচনা করার ধরুন এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এটা এমন যে, **যেমনটি আয়নার ভিতরকার সাপের ছবি ধ্বংস করে না তার ভিতরকার আগুন যেমন পোড়ায় না, নোংরার কারণে কোন প্রতিফলন ঘটেনা। একই ভাবে, কল্পনা ও চিন্তার আয়নাতে কুফুরীর বা শিরকের প্রভাব এবং পথভ্রষ্টার ছাঁয়া ও মন্দ নোংরামূখী কথাবার্তার কল্পনাসমূহ বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্থ করে না। ঈমানকে পরিবর্তন করে না**। শিষ্টাচারীতায় প্রভাব বিস্তার করে না। তার কারণ হল জ্ঞাতব্য নিয়ম হল, গালমন্দের কল্পনা গালমন্দ বিবেচিত না হওয়ার ন্যায় পথভ্রষ্টতার কল্পনা ভাবনা ও ভ্রষ্টতা নহে। আর ঈমানের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির ব্যাপারে সম্ভাব্য কল্পনা থেকে আগত উদ্ভূত সাধারণ সম্ভাব্যতা, এটা মৌলিক ঈমানের বিশস্থতার নেতিবাচক প্রভাব নহে এবং ঐ ঈমানকে নষ্ট ও করে না। উসুলে দ্বীনের শাস্ত্রানুযায়ী নিয়ম বিশুদ্ধ পন্থা হল যে, اِنَّ الْاِمْكَانَ الذَّاتِىَّ لَا يُنَافِى الْيَقِيْنَ الْعِلْمِىَّ (সাধারণ সম্ভাব্যতা যা বিশুদ্ধ বিশ্বস্থতার প্রতি প্রভাব বিস্তারকারী নহে) উদাহরণ স্বরুপ-আমাদের বিশ্বাস হল বাবলার সাগরের অবস্থা এখন পানিতে ভরপুর। অথচ এটা সম্ভাব্য একটা ব্যাপার যে, ঐ সাগর এই মুহুর্তে পানিশূন্য হয়ে যাওয়া। এমনটি হওয়াটা হল একটি সাধারণ সম্ভাব্য বিষয়। এই সাধারণ সম্ভাব্যতা যেহেতু কোন প্রমাণ ছাড়া সম্ভাবনা তাই আমাদের কল্পিত সম্ভাবনাকে প্রমাণ ছাড়া হওয়াতে ভীত্তি দেয় না যে হয়তু হতে পারে। সন্দেহ পূর্ণতা পাবে। কারণ হিসেবে আরেকটি উসুল হল لَا عِبْرَةَ لِلْاِحْتِمَالِ الْغَيْرِ النَّاشِىءِ عَنْ دَلِيلٍ অর্থাৎ প্রমাণ ভীত্তিক না হওয়ার কোন সাধারণ সম্ভাব্যতাতে কোন বুদ্ধিভিত্তিকতা নেই যে, সংশয়ের বীজ প্রতিষ্ঠিত করবে। আর এই পদ্ধতিতে শয়তানে কুমন্ত্রণায় আবদ্ধ সংবেদনশীল সরলমনা লোকটি মনে করছে যে সে ঈমানের মৌলিক ভিত্তির দৃঢ়তা সে হারিয়ে বা নষ্ট করে ফেলেছে। যেমন- নবী কারীম স: সম্পর্কে মানুষ হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য ধারণা মনে উদ্রেক হয় যে, যা ঈমানের ভিত্তিতে ও বিশ্বাসে কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু **ঐ লোকটি ক্ষতি হয়েছে মনে করাতে ক্ষতিতে পতিত হয়**।

একইভাবে মাঝে মধ্যে শয়তান, অন্তরের ভেসে থাকা অংশে যে ওয়াদা দেয় সেই দৃষ্টিতে বা অংশে আল্লাহ সম্পর্কে বেশ অনাকাংক্ষীত কথাবার্তার উদ্রেগ ঘটায়। তখন ঐ লোক ধারণা করে যে, তার অন্তর নষ্ট হয়ে গেছে যে, এই জন্যে এমনটি ভাবছে। সে কাঁপছে। অথচ তার উদ্রেগীত কম্পন ও ভয় এবং সন্তুষ্টির অস্তিত্বহীনতা এমন প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য যে, ঐ উদ্ভট কথাবার্তা মূলত তার অন্তর থেকে আসছে না বরং শয়তানের প্রদত্ত ওয়াছ ওয়াছা থেকে আসছে। অথবা শয়তানের পক্ষ থেকে তার কল্পনাতে এবং স্মৃতিতে ঢালা হচ্ছে। একইভাবে, **মানুষের অনুভূতিতে এমন দুই-একটি কল্পনা-শক্তি রয়েছে যে, যা আমি নির্দারণ করতে পারি নাই**। এগুলো এমন যে, এগুলো ইচ্ছা ও মনোভাবকে অনুসরণ করে না অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণহীন। এমনকি এগুলো এতই ধারালো যে দায়বদ্ধতায় ও প্রবেশ করে না। মাঝে মাঝে এগুলো মানুষকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে তার মত করে আদেশ কর্ম চালায়। হক্বকে শ্রবণ করে না। ভূল পথে, বস্তুতে প্রবেশ করে। ঠিক তখনই শয়তান ঐ লোকটিকে প্ররোচণা দেয় যে, তোমার শক্তি, যোগ্যতা যা ঈমান ও হক্বের ক্ষেত্রে উপযোগী নয় যে, এই জন্যে তুমি এমন অনিচ্ছাকৃত বাতিল ব্যাপারগুলোতে প্রবেশ করছ। অর্থাৎ তোমার নিয়তিই, তোমাকে এই আপত্তিকর অভিযোগে আবদ্ধ করে রেখেছে। তখন ঐ বেচারা হতাশায় পতিত হয়ে অনিষ্টতায় যেতে থাকে।

যাই হোক, শয়তানের প্রথমকার কুমন্ত্রনাতে একজন ঈমানদারের আশ্রয়স্থল হল- মুহাক্কিক্বিনে কেরামের মূলনীতির বিবেচনায় সীমাসমূহকে নির্ধারণকারী ঈমানের হাক্বিক্বাত সমূহ ও কোরআনের হুকুম সমূহ। আর দ্বিতীয় প্ররোচনার ঔষধ হলো আশ্রয় প্রার্থনার সাথে ঐ প্ররোচনা সমূহকে গুরুত্বরোপ না করা কারণ এমন সবকিছুতে গুরুত্ব দিতে গেলে তা দৃষ্টির সম্মুখে আরো বেশী বড় হতে থাকে। তাই একজন মু'মীনের এমন আধ্যাত্মিক ক্ষত সমূহের জন্যে ঔষদ ও প্রতিষেদক হল সুন্নাতে সানিয়া (নবীজীর আদর্শ)। (লাম'আলার ৭৪)

হে কুমন্ত্রণায় অসুস্থ আক্রান্ত! তুমি কি জান কুমন্ত্রনা জিনিসটা কি? এটা একটা মুসিবত। মূল্যায়ন করলে ফুসে উঠে, আর যদি গুরূত্ব না দেও তাহলে বিলীন হয়ে যায়। তার প্রতি বড় দৃষ্টিপাতে থাকালে বড় হতে থাকে, যদি ছোট আকারে থাকাও ছোট হতে থাকে, যদি ভয় পাও তাহলে ভারী হতে থাকে, অসুস্থ করে ফেলে। যদি ভয় না কর তখন পাতলা হতে থাকে, চলে যায়। তার মূল্যায়ন যদি না জান তাহলে চলতে থাকে, স্থান করে ফেলে। যদি তার তাৎপর্য সম্পর্কে জান তাহলে তাকে চিনতে পারার ধরূন, সে পলায়ন করে। আর যেহেতু এই রকম, তাই মুসিবতমুখী ওয়াছ-ওয়াছার অনেক প্রকারাবলী থেকে বেশী সংঘটিত হওয়া শুধু পাঁচটি কারণ বর্ণনা করব। অবশ্যই তোমাকে ও আমাকে শিক্ষা প্রদান করবে। যদি ও এই কুমন্ত্রণা এমন এক বস্তু যে, মুর্খ লোক তাহাকে আহ্বান করে, জ্ঞান (ইলিম) তাহাকে প্রক্ষিপ্ত করে। যদি না জান সে আসে, যদি তাকে চিনতে পার তাহলে পলায়ন করে।

প্রথম কারণ ঃ শয়তান সর্ব প্রথম সন্দেহ কলবের মধ্যে সৃষ্টি করে। যদি অন্তর এটাকে গ্রহণ না করে তখন সন্দেহ থেকে ভর্ৎসনায় ফিরে। কল্পনার ঠিক বিপরীত তিরস্কার মিলে অধিকাংশ মন্দ বাক্যাদী ও আদরের বিপরীত নিকৃষ্ট অবস্থাসমূহকে আকৃতি প্রদান করে এই তিরস্কার। অন্তরে বাহ্ এভাবে বলায়, হতাশায় নিমজ্জিত করায়। কুমন্ত্রীত ব্যক্তি ধারণা করে যে, অন্তর আল্লাহর সম্মুখে মন্দ ব্যবহারে বিদ্যমান। আবশ্যিক এক অপদস্থ ও অশান্তি অনুভব করে। এর থেকে রক্ষা পেতে শান্তি থেকে পলায় করত; গাফলতে প্রবিষ্ট হতে চায়। এই ক্ষতের ঔষধ হল এই যে,

দ্বিতীয় কারণ হল এই যে :- উদ্দেশ্যাবলী অন্তর থেকে বের হওয়ার সময়, আকৃতাবলী থেকে উদলা অবস্থায় কল্পনায় প্রবেশ করে। যা ওখান থেকে কাপড়মুখী আকৃতিসমূহকে পরিধান করে। যদি কল্পনার পরিদান হয় তাহলে সব সময় এক কারনের নিচে এক প্রকার আকৃতিসমূহ বয়ন করে ফেলে। গুরূত্ব প্রদানকৃত বস্তুর ডিজাইন বা আকৃতি সমূহকে অন্তর থেকে কল্পনায় আসার রাস্তায় ছেড়ে দেয়। এখন অন্তর থেকে সেই সকল উদ্দেশ্য অতিক্রান্ত হোক না কেন; ঐ রাস্তায় হয় তাহাকে পরিধান করাবে নতুবা, সেটে দেয়, বা অঙ্গে লেপন করে, অথবা কোন পর্দা তৈরী করে। যদি অন্তরের উদ্দেশ্যাবলী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, কিন্তু কল্পনার মধ্যে তৈরীকৃত আকৃতি সমূহ অপরিচ্ছন্ন ও নিম্নমুখী হয় তাহলে তুলনাকৃত অন্তর থেকে আকৃতিকৃত ঐ কাপড়ের মিল না পাওয়ায় পরিধান হবে না। কেবল আকৃতির তৈরীর ধারনাটা বিদ্যমান। এখন কুমন্ত্রীত ব্যক্তি, কল্পনার আকৃতিকে কাপড়ের সাথে মিশ্রিত করে ফেলে, পরিধান করছে মনে করে। এক পর্যায়ে আহ! বলে। আমার অন্তর কি পরিমাণ নষ্ট হয়ে গেছে। এই অপরিচ্ছন্নতা, এই নফসের অনুভূতি আমাকে বহিস্কৃত করছে" শয়তান এই শিরা ধমনী থেকে খুবই খুশি হয়। তাই এই জাতীয় সমস্যাময়ী কুমন্ত্রনার ঔষধ হল এই যে,

তৃতীয় কারণ হল এই যে, বস্তুর মধ্যে, অনেক লুকানো সরল যোগসূত্র পাওয়া যায়। অথচ মোটেও আশা করনি এমন বস্তু সমূহের মধ্যে প্রসঙ্গের রেখা পাওয়া যায়। হয়তো সরাসরি পাওয়া যাবে নতুবা তোমার কল্পনার মধ্যে ঘটিত হওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে ঐ রেখারশ্মি হয়েছে। এগুলো একটি অপরটির সাথে মিশ্রিত বন্ধিত করে।

এই রহসম্যয় সম্পর্ক থেকে যে কখনও পবিত্র বস্তুকে দেখা এক নিকৃষ্ট বস্তু স্মৃতিতে আসে। বিশ্লেষণ শাস্ত্রে বর্ণনা হওয়ার ন্যায় বাহিরে দূরত্বময় কারণ হওয়া বিপরীত যদি হয় কল্পনায় নৈকট্যতার কারণ বিবেচিত সর্বদা। অর্থাৎ দুটি বিপরীত মুখী ছবি সমূহের একত্রের মাধ্যমে এক কল্পনাময় সঙ্গতি হয়। এই সঙ্গতিতে আসা দোল ধ্যান চিন্তাবলীর সমতুল্যকে ডাকার দ্বারা তাবীর (ব্যখ্যা) করা হয়। যথা- তুমি নামাযে মোনাজাতের মধ্যে কিবলামুখী কাবার সম্মুখে আল্লাহর উপস্থিতে আয়াতের ধ্যানে মগ্ন হওয়াতে এই ফিকিরের ফিকির কে ডেকে তোমাকে রেখে সর্বোচ্চ দূরে অহেতুক বিষয়ে মনোব্যপ্ত করে। তোমার মাথা এমন এক ফিকিরের ফিকির ডাকার মধ্যে ব্যস্থ যদি হয় তাহলে তুমি শান্ত হও নিরাশ হইও না। বরং সচেতন হওয়ার বেলায় ফিরে যাও। "আহ কি ভূলটা যে করলাম এভাবে বলে এর সুক্ষতায় ব্যস্থ হয়ে ওখানে দাড়াইও না। যাতে করে ঐ দুর্বল সম্পর্ক তোমার বুঝে নেওয়া থেকে যেন শক্তিশালী না হয়। যদি ও দুঃখ প্রবণতা আমরা প্রদর্শন করেছি মূল্যায়ন করেছি তবে তোমার ঐ দূর্বল দোদুল্যমানতা যোগ্যতায় ফিরবে। একটি কাল্পনীক রোগ হবে। ভয় পেয় না, অন্তরের রোগ নহে। এই প্রকার আন্দোলনী দোল যদি হয় বেশির ভাগই অনিচ্ছাকৃত হয়। বিশেষ ও সংবেদনশীল প্রান্তেও বিদ্যমান। শয়তানের কাছে এই প্রকার ওয়াছ-ওয়াছার খনী খুব বেশী থাকে।

চতুর্থ কারণঃ কর্মের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে অনুসন্ধান থেকে বের হওয়া ওয়াছ-ওয়াছা। যা তাক্বওয়ার অবস্থা, ধারণার দ্বারা জটিল করার ধরূন এটাকে জটিলতর করে। এমনকি একটি স্থরে গিয়ে পৌছে যে, ঐ ব্যক্তি আমলের আরও ভাল কিছু করার জন্যে হারাম কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে সুন্নাতের গুরূত্বারোপ করত ওয়াজিব আদায় করে না। আসলে আমার কাজ কি শুদ্ধ হয়েছে? এমনটি বলে, মুখ ফিরিয়ে নেয় | এই অবস্থা চলতে থাকে। অতিমাত্রায় হতাশায় পড়ে। আর ঐ দিকে শয়তান এই জাতীয় অবস্থার তৈরী করে ফায়দা হাসিল করে। ব্যক্তিকে ক্ষত করে।

পঞ্চম কারণঃ- ঈমানের মাস'আলা সমূহে সন্দেহের রূপের আগত এক ওয়াছ-ওয়াছা। নিরূপায় এই কুমন্ত্রীত ব্যক্তি মাঝে মাঝে কল্পনাকে জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে তুলনা করত মিশ্রিত করে ফেলে। অর্থাৎ তার কল্পনায় আগত কোন সন্দেহকে জ্ঞান বুদ্ধির মধ্যে প্রবিষ্ঠকৃত এমন এক সংশয়ে ধারণা করত: তার বিশ্বাসের মধ্যে ফাটল এসেছে মনে করে। এমন কি কখন ও সন্দেহকৃত সংশয়কে তার ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্থকারী হিসেবে অনুমান করে। এবং মাঝে মধ্যে নিজে নিজে নকশাকৃত কোন পরিকল্পনাকে স্বীয় আক্বল এটাকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে মনে করে। আবার এমনও আছে কোন কুফুরীমূলক বিষয়কে ধ্যান চিন্তায় আনয়ন কে কুফুরি মনে করে। অর্থাৎ প্রতারণার মাধ্যমসমূহকে বুঝার দৃষ্টিতে ধ্যান চিন্তার ক্ষমতার প্রদক্ষিণকে ও গবেষণাকে মধ্যমপন্থীর বিবেচনাকে ঈমানের বিপরীত মনে করে। এখন যদি বল যে, এই পরিমাণ মু'মীনদের যন্ত্রনাদান করি। বিরক্তকারী ওয়াছ-ওয়াছা কি কৌশলের ভিত্তিতে আমাদের উপর এক অভিশাপমুখী বিপদ হয়ে আছে? উত্তর= সীমা অতিক্রম না করার এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর না করার শর্তে, মূল কুমন্ত্রনা (ওয়াছ-ওয়াছা) সচেতনতার কারণ সুলভ। গবেষনার প্রতি আহ্বান সুলভ। গুরূত্বতার মাধ্যম স্বরূপ। অপ্রয়োজনীয়তাকে তরক করায়, গুরূত্ব না দেওয়াকে প্রতিহত করে।

এই জন্যে সর্বজ্ঞ হাকিম এই ইমতেহানের স্থলে এই প্রতিযোগিতার ময়দানে আমাদের এক উদ্দীপীত করণ কষাঘাত হিসেবে, শয়তানের কুমন্ত্রণার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। মানবের মাথায় টুকরাচ্ছে। যদি শয়তান বেশী যন্ত্রনা করে তাহলে তখন হাকিমে রাহিম আল্লাহর হাওলা করা জরূরী। اعوذ با الله من الشيطان الرجيم এমনটি বলা আবশ্যক। (সোজলার ২৭৪)

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল)। হে আমার কুমন্ত্রনার অনিষ্টতায় হতাসাগ্রস্থ নফস! খেয়াল খুশির রুচি-বোধ, বোধশক্তিতে আগত অদেখা বিশ্বাসের কল্পনা সমূহ, এগুলো এক প্রকার অনিচ্ছাকৃত ছবি স্বরূপ। আর যদি এটা ছবির অংকন হয়, যদি উত্তম কর্ম বা নুরানিয়াত থেকে হয়, তাহলে হাকিকাতের বা বাস্তবতার এক স্থরের আকৃতিতে বা তুলনার সাথে মানা যায়। যেমন সূর্যের আলো বা তার কিরণ, যা আয়নার মাঝে দেখলে বা ব্যাবহার করার পরে পাওয়া যায়, , , আবার এই কল্পনা যদি উত্তম থেকে নয় মন্দ বা তীব্রতা থেকে হয়, তাহলে এটা আসল হুকুমে বা বাস্থবতার বিশেষায়নে রুপ নেবে না এবং তার তুলনা ও কিছুর সাথে পাওয়া যাবে না। যেমন নাপাক, কলুষিত কোন বস্তুর আয়নার মাঝে দেখলে এটা না নোংরা কিছু না অপবিত্রতাকে বাস্থবে আছে প্রমান করে। এমনকি আয়নাতে সাপের ধ্বংসন দেখতে পেলে যেমন এটা বাস্থব ধ্বংসন নহে। সুতরাং, নিয়ম অনুযায়ী, মন্দ বিষয় হওয়া কুফুরির কল্পনা, কুফুরি হয়েছে বলে প্রমান করে না; একই ভাবে গালি, তিরস্কারের ছিন্তা বা কল্পনা ও বাস্থবে গালি নহে। বিশেষ করে এমন কল্পনা যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে হয় বা ধরে নেওয়া হয় এমন কল্পনা, তাহলে এগুলো সবকটি-ই কোন ক্ষতির ক্ষমতা রাখে না। পাশাপাশি আহলে হোক ও তাদের সুত্র আহলে সুন্নাত অয়াল জাম'আতের উসুল হল কোন বস্তুর শরীয়ত সম্মত বিছ্রিতা, নোংরা, ময়লার; সম্পর্ক হল আল্লাহ্‌র আইনের না করার নির্দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যেহেতু এমনটি কল্পনা অনিচ্ছাকেইত ও ধরে নেওয়া কৃত একটি ব্যাপার, একটি খেয়াল মুখী কল্পনার রুচির প্রথম ধাপ; যা নিশেদের সাথে তার কোন সম্পর্ক বাধে না, রাখেনা। সুতরাং সে যতই নোংরা বা নিকৃষ্ট কল্পনা বা কুমন্ত্রনা হয় না কেন এটা ময়লা বা নোংরা হিসেবে বিবেচিত হবে না। (গুনাহের হিসাবে সাব্যস্থ হওয়ার ৪ টি স্থর খতর, হাজয, হাম, আ'যম এর সারকথা এটা। অনুবাদক।) (মাক্তুবাত ৩৯)

যেনে রেখো হে প্রিয়! মানুষ কলব ও ফিকিরের দ্বারা এলাহির হাকিকাত সমুহকে যখন চিন্তা করে, বিশেষ করে নামায ও ইবাদাতের ব্যাপারে, তাহলে নফসের পক্ষ থেকে হতে পারে বা শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে এমন নোংরা, নিকৃষ্ট, কুমন্ত্রনা, মন্দ কল্পনা, মাছির ন্যায় অন্তরে জ্ঞানের মধ্যে আক্রমন করাটা স্বাভাবিক। এই জাতীয় কাল্পনিক ও সন্দেহপ্রবন এবং নোংরা বিষয়াদির সাথে সংক্রমিত সংগ্রাম কারী ব্যাক্তি, বড় আক্রমন কুমন্ত্রনাকে ধ্বংস করে বিজয়ী হবে। এমনটি করে একবার বিজয়ী হয়ে এর ধারাবাহিকতা ছেড়ে দেওয়ার মানে হল এই প্রচেষ্টাকে ছেড়ে দেওয়া। সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ইহা জানা কথা, কেউ যদি মৌমাছির সাথে কোন ব্যাবহার করে তার মানে হল তাদেরকে উত্তেজিত করা, তাদের তীব্র আক্রমনের জন্যে অপেক্ষা করা। আবার যদি তাদের সাথে খারাপ ব্যাবহার করা না হয় তখন তারা মানুষকে ছেড়ে দেয়, চলে যায়। একই ভাবে কুমন্ত্রনা সমূহের, না এলাহির হাকিকাতের প্রতি না তুমার কলবের প্রতি কোন ক্ষতি করার শক্তি সমূহ রয়েছে। যেমন নোংরা কোন রুমালে ময়লাযুক্ত স্থানসমূহ যদি আকাশের সূর্যের দিকে বা নক্ষত্র সমূহের দিকে থাকায়, অথবা জান্নাতের কোন গোলাপের বা ফুলের দিকে থাকায় তাহলে নোংরা ময়লা ; না যার দিকে থাকাবে, না যে থাকানোর ব্যাবস্থা করবে তার ধারে কছে ও পৌছাতে পারবে না। এবং তার কোন প্রভাব ও বিস্তার করতে পারবে না। (ব্যাখ্যাঃ) ঐ নোংরা কথাবার্তা আসলে তোমার কলবের কথাবার্তা নহে। কারণ তোমার কলব তার দ্বারা প্রভাবিত ও ভারাক্রান্ত। বরং এগুলো কলবের পাশে থাকা শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে আসছে। যেমন- তুমি কা'বার সম্মুখে নামাযে দাড়িয়ে আছো, এলাহির সম্মুখে একটি আয়াতের তাফাক্কুর করার অবস্থায়, এই জাতীয় মন্দ মুখী কল্পনা তুমায় তার হাতে নিয়ে সুদূর অপ্রয়োজনীয় স্থলে নিক্ষেপ করে। এটা সমস্যা নহে গুরুত্ত দিলে সমস্যা হবে। যেমন- আয়নার ভিতরকার সাপের ধবংসন আয়নার বাহিরে না হওয়াতে এ টার কোন প্রভাব পড়ে না। আয়নাতে যদি আগুন দেখা হয় এটা জ্বালায় না। নাজাসাতের প্রতি শুধু থাকালে আয়নার মত এটা ও আপনাকে অপবিত্র করে না। স্পর্শ করলে তার প্রভাব শুরু হয়। (মাস্নাবিয়ে নুরিয়া ৯৬)

আমার জীবনের ফিকির-আফকারের নবাগত অভিজ্ঞতা হল এই যে, হতাশা, হল চুড়ান্ত পর্যায়ের এমন একটি আগ্রাসী রোগ যে, যা ইসলামের অনুসারীদের জগতেও প্রবেশ করে ফেলেছে। অতএব, এটা এমন এক হতাশা যে যেন সে আমাদেরকে হত্যা করার ন্যায়, সে পূর্বে ১—২ মিলিয়নের বসবাসি ছোট এক রাষ্ট্র, পশ্চিমে ২০ মিলিয়ন মুসলমানদেরকে যারা নিজেদের খাদিম, রক্ষাকারী এবং যেন রাষ্ট্র সমূহের মালিকানাগিরি করার পথে ব্যাস্থ রাখার অবস্থা এই হতাশা আমাদেরকে গিফট দিয়েছে। এই হতাশা এমন এক দাজ্জাল যে সে আমাদের সমুন্নত, উত্তম, উৎকৃষ্টময় আখলাক চরিত্রকে হত্যা করে দিয়েছে, সে আমাদের সার্বজনীন লাভ-লোকসানকে ভুলিয়ে দিয়ে, ব্যাক্তি ক্ষেন্দ্রিক স্বার্থপরতাকে শিখিয়ে দিয়েছে। হতাশা ঐ দুষ্কৃতি যে সে আমাদের আধ্যাত্মিক সক্তিকে চুড়মার, ভেঙ্গে দিয়েছে। যেখানে অল্প এক ঈমানি আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা পূর্ব থেকে পশ্চিমে আমরা বিস্তৃত ছিলাম; সেখানে ঐ আধ্যাত্মিক ঈমানি ক্ষমতা বিস্ময়কর ভাবে ভেঙ্গে পড়ার কারনে জালিম বিদেশিরা চার শত বছর যাবত তিন শত মিলিয়ন মুসলমানদেরকে এই হতাশার সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের হাতের খেলনা বানিয়েছে। এমনকি আমাদের ভাইদের অবস্থা এই যে, এই হতাশার দ্বারা অন্যদের উদরামনামিতাকে, শিথিলতাকে, সংশ্লিষ্টতাকে, মন্দ আচরনকে স্বীয় অলসতার উজর হিসেবে বিবেচনা করে বলছে যে " আমার কি আসে যায়" "সবাইতু দেখছি আমার মতো বরবাদ, চরিত্রহীন হয়ে গেছে" এভাবে বলে বলে ঈমানের সংগ্রামি সৈনিকতার চেতনাকে ছিঁড়ে দিয়ে ইসলামের খেদমত ও করছে না। যেহেতু এই পরিমাণ ধ্বংসাত্মক এই রোগ আমাদের এত এত জুলুম করেছে, ক্ষতি করেছে, আমাদেরকে সে দিনদুপুরে হত্যা করছে; তাহলে আমরাও এই কাতিলকে (হত্যাকারীকে) কেসাস স্বরূপ তাকেও হত্যা করব।

" লা তাকনাতু মিন রাহমাতিল্লাহ " (আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হইওনা) এই অস্ত্রের ব্যাবহার করে তাহাকে টুকরা টুকরা করব। " মা লা ইউদ্রাকু কুল্লুহু লা ইউত্রাকু কুল্লুহু" উক্ত হাদিসের মাধ্যমে আমরা আমাদের কোমরকে শক্তিশালী করব ইনশা আল্লাহ্‌। হতাশা হল উম্মতের ও মিল্লাতের "সারাতান" ক্যেন্সার নামী রুগের ন্যায় একটি যন্ত্রাদায়ক, আগ্রাসী রোগ। এবং হতাশাগ্রস্থ লোক পূর্ণ মানুষ হওয়ার ও "আনা ইন্দা হুন্নে যাননি আব্দি বি" (আমি বান্দা যেভাবে চিন্তা করে ঐ ভাবে তার সাথে আচরন করি) আলোচ্য হাদিসে কুদসির শিক্ষার তাম বিপরীত; ভীতুতা, নীচ ও অক্ষম মানুষের শান, উন্নীত মানুষের শান নহে এটা। দ্বীনের গৌরবময় ঈমান দীপ্ত মুজাহিদদের এটা কক্ষনও শান হতে পারে না। যেমন আরব দেশের মানুসদের ন্যায় যারা মানব জাতির গৌরবের তাজ যারা সমুন্নত ইতিহাসের বাহক তাদের মাঝে এই হতাশা থাকা মোটেই মানায় না। আহ, ইসলামের জাতী ও রাষ্ট্র সমূহ আরব দেশ সমূহের সাহসিকতা থেকে শিক্ষা নিয়েছিল। ইনশা আল্লাহ্‌ আরবিরা আবার তাদের এই হতাশা নামী ক্যেন্সারকে ছেড়ে দিয়ে ইসলামের দুঃসাহসী সৈন্য হওয়া তুরকিসদের সাথে একান্ত পরস্পর শক্তি যোগানোর, সাহায্য করনের মাধ্যমে ঐক্যতার মশাল তুলে ধরে হাতে হাত রেখে কোরআনের ঝান্ডাকে দুনিয়ার সকল দিকে তারা বিস্তৃত করবে। (খুতবায়ে শামিয়া ৪৪)

যৌবন

হে এই দেশের যুবকেরা! পশ্চিমাদের (ইউরোপিয়ানদের) অনুসরণে আপনারা ব্যাস্থ হবেন না!, , , এটা কীভাবে সম্ভব, এই ইউরোপের পক্ষ থেকে আপনাদের উপর কৃত এত সীমাহীন জুলুম ও ঈর্ষা ও দুশমনি করার পর ও, কোন জ্ঞানে আপনারা তাদের অশ্লীলতার এবং অবৈধ চিন্তা ফিকিরের অনুসরণ করে নিজেকে নিরাপদ মনে করচ্ছেন ? না! না! নোংরামিতে অনুসরণ কারীরা, আসলে অনুকরণ নহে, বরং অচেতন ভাবে তাদের জাহাজে আরোহণ করে আসলে আপনারা নিজেদেরকে ও নিজেদের ভাইদেরকে নিজ হাতে হত্যা করচ্ছেন। উদ্যত, সক্রিয়, প্রচন্ড সচেন হওয়া জরুরী! আপনারা যদি অনিষ্ট, চরিত্রহীনতায় এভাবে ইউরোপের অনুসরণ করেন, তাহলে স্বীয় ভাইদের অধিকারের সাথে

মিত্যাচার, ধোঁকাবাজি করছেন!, , , কেননা এই ভাবে আপনাদের অনুসরণ, আপনাদের জাতির সম্মুখে তাদের বিপরীতে আপনারা তাদেরকে পরিষ্কার ভাবে অবহেলা ও নীচতার দৃষ্টিতে মনে করছেন প্রমান হবে, স্বীয় জাতির সাথে তামাশা, হঠকারীতা করছেন স্পষ্ট হবে! " হাদানাল্লাহ অয়া ইয়্যাকুম ইলা সিরাতিল মুস্তাকিম" । (লাম'আলার ১২০)

অনেক যুবকরা অসুস্থতার দৃষ্টিকোনে আমার সাথে দোয়ার জন্যে তারা সাক্ষাৎ করেছে। উপলব্ধি করলাম যে, যে অসুস্থ যুবককে দেখলাম সে অন্য যুবকদের তুলনায় পরকালকে চিন্তা করতে শুরু করছে। যৌবনের পাগলামী তার মধ্যে নেই। উদাসীনতার মধ্য থেকে, জন্তুদারী জৈবিক চাহিদা থেকে এক স্থরে নিজেকে হেফাজত করছে। আমি ও দেখছিলাম যে, তাহাদের বহনসীমার অসুস্থতাকে জানাতাম যে, এই অসুস্থতা একটি এইসানে-এলাহি। আমি বলতাম যে, আমার ভাই, আমি তোমার এই রোগাক্রান্ততার পক্ষে নহে। অসুস্থতার কারণে তোমার বিপরীত এক সহানুভূতিশীলতা অনুভূব করতঃ আমি কষ্ট পাচ্ছি না ফলে দোয়া করি। তবে দোয়া করি এই রোগ তোমাকে যেন পূর্ণভাবে সচেতন করা পর্যন্ত চলতে থাকুক তুমি ধৈর্য ধারণ কর, এবং অসুস্থতার অবস্থান শেষ হওয়ার পর খালিকে-রাহিম ইনশা-আল্লাহ তোমায় সুস্থতা দান করবেন। এমনকি বলতাম যে, তোমার ন্যায় এক প্রকার যুবকরা সুস্থতার মসিবতের মাধ্যমে গাফলতে পতিত হয়ে, নামাযকে ছেড়ে দিয়ে, কবরকে চিন্তা না করে, আল্লাহকে ভূলে গিয়ে, এই দুনিয়ার এক ঘন্টার জীবনকে বাহিক্য মনোবাসনার মধ্যে ন্যাস্থ রেখে চিরস্থায়ী আখেরাতের হায়াতকে ক্ষতিগ্রস্থে কুঠারাঘাত করে এমনকি ধ্বংস করে ফেলে। তুমি অসুস্থতার চক্ষু দিয়ে, যেভাবেই হোক এমন এক মনযিল হওয়া কবরকে এবং তার আরও দূরে অবস্থিত আখেরাতের অনেক মনযিল সমূহকে তুমি দেখতে পাবে। এবং এগুলোর বিবেচনায় তুমি কর্মব্যস্থ আচরণ দেখাচ্ছ। অর্থাৎ যুবকদের এক প্রকার সুস্থতাই এক অসুস্থতা ছাড়া অন্য কিছু নহে।(লাম'আলার ২০৭)

কবির কথায় বলছি যে, অর্থাৎ- "আহ যদি আমার যৌবন আবার ফিরে আসতো, বয়স্কতার চাপ আমার জীবনে কি পরিমানের দুশ্চিন্তার অবস্থা নিয়ে এসেছে, আমার যৌবনকে যদি পাইতাম তাহাকে সব কিছু বলতাম" (আবি আতাহিয়া)। জী, এই মনোভাব প্রকাশকারী ব্যাক্তি যে যৌবনের গুরুত্ত বুঝে নাই, এখন যৌবন কালকে সব সময় মনে করছে, দুঃখ, ভারাক্রান্ত হয়ে ভুলতে পারছে না, , , অথচ যৌবন কালকে, যদি কলব নিয়ে যারা চিন্তা করেন, শান্তির অন্বেষণে যারা ব্যাস্থ, যারা পূর্ব সচেতন এবং যদি এই কলবের স্বত্বা লোকটি একজন মু'মিন হয়, আর সে এটাকে ইবাদাতে ও উত্তম কর্মে এবং পরকালীন ব্যাবসায় খরচ করে; তাহলে নিঃসন্দেহে এটা হবে সর্ব উচ্চ মানের শক্তিশালী এক বানিজ্যের মাধ্যম; এবং মার্জিত ও মনোহর এক পরকালিন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সফলতার উপায়। এবং ঐ যৌবন কাল, যা দ্বীনের দায়িত্তকে চিনতে পেরে তাহাকে মন্দ পথে যারা ব্যাবহার করবে না তাদেরকে; মহামুল্যবান, সুস্বাদুময় এক এলাহির নেয়ামতের মালিক বানাবে ও ইনায়েতে এলাহি হবে। আবার এই যৌবন কাল যদি ইস্তেকামাত, ইফফেত, তাকওয়ার পথে না হয়; তাহলে তার কপালে অনেক বিভীষিকাময় বিপদ সামনে রয়েছে। সীমাহীন উচ্ছাসিত প্লাবনের সাথে, চিরস্থায়ী জিন্দেগীকে ও পরকালিন জীবনকে ধুলিস্যাত করে দিবে। একই সাথে দুনিয়ার জীবনকে ও বরবাদ করে ফেলবে। এমন হতে পারে এক দুই বছরের যৌবনের উস্কানিতে চলার কারনে বার্ধক্য কালে বছরের পর বছর দুশ্চিন্তা আর কষ্টের মুখপেক্ষি হবে। যেহেতু বেশির ভাগ মানুষের যৌবন কাল ভয়ানক ভরাডুবিতে নিমজ্জিত হয়, , , তাই আমরা যারা বার্ধক্যে পতিত হয়েছি অবশ্যই আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা একান্ত জরুরী যে, এই লক্ষে যে আমরা এই যৌবনের দুষ্কৃতি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পেরেছি, সচেতন থেকেছি। সবকিছুর ন্যায় কোন সন্দেহ নেই যৌবনের স্বাদ ও চলে যাবে। যদি এই যৌবনকে সৎ কর্মে ও ইবাদাতে ব্যাবহার করা হয়; তাহলে ঐ যৌবন কালের ফল সমূহ তার স্থলে স্থায়ী থেকে, চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে এক মহা সুন্দর, চমৎকার যৌবন অর্জনের এটা মাধ্যম হবে। (লাম'আলার ২৩২)

এটা সত্য যে, যৌবনের দেহ সে যুবক কালে মোলায়েম, মাধুর্যময়, অতি সুন্দর এক গুলাপ ফুলের ন্যায় হয় আবার যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন সে শুকনা, ঘুমিয়ে পড়া শীত কালের ফুলের সাথে তুল্য হয় এবং ঐ ভাবেই রুপান্তরিত হয়ে যায়। তার মাঝে একটি হল জীবন ও প্রানবাহিতা, এটাও আবার বিদায় নেয় মৃত্যু ও বিলিনতার মাধ্যমে। আরেকটি মানবতা, এমনটি হলে এটা বিলীন ও চিরস্থায়ী এর মধ্যভাগে ফয়সালাহীন, দ্যুদুল্যমান অবস্থায় থাকে। সার্বক্ষণিক চিরস্থায়ী যিকিরের সাথে এটাকে হেফাজত করা জরুরী। আরেকটি হল জীবন যাপন কাল, এর ও একটি লিমিট নির্দিষ্ট আছে। না সামনে না পিছনে যেতে পারে। এই জন্যে কষ্ট পেওনা, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হইওনা। বহন ক্ষমতায় অক্ষম, এবং শক্তির বাহিরে হওয়ার ধরুন লম্বা কোন চাহিদার, স্বপ্নের প্রতি ভার বহনে আগ্রহী হইওনা।

আরেকটা হল দেহ, এটাতো এমনিতেই তুমার সম্পদ নহে। তার আসল মালিক জানা কথা তিনি হলেন মালিকুল-মুল্ক স্বত্বা। যিনি তুমার চেয়ে আরও বেশি এই দেহের প্রতি অনুগ্রহকারী। ফলশ্রুতিতে, যদি তুমি এই দেহকে তার আসল মালিকের সিমা-রেখার বাহিরে ব্যাবহার কর তাহলে এই দেহকে আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন করচ্ছ এটা পরিষ্কার। (এটা হল এমন যে নিরাশার মধ্যে লোভের আচরণের ন্যায়)। আরেকটি হল বালা-মুসিবত। এরা সবাই বিলীনময়ি, এদের সচলতা বেশী দিন থাকে না। তাদের বিলীনতায় যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে তার বিপরীত ব্যাপার গুলো তুমার ব্রেইনে আসবে, তুমাকে স্বাদ প্রদান করবে।

আরেকটি হল তুমি এই পৃথিবীতে মুসাফির হিসেবে আছো। এবং এখান থেকে তুমি অবশ্যই অন্য স্থানে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। কোন মুসাফির স্থায়ী বাসিন্দার সাথে এক সঙ্গে কোন কিছুতে অবদান না রাখার কারনে সে তার অন্তরে ঐ বস্তুকে গেতে রাখা অনুচিত। এই মেহমান হওয়া ঘর থেকে চলে যাওয়ার ন্যায়, এই শহর থেকে ও তুমি বের হতেই হবে। একই ভাবে এই ক্ষনস্থায়ি দুনিয়া থেকে ও তুমাকে বের হয়ে যেতে হবে। বিষয় যখন এরকম, সম্মানের সাথে বের হওয়ার প্রস্তুতি নাও। তুমার উজুদ নামী দেহকে মুজিদ নামী এলাহির কাছে কোরবানি দাও। এর প্রতিদান স্বরূপ অনেক বড় এক মুল্য তুমি পাবে। কারণ যদি তার নামে উৎসর্গ না করো তাহলে অনাকাংখ্যিত পথে বিনাশ হবে বিলীন হয়ে যাবে; নতুবা তার মাল হওয়ার ফলে আবার তার কাছে তার মাল ফিরবে। যদি স্বীয় দেহের উপর নির্ভর কর তাহলে ধবংসে পতিত হবে। কারণ এটা নিরেট সত্য যে দেহের হস্তান্তরের মাধ্যমে আবার দেহ পেতে পার। তথাপি, যদি তুমি এই দেহকে মুল্যায়ন করার মেহনতে থাক তাহলে এই দেহ থেকে তুমার বড়জোর একটি ছোট অংশ থাকতে পারে, দেহের কিন্তু সমস্থ অঙ্গ বিলিনতার নীয়ন্ত্রনে থেকে যাবে। আবার এই হাতে থাকা অংশ কে ও যদি তার কাছে ছেড়ে দাও তাহলে তুমার দেহ পূর্ণ নুরানি এক টুকরায় রুপ নেবে।

আরেকটি ব্যাপার হল, এই দুনিয়ার স্বাদ সমূহ। এগুলো তো কিসমতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এগুলোর অন্বেষণে কেবল কষ্ট আর কষ্টতে নিবন্দিত। এবং দ্রুত শেষ হওয়ার বিবেচনায় চক্ষুষ্মান ব্যাক্তি এগুলোকে তার অন্তরে আনে ঠিক, কিন্তু তাদেরকে গুরুত্ত দেয় না। এই দুনিয়ার ফলাফল যাই হোক না কেন, স্বাদ ও মজা কে ত্যাগ করা সর্ব উত্তম। কারন শেষ সমাধান হয় শান্তির হবে, যদি এমনটি হয় তাহলে এটা কিন্তু অস্থায়ী স্বাদ সমুহকে ত্যাগ করার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হবে। নতুবা সমাধান বিপদ মুখী হবে, যে লোকটি মৃত্যু বা ফাঁসির কাস্টে অপেক্ষিত, সে কি কফির টেবিল থেকে বা ঐ টেবিলের নিবিড় নীরবতার প্রেক্ষাপটের ন্যায় হাওয়া থেকে স্বাদ ও মজার অনুভুতি অর্জন করতে পারবে? (মাস্নাবিয়ে নুরিয়া ১১৯)

হাদিসের সারকথা এমন যে ~ সব চেয়ে উত্তম ঐ যুবক যে, বার্ধক্যের ন্যায় মৃত্যু কে চিন্তা করে, পরকালের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে, যৌবনের কামনা-বাসনায় প্রলুব্দ না হয়ে গাফলতের পর্দায় আবৃত হয় নাই ~ । এবং বয়স্কদের মাঝে ঐ লোকটি

সব চেয়ে নিকৃষ্ট যে, গাফলতে ও মনোবাসনায় যুবকদের মতো চলে; শিশু কিশোরের ন্যায় নফসের মনোরঞ্জনের অনুসারী হয়।

যদি বন্দু চাও তাহলে আল্লাহই যথেষ্ট। হা তিনি যদি বন্দু হয়ে যান তাহলে সব কিছুই তোমার বন্দু। যদি আগামি কালকে পেতে চাও তাহলে কোরআন যথেষ্ট। যদি সম্পদ চাও তাহলে অল্পতুষ্টিতাই যথেষ্ট। অল্পতুষ্টিকারী মিতব্যয়ী হয় পরে সে বরকত খুজে পায়। যদি দুশমন চাও তাহলে তোমার প্রবৃত্তির নফস যথেষ্ট। যদি পরামর্শ চাও তাহলে মৃত্যুই যথেষ্ট। (মাক্তুবাত ২৮২)

একবার কিছু যুবকরা বর্তমান এই যুগের ধোঁকাবাজ, চিত্তাকর্ষক, আনন্দ- ফুর্তি, কামনা-বাসনার আক্রমণাত্মক আগ্রাসী থাবা থেকে বাঁচার জন্যে ~আমাদের আখেরাতকে কীভাবে বাঁচাবো~ বলে রিসালে নূর থেকে সাহায্য চেয়েছিল আমি ও রিসালে নুরের একনীষ্ট আধ্যাত্মিক ক্ষমতার নামে তাদেরকে বলিলাম যে, কবর সত্যই আছে, কোন লোক নেই তার সত্যতাকে অস্বীকার করতে পারে। সবাইকে-ই ইচ্ছা হোক বা না হোক কবরের ভিতরে যেতেই হবে। আর ওখানে যাবার জন্যে তিন পন্থা বা তিনটি রাস্তা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

প্রথম রাস্তাঃ এই কবর হল ঈমান্দারদের জন্যে এই দুনিয়া থেকে আরও উন্নত, সুখী জগতে প্রবেশ করার একটি দরজা। দ্বিতীয় রাস্তাঃ যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করবে না বরং কেবল নোংরামি ও পথভ্রষ্টতার পথে চলতেই থাকবে, তাদের জন্যে এই কবর একটি চিরস্থায়ী এক জেলখানা স্বরূপ এবং সকল দোস্ত, প্রিয়দের থেকে একাকি এক বিপদজনক একাকিত্তের জেলখানার একা একা কষ্ট পাওয়ার একটি হাজতের দরজা ছাড়া অন্য কিছু নহে। এটা তার বিশ্বাস ও নাচনের দুরব্যাবহারের ফল স্বরূপ এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে সে বাদ্য থাকিবে। তৃতীয় রাস্তাঃ যারা আখেরাতকে সত্য বলে স্বীকার করে নাই তাদের জন্যে একটি চিরিস্থায়ি ফাঁসির কপাট স্বরূপ, , , অর্থাৎ যেমনটি নিজের জন্যে তেমনি একান্ত প্রিয়দের জন্যে ফাঁসি দেবার একটি ফাঁসি কাস্ট। যেভাবে খেল তামাশায় জীবনকে ব্যায় করেছে, হুবহুভাবে তার শাস্তি ভোগ করতেই হবে। এই দুটি পথ হল একেবারেই পরিষ্কার। যেগুলোর জন্যে প্রমান প্রয়োজন হয় না, এগুলো স্ব- চক্ষে দেখতে হয়। যেহেতু আজাল, মৃত্যুটা হল গোপন; যে কোন সময় এই মৃত্যু কপালে এসে ধাক্কা দিতে পারে, তার কাছে যুবক, বয়স্ক কোন পার্থক্য নেই। তাহলে নিঃসন্দেহে, সার্বক্ষণিক চুখের সামনে এমন এক বিশাল ভয়াবহ যমদূতের সম্মুখে থাকা এই বেচারা মানুষ; ঐ চরকালিন ফাঁসি, ও সীমাহীন দেয়ালহীন, একাকিত্তের জেলখানা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে এবং এই বরযখের দরজার এক চিরস্থায়ী জীবনের, এক চির সৌভাগ্যের পথে এবং নুরান্নিত থাকা একটি জগতের দরজা খোলার এক মাধ্যমের দ্বারা স্বীয় ক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে এটা সীমাহীন গুরুত্ত বহনকারী এক বিষয় এই মানুষের জন্যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। (সোজলার ১৪২)

যেমন এখানে আপনাদের সামনে একটি ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। তার পাশে একটি লটারির টিকেট বিক্রির অফিস আছে। আমরা এখানে দশজন মানুষ আছি, যেভাবে হোক ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক টিকেট কিনতে হবে, আমাদেরকে ওখানে দাওয়াত দেওয়া হবে। এবং দাওয়াতের সময়টাও গোপন থাকার কারনে সব সময় একটা আহ্বানের অন্তরে কাজ করে যে, " আসো ফাঁসির টিকেট নাও, এবং ফাঁসিতে নিজেকে লটকাও"! নতুবা আরেকটি টিকেট নাও যেটাতে রয়েছে " আসো তোমার নামে মিলিয়ন মিলিয়ন স্বর্ণের টুকরা প্রস্তুত টিকেট নাও এবং স্বর্ণের মালিক হউ' আসো" টিকেট নাও! এই দুই টিকেটের অপেক্ষায় অপেক্ষিত অবস্থায় দুইজন লোক দরজায় এসে দাঁড়াল। একজন অর্ধ উলঙ্গ সুন্দরের ধোঁকার মায়াজালে আবর্তিত এক মহিলা, বাহ্যিক দিকে দেখা যাচ্ছে তার হাতে রয়েছে অতি মিষ্টান্ন দ্রব্য, কিন্তু মৌলিক ভাবে এটা মিষ্টি নহে তার ভিতরে আছে বিষযুক্ত মধু সে ঐ মধু খাওয়াতে চাচ্ছে। অন্য লোকটি; ধোঁকাবাজ

নহে সে প্রবঞ্চনা বা ছলনা করবে না এমন এক ভাল লোক, ঐ মহিলার পিছনে প্রবেশ করে সে বলিল যে, আপনাদের জন্যে একটি রহস্যময়ি শিক্ষা নিয়ে এসেছি আপনাদেরকে জানাতে চাই। যদি এই রহস্যময়ি কাগজটা আপনারা পড়েন তাহলে ঐ বিষাক্ত মধু থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন এমন কি ঐ ফাঁসির কাস্ট থেকে ও মুক্তি পাবেন। আর আপনারা এই সুক্ষ রহস্যের দ্বারা স্বর্ণ সংক্রান্ত টিকেট কিনতে পারবেন। আর এমনিতেই তো আপনারা দেখতে পারচ্ছেন এই ফাঁসির কাস্টের টিকেটে কি ঘটতে যাচ্ছে, এই মধু যে খাবে না সে ঐ ফাঁসির টিকে কিনতে পারবে না, মধু খেলে এটাও স্পষ্ট জে ফাঁসিতে লটকানোর আগে সে বিষের ব্যেথায় ছটফট করতে হবে, আবার মধু খেলে বাহ্যিক ভাবে সবাই মনে করছে যে স্বর্ণের মালিক হবে। আবার দেখতে না পাওয়া এই মধুর প্রভাবে মিলিওন মানুষ মারা গিয়েছে। এটা প্রথমে দেখানো হয় না। মধু মিষ্টি তাই সবাই ঐ দিকে মোড় নিচ্ছে। এই জানালার দিকে থাকিয়ে দেখুন ওখানকার চাকরিজীবীরা জোরে জোরে আওয়াজ দিয়ে বলছে যে, ঐ মঞ্চে যারা যাচ্ছে স্ব-চক্ষে দেখার ন্যায় ফল ভোগ করবে, রহস্যের টিকেট গ্রহণ কারীদের ন্যায় আপনারা নহেন এভাবে বলে আওয়াজ দিচ্ছে কোন সন্দেহ নেই দ্বীনের আলোর মতো আপনাদের ফল হবে পরিষ্কার, এভাবে তারা বলে বলে আওয়াজ দিচ্ছে। সুতরাং এই উদাহারনের ন্যায় বিষাক্ত এক মধুর হুকুমে হওয়া এই অবৈধ স্থলের ফুর্তি আমোদ, অশ্লীলতার মজা, চিরস্থায়ী খাজিনার ও চির সৌভাগ্যের টিকেট নামীয় ও মাধ্যম হওয়া ঈমানকে হারানোর কারনে, মঞ্চ হওয়া মৃত্যু এবং চিরকালিন অন্ধকারের দরজা নামীয় হওয়া কবরের মুসীবত সমুহকে, হুবহু দেখতে পাওয়ার ন্যায় পতিত হবে এবং ডাক কখন আসবে এটা গোপন থাকার কারনে যুবক, বয়স্ক কোন পার্থক্য না করে মৃত্যুর জল্লাদ তোমার মাথাকে কাঁটার জন্যে আসবেই। এখন যদি এই নিশেদকৃত অবৈধ পথকে পরিহার করে, রহস্য নামী কোরআনের রহস্যকে গ্রহণ করার মাধ্যম ঈমান ও ফরজ সমুহকে সুন্দর ভাবে পালন করে উচ্চ মানের মানবিক ভাগ্যের লটারির টিকেট হাতে নিয়ে চিরস্থায়ী খাজিনা নামীয় টিকেটকে হাতে নাও, তাহলে এটা বৃথা ঝাবেনা এমন ভাবে যে, এক লক্ষ চব্বিস হাজার নবীগন ও তাদের সাথে বে-হিসাব আওলিয়া গনের সাক্ষির দ্বারা প্রমাণিত এবং তাদের সাথে সীমাহীন আহলে হাকিকাতের সাক্ষী দৃষ্টান্ত দিচ্ছে যে তুমি কোন ভুল কচ্ছ না, এমন অবস্থাকে ফুটিয়ে ভাসিয়ে তুলছে। মোটকথাঃ যৌবন কাল চলে যাবেই, এই যৌবন যদি অশ্লীলতায় সংঘবদ্য হয়ে থাকে, তাহলে যেমন দুনিয়াতে তেমনি আখেরাতে হাজার হাজার বালা- মুসীবত, যন্ত্রণার ফল সমুহ প্রদান করার হেতুতে, এমনকি এমন যুবকরা বেশীরভাগই তার সময়কে মন্দ পথে ব্যাবহার করছে, অপচয়ের সাথে আগত হীনমনুত্য, সন্দেহ প্রবন এমন অসংখ্য রোগ সমূহের ব্যাধির তরে, ও অহেতুক বোঝা বহনের কারনে জেলখানা সমূহে ভরপুর হয়ে, অথবা নোংরামির, অশ্লীলতার স্থান সমুকে ভর্তি করে, এবং আধ্যাত্মিক সমস্যাবলীর দ্বারা বিপদগ্রস্থতায় পতিত হওয়াটা যদি বুঝতে চাও; তাহলে হসপিটাল সমুহকে, জেলখানা সমুহকে, কবরস্থান গুলোকে গিয়ে দেখ জিজ্ঞেস কর। নিঃসন্দেহে প্রেক্ষাপটি ভাষায় বেশী অংশে হসপিটালে আগতদের ব্যাপারে ওখানকার দায়িত্তশীলরা জানেন যে এই রুগীদের সকলেই যৌবনের অনিষ্ট পাগলামির, এবং অপব্যাবহারের ফলাফল হিসেবে তারা এখানে এসেছে, এগুলো তারা ভাল করে জানেন। জী ভায়েরা যেভাবে বলিলাম ঠিক ঐভাবে; হসপিটালের শায়িত হওয়া এই যুবকদের অবৈধ জীবন চলনের কারনে, তাদের পাগলামির ভার অপ্রয়োজনে বহন করার নিরিখে এই বদবখতরা চড় খেয়ে আফসোস ও আক্ষেপের ভারি আওয়াজ দিচ্ছে শুনতে পাবেন। এমনকি কবরস্থানেও ওখানে যারা প্রবেশ করচ্ছে তাদের জন্যে সার্বক্ষণিক কবরের দরজাকে খুলে ও বন্দ করে বরযাখে অবস্থানরত আহলে কাশফের, অলিদের কবর সমুহকে দেখার সাথে এবং সমস্থ আহলে হাকিকাতের সত্যায়নের ও সাক্ষির দ্বারা বেশীর ভাগ আযাব সেখানে যুবকদের যৌবনের অবৈধ পথে ব্যাবহারের কারনে হওয়াটা দিবালকের ন্যায় স্পষ্ট ভাবে জানতে পারবেন। শুধু তাই নয় মানব জাতির অনেক বয়স্কের ভারে অসুস্থ হয়ে রুপ পরিবর্তন হওয়া বার্ধক্যদের ও তাদের অসুস্থদেরকে ও জিজ্ঞেস করতে পারেন। অবশ্যই বেশীর ভাগকেই পাবেন বিষন্ন, আফসোস কারী, রোগ সমূহের চলিত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তারা বলচ্ছে যে ~ আহ, আহ আমাদের যৌবন

কালকে বেহুদা, বরং ক্ষতিকর পথে হারিয়ে ফেলেছি, তারা বলবেন খবরদার আমাদের মতো যৌবনকে অপচয় করোনা~ । তার কারণ পাঁচ দশ বছরের যৌবনের মজা ভোগ করার জন্যে, এই দুনিয়াতেও বছরের পর বছর দুশ্চিন্তা আর কষ্ট এবং বরযাখে ও আযাব এমনকি সীমাহীন ক্ষতি ও পরকালে জাহান্নামে এবং বেহুদা বালা মুসীবতে অরোপিত ব্যাক্তি এত এত যন্ত্রনাকে ভোগ করার অবস্থায় ও ~ আররাজি বিযযারার লা ইউনযারু লাহু~ আলোচ্য কথার দৃষ্টিতে কভু ও মুক্তি পাবে না। কারণ বিপদে ইচ্ছে করে যে পড়ে তাহাকে রহম বা কৃপা করা হয় না এমনকি সে অনুগ্রহের যোগ্য ও নহে। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাদেরকে এই যামানার ভয়ানক ফিতনা সমূহ থেকে যেন রক্ষা করেন এবং আমাদের সকলকে হেফাজত করেন, আমিন। (সোজলার ১৪৬) ।

হটাৎ করে জানানো অতি তাৎপর্যময় এক বিষয়=আখিরী যামানায় ফিৎনায় সবচেয়ে ভয়ংকর ভূমিকা পালনকারী হচ্ছে মহিলা সমাজ যা হাদিসের পরিভাষা থেকেওপ্রমানীত। যেভাবে অতীতে "আমাযান" নামে অস্ত্রধারী মহিলাদের সমন্বয়ে গঠিত সৈনিকের দল তীব্র যুদ্ধ করেছে ঠিক সেই ভাবে এই সময়ে ইসলামিয়াতের বিরুদ্ধে দ্বীনহীন দালালতের যুদ্ধে নাফসে-আম্মারার পরিকল্পনা অনুযায়ী শয়তানের নির্দেশনার অধীনস্থ দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে অর্ধনগ্ন মহিলারা যারা উন্মুক্ত উরু নামক ছুরির দ্বারা আহলি ঈমানকে আক্রমণ করছে৷ (বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজে প্রেম্ ভালবাসা নামী অবৈধ ব্যাপার ও মেয়েদের খুলামেলা অবস্থান, নষ্টামির স্থল ইন্টারনেট, ফেইসবুক ইত্যাদি)। বিবাহ বা নিকাহের পথ বন্ধ ও যিনার পথ প্রশস্থ করে বহুবন্দু নামী নাফসকে একসঙ্গে বন্দী করে কাল্ব ও রূহসমূহকে কবীরাগুনাহর মাধ্যমে ক্ষতবিক্ষত করছে । ঐ ক্বালবসমূহের মধ্য থেকে কিছু কালবকে আবার হত্যা করছে। কয়েকবছর না-মাহরেম খায়েশেরখাবার হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার শাস্তি হিসাবে ঐ ছুরিওয়ালা উরুসমূহ জাহান্নামের খড়ি হয়ে সর্বাগ্রে ঐ উরুসমূহকেই জ্বালাবে এবং দুনিয়াতে নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলায় সৃষ্টিগত প্রচন্ড আকাংক্ষা ও প্রকৃতিগতভাবে খুব মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত এই যুবতী মেয়েরা ভাল তো দুরের কথা সাধারণ স্বামীও খুঁজে পাবে না। খুঁজে পেলেও তা তার জন্যে এক অর্থে মুসিবতের কারণ হয়ে দাড়াবে । এমনকি এই অবস্থার ফল হিসাবে আখিরী যামানায় কোন জায়গায় বিয়েে প্রতি অনীহা ও আনুগত্যহীনতার কারনে চল্লিশজন নারীকে একজন পুরুষ দেখপাল করবে যা মহিলাদেরকে গুরুত্বহীন্ অভিভাবকহীন, মূল্যহীন সৃষ্টিতে পরিণত করবে - হাদিসের ভাষা এরকমই। এই হচ্ছে বাস্তবতার রিপোর্ট। এবং প্রত্যেক সুন্দরী তার সৌন্দর্যকে ভালবাসে ও সর্বাত্মকভাবে তাকে সংরক্ষণ করতে চায় ও নষ্ট হতে দিতে চায়নাএটাই তাদের প্রকৃতি৷ সৌন্দর্য যেহেতু এক প্রকার নিয়ামত, নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে তা বৃদ্ধি পায়। শুকরিয়া আদায় না করলে তা পরিবর্তন হয়ে কুৎসিত হয়ে যায় । অবশ্যই আকল যদি থাকে তাহলে তার রূপ ও সৌন্দর্যকে গুনাহ করার ও গুনাহ করানোর অস্ত্র হতে দেবে না। তাকে কুৎসিত ও বিষাক্ত করা এবং ঐ নিয়ামত প্রদানকারীদেরকে অস্বীকার করার মাধ্যমে আযাবের উসিলা হওয়া থেকে সমস্ত শক্তি দিয়ে পলায়ন করবে। ঐ ক্ষণস্থায়ীপাঁচ দশ বছরের সৌন্দর্যকে চিরস্থায়ী রূপ দেয়ার জন্যে তাকে বৈধভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। অন্যথায় বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘ সময় ধরে অবহেলার্ ঘৃণার পাত্রে সম্মুখীণ হয়ে নিরাশভাবে ঝাড়া হবে, কাদবে। যদি তারবিয়া-ই ইসলামিয়ার পরিধির মাঝে অবস্থান করে আদাব-ই কুরআনীয়ারশোভা দিয়ে ঐ সৌন্দর্যকে সুশোভিত করা হয়, তাহলে ঐ ক্ষণস্থায়ী রুপ আধ্যাত্মিক অর্থে চিরস্থায়ী রুপ নিবে। এবং তাহাকে জান্নাতের মহা সুন্দর হুরিদের থেকেও সুন্দর আকৃতি দেয়া হবে এমনটি হাদিসে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এখন এই সুন্দর নারীদের যদি বিন্দু মাত্র জ্ঞান থেকে থাকে তাহলে এই উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী ফলকে হাত ছাড়া করতে চাইবে না। রেফঃ ঈমান ভে কুফুর মুয়াযেনেলার ২১৩।

আধুনিকতা

জেনে রাখো অশ্লীলতার আধুনিকতা এমন এক বিস্ময়কর কপটতা, লোক দেখানো যা বাজারে বিস্তৃত হয়ে আছে যে, আধুনিকরা এই মহা বিপদ থেকে বাঁচা মোটেও সম্ভব নয়। তার কারণ হল আধুনিক বাদীরা এই আত্মপ্রদর্শন নামী রিয়াকে শান ও মানের অহংকারের মায়াজালে এঁটে ফেলেছে। তারা এখন এক ব্যাক্তির লোক দেখানোর আত্মহংকারের বিপরীত, সাম্প্রদায়িকদের, জাতীয়তাবাদীদের, রাষ্ট্র সমূহের সামনাসামনি একে অপরকে আত্মহংকার দেখাতে থাকুক এমন অবস্থার প্রতি উৎসাহ দিচ্ছে এবং ইতিহাস তাদেরকে মনোহারি ও কৌতূহলোদ্দীপক এমনকি পত্রিকা ও, মিডিয়াও এমনটি করে করে মুগ্ধতায় নিজেদের ব্যাস্থ রেখেছে। তারা মানুষের মৃত্যুকে ভুলিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িকতায় এক মজার জীবন রয়েছে বলে বলে, জাহিলিয়াতের যুগের গাদ্দার জালিমদের সুক্ষ আক্রমনের প্রকার থেকে এক আত্মঘাতী থাবার সাথে মানব জাতীকে ছল-চাতুরীতে ও হাব-ভাব দেখিয়ে চলার (রিয়ার) তরে আকৃষ্ট করে দিয়েছে । (মাস্নাবিয়ে নুরিয়া ২৬৫)

উপস্থিত-পশ্চিমাদের-আধুনিকতা, মৌলিক আসমানি কানুনের বিপরীতে অবস্থান নেয়ার কারনে মন্দের ভাল ব্যাপার সমূহকে; তথা ভুল সমূহকে, ক্ষতি সমূহকে, উপকার সমূহ সমাজে প্রাধান্যতায় যোগ হয়েছে। আধুনিকতার মূল ও হাকিকি উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের জন্যে আরাম আয়েশের জীবনকে, দুনিয়ার শান্তিকে আসলে ভাল করতে যেয়ে এই আধুনিকতাই নষ্ট করে দিয়েছে। যেখানে মিতব্যয়ী ও অল্পতুষ্টি থাকার কথা সেখানে অপচয় ও অশ্লীলতা জমকালো ভাবে চলচ্ছে, , , যেখানে পরিশ্রম ও সেবার কাজ হওয়ার কথা সেখানে অলসতা ও বিরাম-বিনোদন অতি আগ্রহের সাথে বিজয়ী হওয়ার ফলে, বেচারা মানুষ যেমন ফকীর, অভাবি হচ্ছে তেমনি অতি মাত্রায় আলস্য, কুঁড়েমি, অকর্মণ্যতায় ঝুকে পড়েছে। আর এই কথার সমর্থনে আসমানি কানুনের বিধান কোরআন ভিত্তি স্বরূপ বলছে যে; لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى * كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا

এই সকল আয়াত বোঝাচ্ছে; " মানুষের জীবন বাতির সুখকে, সে মিতব্যয়ী ও অল্পতুষ্টির নিয়মকে বাস্থবায়িত করে প্রচুর প্রচেষ্টায় সফল হবে এবং এর সাথে এই মানবের সাধারণ ও অসাধারন, নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সকল স্থর ঐক্যপন্থায় তারা উত্তম পথের সুখে উন্নীত হবে" এমন কথার বিশ্লেষণে রিসালে নুরের পক্ষ থেকে দুই একটি পয়েন্ট নীচে আলোচনা করব। **প্রথম পয়েন্টঃ** স্বাভাবিক মানুষ, যাযাবর ও বেদুঈন জীবনে তিন চারটি বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী হয় বা হচ্ছিল। এই তিন চারটি প্রয়োজনকে তদারকি বা আওতাধীন করতে না পারা ব্যাক্তি এগুলোর সাথে আরও দশটি বস্তুর মুখাপেক্ষী হচ্ছে ফলে বড়জোর দুইটি চাহিদা মেটাতে পারবে বা পারছে। বর্তমান যুগের এই পশ্চিমা-যালিম-আধুনিকতা তারা অপচয় ও অপব্যাব্যবহারের কামনা বাসনা, প্রয়োজন বানিয়ে এবং অপ্রয়োজনীয় জরুরত সমূহকে, জরুরী চাহিদা হিসেবে মানুষের অন্তরে এঁটে দিয়ে বাহ্যিক ও সুক্ষদর্শী ধোঁকার সুনিপুণ কৌশলের দৃষ্টিতে এই মুহূর্তের ঐ শহর মুখী বা আধুনিক মননের মনশীল হওয়া মানুষের যেখানে সে চারটি বস্তুর মুখাপেক্ষী ছিল সেখানে এই যামানায় ঐ লোক বিশটি বস্তুর প্রতি চাহিদা ভুগি, রুচি বোধ তার মাঝে প্রস্থাপিত হয়ে আছে। এই মূর্খ সভ্যতা এভাবে ব্যাস্থ হতে এই মানুষকে উস্কিয়ে দিচ্ছে। যদি হালাল পন্থায় এই গুলোর অন্বেষণে ব্যাস্থ হয় তাহলে এই বিশটি থেকে সর্ব উচ্চ দুইটি হয়তো অর্জন করতে পারবে। পরিশেষে সে কিন্তু ১৮ টি চাহিদা পুরনের ক্ষেত্রে মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী রয়ে যায়। এর অর্থ হল এটা যে, এই আধুনিকতা মানুষকে আরও দরিদ্রতায় নিমজ্জিত করছে। আর ঐ অপ্রয়োজনীয় চাহিদার প্রতি ঝুকে পড়ার কারনের দৃষ্টিকোণে এই মানুষকে জুলুমের প্রতি অন্যান্য হারাম উপার্জনের প্রতি ঠেলে দিয়েছে বা দিচ্ছে৷ এই বেচারাগণ ধনী হোক গরীব হোক অনাকাংখ্যিত ঝগড়া, ফেসাদের প্রতি সাবাই হারাম ও জুলুমের সুবাধে বেষ্টিত হয়ে আছে। কোরআনের

ভিত্তিমূল কানুন হল " যাকাত দেওয়ার আবশ্যকতা এবং সুধ দেওয়া ও খাওয়াকে হারাম ঘোষণা করা" সাধারণের সম্মুখে ধনী ব্যাক্তির অনুগ্রহ ও গরীবের সম্মুখে অসাধারনের প্রতি আন্তরিকতার প্রচলনের এই পবিত্র নিয়ম, কানুনকে ছেড়ে দিয়ে এই আধুনিকতা সুদের যাঁতাকলের জুলুম, অত্যাচারে এবং গরিবদেরকে অন্যায় অপরাধের প্রতি মনযোগী হতে বাধ্য করে রেখেছে (ধনীকে আরও ধনী গরিবকে আরও গরীব বানাচ্ছে অনুঃ)। ফলাফলে মানবের জন্যে সুখের পথের স্লোগানের অপর পিঠে তারা ধবংসের বিষ ছড়িয়ে দিয়ে মানবের সুখকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে !!! **দ্বিতীয় পয়েন্টঃ** এই চলিত আধুনিকতার আকর্ষিত বিষয় সমূহ, যা মানুষের জন্যে একেকটি এলাহির নেয়ামত হওয়ার কথা থাকলেও, যার হাকিকি শুকরিয়া, মানুষের উপকারে ব্যাবহার হওয়ার কথা থাকলেও আমরা স্ব-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি যেঃ বর্তমান এই সভ্যতা মানুষের বড় একটা অংশকে আলস্যতায় ও নোংরামির অশ্লীলতায় বেষ্টিত করে রেখেছে এবং কাজ কর্ম ও মেহনতকে ছাড়িয়ে দিয়ে কুঁড়েমি ও আনন্দ ফুর্তিতে কামনা বাসনার প্রতি ঝুঁকিয়ে রাখার কারনে কর্ম ব্যাস্থ ঔৎসুক্যতা, আকাংক্ষা ও উৎসাহকে ভঙ্গুর করে দিচ্ছে। এই সভ্যতা অমিতব্যয়ীতা ও অল্পতুষ্টিহীনতার পন্থায় নোংরামিতে, অপচয়ে, জুলুমে, হারামের প্রতি ইচ্ছা আগ্রহে আকৃষ্ট করাচ্ছে। উদাহারন হিসেবে ~ রিসালে নুরের নূর চাবিকাটিতে ~ উল্লেখ করার ন্যায়- রেডিও (বর্তমান ইন্টারনেট বা ইউটিউব বলা যায় অনুঃ) মহান এক নেয়ামত হওয়ার স্থলে, মানুষ যেখানে এই নেয়ামতের আধ্যাত্মিক সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করার কথা পাঁচের মধ্যে চারের কামনা বাসনায়, অপ্রয়োজনীয়, বেহুদা, গান বাজনা বস্তু সমূহ ব্যাবহার করার কারনে অলসতায় ও অবৈধ পন্থায় রেডিওকে মনুরঞ্জনে ব্যাস্থ হয়ে কর্ম মুখী, মেহনতি ব্যাস্থতাকে ভেঙ্গে ফেলে দিচ্ছে। যারফলে, এই মানব হাকিকি দায়িত্ত ছেড়ে দেয়। এমনকি, অনেক উপকারে আগত এমন অনেক বিস্ময়কর মাধ্যম প্রযুক্তি সমূহকে, যেখানে মেহনত, পরিশ্রমের এবং মানবের উপকারে ব্যাবহার করার কথা থাকলেও, আমি নিজেই সাক্ষী আমি দেখেছি, দশটির মাঝে এক দুইটি প্রয়োজনে ব্যাবহার করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চাহিদাকে এত বেশী এড়িয়ে আট টি খাতকে মুল্যায়ন করে অপচয় নামের খাতায় মনোবাসনায়, অতিরিক্ত আকাংখ্যায়, বেহুদা পথে, অলসতার পথে বাধ্য হয়ে নাম লিখানো হচ্ছে। এই দুটি মৌলিক উদাহারনের ন্যায় হাজার হাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে। মোটকথাঃ বর্তমান এই পশ্চিমা সভ্যতা, আধুনিকতা, আসমানি দ্বীন সমূহের কথা কর্ণে না নেওয়ার কারনে, মানুষকে যেমন দরিদ্রতায় আক্রান্ত করছে তেমনি বেহুদা প্রয়োজনের প্রতি আকৃষ্ট করে দিয়েছে, , , এই সভ্যতা মিতব্যয়ীতাকে ও অল্পতুষ্টিতার ভিত্তিকে ভেঙ্গে দিয়ে লোভ ও পেটুকতাকে বাড়িয়ে দিয়ে জুলুম ও হারামের দরজা খুলে দিয়েছে। একইভাবে মানুষকে অশ্লীলতার মাধ্যম হওয়া প্রযুক্তিকে উৎসাহ দিয়ে ঐ বেচারা নিরীহ মানুষকে পরিপূর্ণ ভাবে আলস্যতায়, কুঁড়েমিতে নিক্ষেপ করেছে। কর্ম ব্যাস্থ জীবনকে ও মেহনতের পথ রুধ্য করে দিচ্ছে! মনে যা ইচ্ছা করার, মনোবাসনার পথে ঠেলে দিয়ে জীবনকে অনর্থক ভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে।

তথাপি, ঐ মজবুর হওয়া আলস্যের প্রতি কর্মে অনাস্থায় আক্রান্ত মানুষটাকেও, অসুস্থ করে দিয়েছে। মন্দ পুষ্টতার ও অপব্যব্যাবহারের মাধ্যমে, শত রকমের পীড়ার, ব্যাধির সংক্রমণে, প্রেষণের ও বিস্তারের মাধ্যম হয়েছে। একই ভাবে নির্দিষ্ট তিনটি কঠোর প্রয়োজন ও নোংরামিতে ঝোঁকে পড়া এবং মৃত্যুকে সার্বক্ষণিক স্মরণ করিয়ে দেয়ার অনেক রোগ ব্যাধিকে ও ধর্মহীনতার বাতাসের হাওয়া এই সভ্যতার ভিতরে অধিষ্টিত করে হস্তান্তরণ প্রক্রিয়ায়; ধর্মের কথা শুনে সজাগ ও সচেতন হওয়ার কথা এই মানুষ গুলোকে তাদের মৃত্যু নামী নেয়ামতকে একেবারে বিলীন হওয়া বিনাশ হওয়া মৃত্যুর পরে আর কোন বিচার প্রক্রিয়া নেই এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাদের মস্তিস্ককে আক্রান্ত করে রেখেছে। এমন আকৃতি তৈরি করে সব সময় এই মানব জাতীকে তারা হুমকির প্রভাব দিয়েই যাচ্ছে। এক প্রকার শান্তির আশ্রয়কে জাহান্নামের আশ্রয় ও যন্ত্রনা ভোগে ব্যাস্থ করে রেখেছে, , ,

সুতরাং এই ভয়ানক মানবিক মুসীবতের সম্মুখে কোরআনে হাকিমের লক্ষ কুটি ছাত্রদের পূর্ব সচেতনতার মাধ্যমে এবং এর ভিতরে থাকা আসমানি, পবিত্র ভিত্তি পূর্ণ কানুনের মাধ্যমে তের শত বছর পূর্বে শান্তির পথ প্রদর্শনের ন্যায়, আবারও ঐ লক্ষ কুটি পথিকের পথে মানবের এই তিনটি আক্রমণাত্মক রোগের মহৌষধ এর দ্বারা আরোগ্যতা অর্জন; কতইনা জরুরী। এবং যদি অতি নিকটে কেয়ামত সংঘটিত না হয়, তাহলে মানুসের দুনিয়াতে জীবনের সুখের জন্যে, এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের তরে সফলকাম হওয়ার তাগিদে; এমনকি মৃত্যু, নামীয় ভয়ের ব্যাপারটা যে একেবারেই বিলীন হওয়া নহে সামনে বিচার আদালত আছে এমন পথে অনুসারী করে চির নুরান্বিত পথে একটি টিকেট দেখানোর দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলা দরকার। এবং এখনকার এই পশ্চিমা সভ্যতার ধুম্রজালি আকর্ষণ সমূহের ক্ষত্রে ও তার পাপাচারিতার, নোংরামির পথ থেকে বাঁচার পথ হিসেবে, এবং এখন পর্যন্ত ঘটিত হওয়া সকল বিপদ মুখী ঘটনার ন্যায় এমন সকল দুষ্কর্মের বিপরীতে দ্বীন ও ধর্মের শিক্ষা যা এই সভ্যতার মূর্খতা বা ঘোষ প্রদানি নহে বরং এই সভ্যতা এলাহির আসমানি কানুনকে সমর্থন করে তার কৃতজ্ঞতা ও সাহায্যে এগুলোর ব্যাবহার করার কথা কোরআনের তত্ত বহুল ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝার ন্যায় তার ইশারা ইঙ্গিতের দ্বারা বুঝার ন্যায় এই মানুষ গুলো আসলে এলাহির রহমতের প্রতি আগ্রহী ও তার জন্যে যে অপেক্ষিত এই মর্মে তারা প্রার্থনা ও কাকুতিমিনতি করছে আর কোন সন্দেহ বাকী রইলনা! (এমিরদাগ ২, ৯৯)

এখতেলাফ / মতভেদ / ঈর্ষা

আমরা এই মাস'আলাকে অত্যান্ত নিখুত ভাবে বইয়ের মূল অংশে এখলাছ রিসালেতে পাওয়ার কারনে এখানে আর দেওয়া হচ্ছে না। কেবল একটি অংশ এখানে দেয়া হল (অনুঃ)।

এই রোগের কেবলমাত্র ঔষধ হলঃ স্বীয় অন্তরকে অপরাধী সাব্যস্থ করন, দোষীকরণ, ও শুধু স্বীয় অন্তরকে নয় বরং সম্মুখের স্বীয় পেশার ভাইকে সর্বদা সমর্থন যোগানো, বালাগাত,ভদ্রতার শাস্ত্র ও বিতর্কমূলক জ্ঞানের উলামাদের মধ্যকার সত্যনিষ্টতা ও ন্যায় বিচার এর মুলনীতি হওয়ার মাধ্যম হল এই যে “যদি কোন মাসআলার বিতর্কানুষ্ঠানে স্বীয় মতামত সত্য হিসেবে স্পষ্ট হয় এবং নিজের হক্ব হওয়াটা যদি স্বীয় নফছ পছন্দ করে এবং প্রতিপক্ষের অবস্থান অসত্য ও অন্যায় হওয়াতে যদি স্বীয় নফছ আনন্দিত হয় এটাই বে-ইনসাফী হবে। এমনকি ক্ষতি ও করবে। কেননা সত্যটা প্রকাশ হওয়ার সময় ঐ দৃশ্য থেকে অজানা কিছু শিখছে না। বরং অনেকাংশে সম্ভাব্য আত্মগরিমার নিরিখে ক্ষতির আত্মপ্রকাশ হতে পারে। অন্য দিকে প্রতিপক্ষ যদি হক্বপন্থী স্পষ্ট হয় + ক্ষতিহীন অজানা এক মাসআলা শিখে উপকারী হতে পারে। অন্তরের মন্দ দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষাকারী হবে।

অর্থাৎ ইনসাফের সাথে হক্বের পন্থা হক্বের খাতিরে তার অন্তরের আত্মগরিমারকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। দুশমনের হাতে ও হক্ব সত্যনিষ্টতা ও ন্যায় যদি দেখে, আবার সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করে আনন্দিত হবে।

সুতরাং এই আহলে দ্বীনের সংবিধান, আহলে হাক্বিক্বাত, আহলে তারিকাত আহলে ইলিম নিজে নিজেকে যদি রাহবার তারা গ্রহণ করে তাহলে, এখলাছ অবশ্যই অর্জন করিতে পারিবে। এবং আখেরাতের কর্মসূচিতে

উপযোগী হবে। এবং এই তিক্ত নিরবতা ও উপস্থিত কষ্টকর পরিস্থির জন্য আল্লাহর রহমতের সাথে পরিবর্তিত হয়ে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে। (লাম'আলার ১৫৬)

ধর্মবাদ ও জাতীয়তাবাদ

ট্রাকিয়া অঞ্চলের এক সফরে সুলতান রাসাদের সাথে থাকা বেশ কিছু অভিজ্ঞ বন্দুরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, ধর্মীয় উদ্দীপনা এবং স্বজাতিকতাবাদী উৎসাহ (ধর্মীয় নীতি ও জাতীয়তাবাদী নীতি) এর মাঝে কোন আইন-বিধান বেশী শক্তিশালী ও বেশী জনগনের জন্যে প্রয়োজনীয়, উপকারী, কার্যকরী ?

ঐ সময় আমি বলেছিলাম যে, আমরা মুসলমানরা আমাদের মাঝে ও আমাদের কাছে ধর্ম ও স্বদেশভক্তি সত্যবাদীতার নিরিখে উভয়টি একত্রিত, সংযুক্ত, ঐক্যতায় আধিষ্টিত। নামমাত্র, বাহ্যিকভাবে, সাময়িক ভাবে একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত আছে। বরং দ্বীন বা ধর্ম হল স্বজাতীকতার জীবন ও রুহ স্বরূপ। উভয়টাকে যখন একে অপরটির বিবেচনায় পৃথক বা ব্যাতিক্রম দৃষ্টিতে লক্ষপাত করা হয়; তখন ধর্মের উৎসাহ, উদ্দীপনা সকল শ্রেণীর মানুষকে শামিল ও শ্রোতা হিসেবে সমাসীন করে। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদীতা, যা শতাংশে একজন ব্যাক্তিকে তথা – ব্যাক্তি ক্ষেন্দ্রিক জীবন সরঞ্জামকে জাতীর জন্যে উৎসর্গ কারী – হিসেবে নির্দিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। আর এরকম যদি ফলাফল হয় তাহলে অবশ্যই ধর্মীয় আইনের উৎসাহ প্রথম স্থান অর্জন করা জরুরী। জাতীয়তাবাদীতা এই ধর্মীয় উদ্দীপনার খেদমতকারী, শক্তি, দুর্গ হওয়া আবশ্যিক। বিশেষ করে আমরা পূর্বাঞ্চলীয়রা পশ্চিমাদের ন্যায় নই। আমাদের ভিতরকার অন্তরাত্মার বিচারক বা ফয়সালাকারী হল আমাদের ধর্ম বা দ্বীন। শাশ্বত-কাঁদির আল্লাহ্ তিনি এশিয়ায় বেশীর ভাগ প্রান্তসমূহে নবীগণকে পাঠানোতে এই ব্যাপারটা ইঙ্গিত বহন করে যে, শুধুমাত্র ধর্মের বিধান-কর্ম এশিয়ার লোকদেরকে জাগ্রত করবে, এদের উন্নতির, সক্ষমতা মান্যতার স্বদিচ্ছা রয়েছে। এর অকাঠ্য প্রমান হল সৌভাগ্যবানদের ও তাবেইনদের যুগ।

হে আমায় প্রশ্নকারীরা আপনাদেরকে বলছি যে, ইসলামের ও দ্বীনের উদ্দীপনায় জাতীয়তাবাদ, এটা তুর্ক ও আরবদের মাঝে (মুসলিম উম্মাহের মাঝে) পূর্ণাঙ্গভাবে সম্মিলিত, মিক্স হয়ে গেছে, এবং গোত্রীয় পার্থক্য এখানে হবে না এটা এদের মাঝে একনিষ্ট পথের অবস্থায় এসে গেছে। এটা এমন এক ধর্মীয় ঐক্যতার ঐকতান যে সর্ব উচ্চ মানের শক্তি, পরাশক্তি এবং আরশে-আযিম থেকে আগত এক নূরানি জিঞ্জির। এটা ভাংবেনা, ভঙ্গুর হবেনা এমন এক (উরউয়াতুল উছকা) সুদৃঢ় হাতল। এটাকে ধ্বংস করা যাবেনা। এর উপর বিজয়ী হওয়া যাবে না এমন এক পবিত্র বন্ধন এক কেল্লা ও দুর্গ এটা। (হুতবায়ে শামিয়া ৬৪)

নেস্নালিযম বা স্বজাতিকতাবাদ, উমাইয়্যা যুগে অনেক মারাত্মক ধ্বংস এনেছিল। এবং আজাদির প্রথম দিকে " ক্লাবের" নামে বড় মাপের ক্ষতির প্রতিষ্ঠাপনের চিত্র এবং প্রথম বিশ্ব-সংগ্রামে আবার ঘুরে ফিরে জাতিয়তাবাদের উদ্দীপনা ব্যাবহারের মাধ্যমে কল্যাণী আরবি ভাইদেরকে তুরকিশ মুজাহিদ ভাইদের মুখোমুখি করে যে ক্ষতিটা প্রদর্শিত হয়েছে একই পন্থায় এখন ও ইসলামি ভ্রাত্রিত্তের ঐক্যতার বিপরীত এই ধুম্রজাল ব্যাবহার হতে পারে, হচ্ছে। এবং সর্ব সাধারণের শান্তিকামী অবস্থার প্রতি দুশমনদের, গুপন নাস্তিকদের আবার সেই জাতিয়বাদিতার বিধ্বংসী আক্রমনের জন্যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার দিক নির্দেশনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ, দুশ্চিন্তার কারণ নাই, যেখানে অন্যদের জাতিয়তাবাদিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীবন যাপনের বেলায় এই ভিত্তিমূল স্বজাতীয়তার মেজাজ, আখলাক ও চরিত্রের সংস্পর্শে, অন্য মুসলমানদের ন্যায় প্রথমেই তুর্কী জাতী যারা দুনিয়ার সর্ব দিকে মুসলমান হওয়ার কারনে তাদের এই স্বজাতিয়তাকে ইসলামের ছায়ার মাধ্যমে সম্মেলিত ও মিছ্রিত হয়ে আছে। তুর্ক, মানেই হল মুসলমান। এক অংশ যারা মুসলমান নহে তারা এদের থেকে আলাদা হয়ে আছে। তুর্কিদের ন্যায় আরব ভাইয়েরাও ইসলামের ছায়াতলে

নিজেদেরকে ভ্রাত্রিত্তের জাতিয়তাবাদে সংযুক্ত হয়ে আছে, এবং এই ভাবে ইসলামি স্বজাতিয়তায় হওয়া জরুরীও বঠে। মূল বা হাকিকি জাতীয়তাবাদ হল ইসলামিয়াতের জাতীয়তাবাদ। এটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। ব্যাক্তি ক্ষেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ হল নিরঙ্কুশ ভাবে ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক। পাকিস্থান ও ইরাকি ভাইদের ঐক্যতা ইনশা-আল্লাহ্ এই অস্থায়ী সীমিত জাতীয়তাবাদ থেকে আগত আক্রমন সমূহে দেয়াল হয়ে দাঁড়াবে। স্বরনীয় ব্যাপার ৬৫ বছর আগে অলি এক স্বত্বা আমাকে একটি পত্রিকা পাঠ করে শুনালেন যে, একটি উপনিবেশক রাষ্ট্র কোরআনকে তাদের হাতে নিয়ে একটি কনফারেন্স করেছিল। বলেছিল যে, “ আমরা যদি এই ইসলামি শাসনের আশপাশে থাকি তাহলে আমরা তাদের আসল খুঁটি, বিচারক হতে পারবোনা তাদেরকে আমরা আমাদের অনুশাসনের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবোনা, এই জন্যে হয় আমরা কোরআনকে নিশ্চুপ করতে হবে নতুবা মুসলমানদেরকে এই কোরআন থেকে দূরে নিয়ে আসতে হবে ”। (সারকথাঃ আমিও এদের এই চক্রান্তের বিপরীতে দুটি পথ কোরআনের নুরের দ্বারা পেয়েছি একটি হল এই রিসালে নূর ও তার সুহৃদগণের তাকওয়াবান খেদমত। দ্বিতীয়টি হল আযহার ইউনিভার্সিটির ন্যায় সকল শাস্ত্রের সমন্বয়ে একটি ইউনিভার্সিটি করব তার নাম মাদ্রসাতুয-যাহ্‌রা। অনুঃ) (এমিরদাগ ২, ২২২)

শূরা হুজুরাত ১৩ অর্থাৎ- তোমাদেরকে দলে দলে, জাতী জাতী, গোত্র গোত্র করে আমি সৃষ্টি করেছি; যাতে করে একে অপরকে চিনতে, জানতে পারো, পরস্পরের সামাজিক জীবনের সম্পর্ক গুলোকে বুঝতে পারো, একজন আরেকজনকে সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসো। এই অর্থ কখনও নহে যে, তোমাদের সৃষ্টি করেছি গোত্র গোত্র করে যেন তুমরা কেবল পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বিদ্রুহীতার জেদ নিয়ে একে অপরকে ভিন্ন চুখে থাকাও বা জগড়া ফ্যাসাদের ও দুশমনির মনোভাব নিয়ে থাক। আয়াতের অর্থ এই দ্বিতীয় উদ্যেশ্য নহে।

জাতীয়তাবাদের ফিকিরের থাবা, এই যুগে অনেক উপরে চলে গেছে। বিশেষ করে আক্রমণাত্মক ইউরোপের জালিমরা; এই জাতী নামীয় স্বার্থপরতাকে ইসলামের অনুসারীদের ভিতরে অভাবাত্মক ও নেতিবাচক পন্থায় দোল খাওয়াচ্ছে, শেখাচ্ছে; যাতে করে মুসলমানরা যেন টুকরা টুকরা হয়ে আলাদা হয়ে যায়, পরে তাদের শোষণ করতে সহজ হবে। জাতিয়বাদিতায় একটি নফসানি মজাও আছে; এর মধ্যে গাফলতির মায়াজালে এক স্বাদ রয়েছে, দুর্ভাগা জনিত, বদবখত এক শক্তি রয়েছে। এই কারনে যারা সামাজিক জীবনের সাথে গতিপ্রবন বা ব্যাস্থ তাদেরকে “ জাতীয়তাবাদের চিন্তা বাদ দেও” এমনটি বলা উচিৎ নহে। কারণ হল- এটা দুই রকমের হয়। একটি হল সম্পূর্ণ নেতিবাচক, বদবখতপুরক, ক্ষতিকর; এটা এমন যে অন্যকে গভীরভাবে শুষে, শোষণ করে পানাহার করায়, অন্যদের সাথে প্রতিহিংসার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যায়, চালাকির পন্থায় আচরন করে। জাতীয়তাবাদ যদি এরকম হয় তাহলে এটা হল বিবাদ প্রতিপক্ষতা ও বিতণ্ডা শত্রুতার কারণ। এই জন্যে হাদিস শরিফে বলা হয়েছে اَلْإِسْلَامِيَّةُ جَبَّتِ الْعَصَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ ইসলাম জাহিলিয়াত থেকে চলিত জাতীয়তাবাদকে, স্বজাতীয়তাকে গ্রহণ করেনা, গোত্রগীরী উঠিয়ে দিয়েছে। আবার কোরআনে ও বলা হয়েছে শূরা ফাতাহ ২৬।

সুতরাং এই হাদিস শরিফ ও পবিত্র আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে; অকাঠ্য এক পন্থায় নেতিবাচক কোন জাতীয়তাকে এবং পক্ষপাতিত্তকে গ্রহণ করা হচ্ছে না। কারণ ইতিবাচক ও পবিত্র ইসলামি জাতীয়তার প্রয়োজন মানব জীবনকে ঝগড়া থেকে মুক্ত করে সুখী হওয়ার ভঙ্গুরহীন হাতল উপহার দিচ্ছে। (মাক্তুবাত ২২১)

সাহাবী / মাজহাব

যদি তুমি বল যে, সাহাবারা ও মানুষ ছিলেন, ভূল ত্রুটি থেকে তারাও মুক্ত নহেন। এমনকি, ইজতেহাদের ও শরীয়তের হুকুম সমূহের মাপকাটি সাহাবীদের আদালত ও সত্যনিষ্ট এতই যে সমস্ত উম্মত এই বলে স্বকৃতী দিচ্ছেন সাহাবীগণ সকল সময়ে অনির্দিষ্টভাবে ইনসাফী ও সত্য, এর সমাধান কি?

উত্তরঃ হাঁ সাহাবায়ে কেরাম সকল সময়ে তারা একদম সাধারণ ওজাহাতে হক্বের প্রতি আশিক। সত্যের বন্ধু। আদালতের প্রতি তারা চূড়ান্ত আকাঙ্খী। কেননা মিথ্যে ও মিথ্যাবাদিতার মন্দ আচরণ সমস্ত কুকর্মের সাথে, এবং সত্য ও সত্যবাদিতার উজ্জলতা সমস্ত উজ্জলতার সাথে সাহাবাদের যামানায় ঐ রকম এক পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছিল যে, আমাদের এই যামানার দূরত্বেও তুলনায় যেন আরশ থেকে ফারশ পর্যন্ত কুকর্ম ও উজ্জলতা স্পষ্ট হয়েছে। সর্বনিম্নের জাহান্নামী মুসায়লাসাতুল কায্যাব এর দাবী-দাবার আচরণ থেকে সর্বউচ্চ মাকামের অধিকারী হওয়া জনাবে মুহাম্মদ (স:) এর সত্যবাদিতার স্থরে পর্যন্ত এক প্রকার বিশাল তফাত দেখাচ্ছে। হাঁ নিঃসন্দেহে মুসায়লামাতুল কাযযাব এর মিথ্যে চরিত্রে পড়ার ন্যায় সত্যের চরিত্রের সর্বোচ্চ মাকামদারী ব্যক্তি হলেন মুহাম্মদ (সা:)।

সুতরাং এই উচ্চমানের অনুভূতি বহনকারী ও চরিত্রের সর্বোচ্চ মাধুর্যপূর্ণতার অনুসরণ করাকৃত এবং নবুওয়েতের সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আলোকিত হওয়া সাহাবায়ে কেরাম, ঐ স্থরের ঘৃন্য ও নিম্নতায় তারা কোন কারণ হওয়া এবং মুসায়লামার কৌতুহলপূর্ণ কুকর্মের ঘৃন্যতার দোকানের মালহিসেবে মিথ্যাবাদীতা, ইচ্ছাকৃতভাবে হাতকে লম্বা করে কারো কাছে কিছু চাওয়া, এবং কুফুর থেকে বের হওয়াকৃত কুফুরের একান্ত প্রিয় বন্ধন যা মিথ্যাবাদীতা থেকে প্রকাশ পায়। নিঃসন্দেহে তারা এই সব থেকে মুক্ত। এবং ঐ স্থরের সৌন্দর্য ও গৌরবীকর্ম ও মুবাহ তৎপরতা এবং সুমহান উচ্চামুখী মে-রাজের ও উদ্ধর্তন তৎপরতা ও ইসলামের গৌরবের মহান খাজানায় এবং ধাতুর, দর্পনের সাথে পাওয়া এবং সুমহান পরাক্রমশালী সৌন্দর্য মন্ডিত উজ্জ্বলতার সাথে মানব সভ্যতাকে আলোকিত করণ সততাকে ও সত্যনিষ্ট স্বীকারকরণ ও হককে ও বিশেষ করে শরীয়তের হুকুম সমূহকে রেওয়ায়েত সমূহে ও দাওয়াতের মধ্যে বস্তুত: সামর্থ্যনুযায়ী আগত অন্বেষণ ও আনুগত্য ও মুহাব্বাত হওয়া তাদের বেলায় নিঃসন্দেহে শক্তিশালী ও চূড়ান্ত বাস্তব। অতএব এই যামানায় মিথ্যা ও সত্য এর মধ্যে দূরত্ব ঐ পরিমাণ কাছাকাছি হয়েছে যে, নিরংকুশ অভ্যাসে একদম সাধারণ হয়ে গেছে। সত্য থেকে মিথ্যায় যাওয়া একদম সহজতরভাবে তারা যাচ্ছে ও যাওয়াচ্ছে এমনকি রাজনীতির প্রপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে মিথ্যাবাদিতাকে সত্য বলে সমর্থন করছে। সুতরাং সবচেয়ে ঘৃনিত, বস্তুত: একনিষ্ট উত্তম বস্তু একটি দোকানের মধ্যে এক সাথে যদি হুবহু মুল্যে বিক্রি করা হয়, তাহলে ঐ দোকানদারের কল্পনায় ও কখনও আসবে না যে কোনটি মুতি ও মূল্যবান যা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ সত্য ও হক এর বিবেচনায় তুলনাকল্পে অর্জন হয়। (সোজলার ৪৮৪)

এখন যদি আপনি বলেন যে, হক্ব একটি হবে, তাহলে কিভাবে এরকম চারটি মাযহাব কিংবা ভিন্নমুখী বারোটি মাযহাবের হুকুম সমূহ বিশুদ্ধ একটি হক্ব হবে?

উত্তরঃ এক পানি, যা ভিন্নমুখী প্রেক্ষাপটে রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঁচটা হুকুম নিয়ে আসে (ঐভাবে মাযহাবের অবস্থান) যেমন:- এক ব্যক্তির অসুস্থতার ধারানুসারে পানি হল তার ঔষধ, ঔষধ সেবনের হুকুমে তার জন্য এটা ওয়াজিব। অন্য ব্যক্তির জন্য এই পানি তার অসুস্থতার হালতে অল্প ক্ষতি করবে। ঔষধের সেবনের হুকুম পানি তার জন্য অপছন্দনীয় বা মাকরূহ। অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিহীনভাবে পানি তার জন্য উপকারী, আর ঔষধ সেবনের হুকুমে এটা তার জন্য সুন্নত বা নবীজীর আদর্শ। আরেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে না

ক্ষতিকর না উপকারী ঔষধের শাস্ত্রে এটা তার জন্য মুবাহ। এখানে লক্ষণীয় প্রত্যেকটি ই-হক্ব, এবং ভিন্নমুখী, আপনি কি বলতে পারেন এটা শুধু ঔষধ, বা ওয়াজিব অন্যগুলো হুকুমহীন। না বলতে পারেন না, কেননা (ঐভাবে ভিন্নমুখী মাযহাব ও কিন্তু হক্ব) সুতরাং ঐভাবে খোদায়ী হুকুমের মাযহাব সমূহ এলাহীর হেকমতের রাস্তার সাথে অনুসারীদের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিবর্তনশীল, যেমন হক্ব হিসেবে পরিবর্তন হয় তেমনি সবকটি হুকুম ও হক্ব হয় উপযোগী হয়। যেমন এলাহীর হুকুমতের রাস্তায় ইমাম শাফি (রহঃ) কে অনুসরণ কারী ব্যক্তি অধিকাংশের মতানুসারে হানাফিদের তুলনায় গ্রাম্যের বা অপ্রচলিত আরও কাছাকাছি কোন জামাত এর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় জামাতের অঙ্গ বিশেষ স্বীয় অবস্থান সামাজিক হায়াতের সংশ্লিষ্ট হওয়ার পরও প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ইমামের পিছনে স্বীয় কর্মের অংশ বিশেষ কাদিউল-হাজাতের কাছে স্বীয় দুঃখ বলা ও প্রয়োজনীয়তা চাওয়া প্রত্যেকেই সুরা ফাতিহা পড়ে থাকেন। যেমনটি এটা হক্ব তেমনি হেকমতের ভান্ডারও।

অন্য দিকে ইমামে আযাম (রহঃ) কে অনুসরণকারীরা অধিকাংশের মতানুসারে, ইসলামী হুকুমতের অধিকাংশের ঐ মাযহাবকে বাধ্যবাধকতার নিরিখে অনুসরণীয় হওয়াতে, বাজারজাতকৃত এবং শহরাঞ্চল এবং সামাজিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে কোন জামাতের হুকুম এক ব্যক্তি তথা ইমামের অনুকরণীয় হওয়াতে এক ব্যক্তি সকলের পক্ষ থেকে পড়ছে, বলছে, এবং সকলের পক্ষ থেকে দোয়া পড়চ্ছে মন ও আন্তরিকতার অবস্থান সত্যায়িত হয়ে হানাফি মাযহাবের অনুসারীরা কেবল ইমাম ছাড়া ফাতেহা পড়েন না আর এটাও যেমন হক্ব তেমনী হেকমতের একটা কৌশল।

এমন কি, শরীয়ত স্বাস্থ্যের অবস্থানের প্রেক্ষাপটে পর্দা তৈরী করতঃ হুকুমকে কিছুটা নরম বা কোমল করে নফসে আম্মারা কে শিক্ষা প্রদান করে। অতএব অধিকাংশের মতে গ্রামীণ ও পূর্ণ অপ্রচল বা কাজের বিশ্রীময় অংশে বা এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে স্পর্শ করলে তার চক্ষু নষ্ট হয়ে যাবে। নাপাকি লাগলে নাপাকের হুকুমে যাবে। অধিকাংশের মতের ধারাবাহিকতায় সামাজিক হায়াতে অবস্থানী পূর্ণ কোন শহরী লোক যদি মহিলা স্পর্শ করে তাহলে হানাফি মাযহাবের ধারানুসারে কোন মহিলাকে স্পর্শ করতঃ অযু নষ্ট হবে না এমনকি এক দিরহাম সমপরিমাণ নাপাকি কে ফতওয়া ও দেওয়া হয়েছে নাপাকের হুকুমে যাবে না।

এই বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কারের জন্যে একজন সাধারণ কর্মীকেও সম্মানী ব্যক্তিকে যদি চিন্তা করি বুঝা সহজ হবে। কাজের ঐ লোকটি জীবন জীবিকার ধারাবাহিকতায় অপরিচত কোন মহিলা কে ধাক্কা, স্পর্শ অথবা এক স্থানে অবস্থান করতঃ অথবা খাহেসাতের উত্তেজিত হওয়ার ন্যায় কোন প্রেক্ষাপটের মধ্যে অবস্থান করতঃ শিল্প ও শিল্পায়িত এলাকার বসবাস করার বিবেচনায় তার জন্য শরীয়ত বাধ্যবাধকতার বিবেচনায় এই অবস্থানে অযু নষ্ট হয়ে যাওয়ার হুকুম প্রদান করে। স্পর্শ কর না, এমনিতে নামাযকে বাতিল করে অতিরিক্ত খুজাখুজি করনা বলে বলে হুকুম প্রদান করচ্ছে। যাহাতে ঐ গ্রামীন লোকটি সচেতন থাকে। সহজ সরল হায়াতে জিন্দেগী হওয়ার কারণে।

অন্য দিকে ঐ ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাব এভাবে বলচ্ছে যে, ঐ লোকটি গ্রামের লোকের মত নহে। মহিলাদের আনাগুনা তার জীবনে অনেক সহজতর একটা বিষয় যেহেতু শহরের বাসিন্দা। এই জন্য রূখসত বা ছাড় দেওয়া হয়েছে তার প্রতি ঐ গ্রামীন লোকটির ন্যায় শক্ত হুকুম নেই। স্পর্শ করিলে ও অযু যাবে না। পানির ব্যবহার না করিলেও এক দিরহাম পরিমাণ ছাড় রয়েছে টয়লেটের ক্ষেত্রে। ঐ রকম ফতওয়া রয়েছে। সুতরাং সাগর থেকে এই ২টি উদাহরণকে যুক্তি কাটিয়ে মিলিয়ে নাও মীযানে শারানী (আল্লামা শা'রানীর

কিতাব এর তুলনার সাথে শরীয়তের অবস্থানকে ও তুলনা করে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন, তুলনা করেন। (সোজলার ৪৮৫)

মুনাকাশা, তর্কবিতর্ক, বাদানুবাদ, বচসা

আমার প্রান-প্রিয়, সত্যবাদী ভাইগন!

খবরদার সতর্ক করছি আপনারা কখনও বাকবিতণ্ডা করবেন না। আপনারা বিবাদে জড়ালে তখন গুপ্তদুতের কর্ণ সমূহ সুযোগ-সুবিদা ভোগ করার মুহলত পাবে। আপনি যদি ন্যায়, অধিকারী হয়ে থাকেন, অথবা অন্যায়, অধিকারহীন হয়ে থাকেন তবুও যামানার এই যে পরিস্থিতি চলছে আমাদের বাদানুবাদকারীর কোন অধিকার নেই, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এমন কোন বচসা করা সঠিক নহে। এক দিরহাম হক যদি থাকে, তর্কবিতর্কের কারনে আমাদেরকে এক হাজার দিরহাম ক্ষতি সমূহ স্পর্শ করতে পারে। একবার এস্কিসেহিরের জেলখানায় কিছু বদরাগী ভাইদেরকে বলার ন্যায় এখানেও ঐ ঘটনা বলছিঃ পূর্ব বিশ্ব-সংগ্রামে রাশিয়ার বর্ডারে নব্বইজন প্রতিরক্ষা-কর্মকর্তার সাথে একটি লম্বা ডরমিটরিতে আমরা ছিলাম। ঐ ভাইয়েরা আমার সম্মুখে আমার সিমা-রেখার বাহিরে আমার সম্পর্কে তাদের মাঝে এক কৌতূহলের জন্ম দেখা দিলে, এমন এক বাদানুবাদ হল যে আমি তাদের সুযোগই দিলাম না। কিন্তু হঠাৎ স্বদল-প্রীতি, দলীয় মনোভাব ও স্নায়ুবিকতা থেকে আগত এক বদরাগীতা, মারাত্মক বাকবিতণ্ডার এক আকার ধারন শুরু করল। আমিও তিন-চারজনকে বলিলাম যে, আপনারা যেখানে চিল্লাচিল্লি, হৈচৈ রয়েছে, ওখানে যান গিয়ে অন্যায়কে সাহায্য করুন। তারা এমন কাজ করল যে বাদানুবাদ বন্দ হয়ে গেল। পরে আমাকে জিজ্ঞেস করল যে কেন তুমি অন্যায় শব্দ ব্যাবহার করলে? আমি বলিলাম যে, সত্যবাদী, হক চিন্তাকারী ব্যাক্তি ইন্সাফি হয়; সে এক দিরহাম অধিকারী সত্যবাদীতাকে, সকলের সর্বসাধারণের জন্যে শত দিরহামের উপকারকে, লাভকে সে উৎসর্গ করে। আর যদি অন্যায়বাদী হয় তাহলে বেশীরভাগই আত্মহংকারি হয়, আত্মোৎসর্গকারী হবে না, তখন কেবল শোর-গুল, হৈচৈ, চিল্লাচিল্লি শুধু বাড়তেই থাকবে।

আমার ভাইয়েরা!, , , , , , , , , , যেহেতু আমরা পরস্পর ভাই, তাই আমার ন্যায় সবরের অনুসরণ আপনাদের কাছ থেকে একান্ত কামনা রাখি। (১৩ তম সুয়া ৩২১)

আমার ভাইগন! আপনারা খুবই সচেতন ও অতিরিক্ত সাবধান থাকবেন, , , , খবরদার, সতর্ক থাকবেন শিক্ষকদের, হুজুরদের সাথে তর্কবিতর্ক করবেন না, , , অত্যান্ত সুক্ষতার সাথে ইনাদের সঙ্গে শান্তিকামীতার আচরনে চলাফেরা করবেন। আমিত্য ও আত্মহংকারের সাথে আতাত বা বন্দুত্ত করবেন না। বেদাতিও যদি হয় সংশ্লিষ্ট হতে যাবেন না। আমাদের সামনে অত্যান্ত নিকৃষ্ট জিন্দিক, নাস্তিক থাকতে কেন এদের সাথে বাদানুবাদ করবেন। বেদ'আতিদের সাথে সময় দিয়ে এই বেদ'আতিদেরকে নাস্তিকদের দলে পাঠানোর কোন প্রয়োজন নেই, তাদেরকে দিয়ে যিন্দিকদের দল বড় না করা আবশ্যকীয়। এখন যদি আপনারা এমন অবস্থার সম্মুখীন হন বা আপনাদের কাছে পাঠানো এমন কারো সাথে মুখোমুখি হয়ে যান, অত্যান্ত দূরদৃষ্টিতার সাথে চেষ্টা করবেন যেন বিতর্কের দরজা না খোলে। ইলমের পোশাকের মাধ্যমে আপত্তির সূর সমূহ, বচসা সমূহ, মুনাফিকদের হাত সমূহে একটি সার্টিফিকেট হিসেবে বিবেচনা হয়ে থাকে। (এমিরদাগ১, ১৩৩)

মুনাকাশা জায়েয হওয়ার শর্ত হল; ইনসাফের সাথে, হককে, সত্যকে অন্বেষণ করার নিয়তে, আপসবিমুখ, একরোখাহীন, একচেটিয়ামিহীন আকৃতিতে, আলোচ্য বিষয়ের বিজ্ঞদের সাথে, ভুল ব্যাখ্যার বা অপব্যাখ্যার বিপদ থেকে মুক্ত থেকে

মুযাকারা হতে পারে। এটা এমনভাবে জায়েয হওয়ার যুক্তি হল এটা যে, যদি সত্যটা সম্মুখের ব্যাক্তির দিকে থেকে প্রকাশ পায় এটা যেন আপনাকে দ্বিধাগ্রস্থ না করে, মন্দ ধারনায় প্রভাবিত না করে যে আমি বিজয়ী হতে পারলাম না। এভাবে যেন হয় যে, আপনি যেন তার থেকে প্রকাশ পাওয়া সত্য থেকে শিখতে পারেন। কারণ না জানা বস্তুটাকে জানা হবে। আবার যদি সত্যটা নিজের থেকে প্রকাশ পায় তাহলে এখান থেকে ব্যাতিক্রমি কিছু শিখা হলনা, পরিশেষে এটা সম্ভবত অহংকারে পতিত হওয়ার মাধ্যম হতে পারে।

এখন যদি বাদানুবাদের বিষয় হাদিস শরীফ হয়; তাহলে তখন হাদিসের মর্তবা সমূহ, এবং যিন্নি ওহী তথা ইঙ্গিত সুচক ওহী এর স্তর সমূহ ও নবীজির কথা বলার ধরন ও প্রকারাদি জানা আবশ্যকীয়। জনসাধারণের সম্মুখে সুক্ষ্মদর্শী, সহজে বুঝে আসেনা এমন হাদিস সমূহ নিয়ে বাকবিতণ্ডা করা ফযিলতকে সকলের সামনে উপস্থাপনের আকৃতিতে এডভোকেটদের, কোর্টের উকিলদের ন্যায় স্বীয় কথাকে সঠিক প্রমান করা এবং আত্মহংকারের বাহানায়, সত্য ও ইনসাফকে প্রাধান্য দেওয়া ভাবখানা নিয়ে দলিল সমূহ খুজা খুজি করা এটা জায়েয নহে। যখনি এমন অবস্থার, মাস'আলার সৃষ্টি হয়, তর্কবিতর্ক শুরু হয়, তখন বেচারা সাধারণ মানুষের মগজে মন্দের প্রভাবটা ছাড়া অন্য কিছু হয় না। কারণ এমন মুতাসাবিহ হাদিস সমূহের প্রচলন মানুষের দেমাগে সচরাচর না থাকার কারনে যদি হাদিসকে অস্বীকার করে তাহলে তো বারোটা বাজবে ও মারাত্মক এক দরজা খোলবে। আবার যদি হাদিসের বাহ্যিক অর্থকে উপস্থাপন করে প্রকাশ করা হয় তখন আহলে দালালাত তাদের আপত্তি দেখাবে ও বলবে যে " এগুলো কুসংস্কার " এমন পরিস্থিতির রাস্তা উন্মুক্ত হবে। যেমন হযরত মুসা আঃ এর হযরত আজরাইল আঃ কে চড় মারার হাদিস (লম্বা আলোচনা সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে অনুঃ)। (মাক্তুবাত ৩৫১)

আদালাত, ন্যায়-বিচার, ইনসাফ

অবশ্যই ইসলামী মিল্লাতের শান্তির মাধ্যম কেবলমাত্র, শুধুমাত্র ইসলামের হাকিকাত সমূহের দ্বারা হতে পারে অন্য কিছু দ্বারা নহে। এবং তাদের সামাজিক জীবন ও দুনিয়ার শান্তিময় যাপন কেবল ইসলামী শরীয়তের মাধ্যমে হতে পারে। নতুবা ন্যায়-বিচার ভূলুণ্ঠিত হবে। মানুষের সিকিউরিটি জাল্লামময় হয়ে বিধ্বংস হবে। চরিত্রহীনতা এবং নোংরা ও কলুষিত রোগ সমূহ বিস্তৃত হয়ে অনিষ্টতা বিজয়ী হবে। সমস্থ দায়িত্ত-ভার নেতৃত্ব মিথ্যেবাদীদের ও ধোঁকাবাজদের হাতে থেকে যাবে। আপনাদেরকে এই ব্যাপারে সুক্ষদর্শী হাকিকাতের হাজার হাজার অকাট্য প্রমাণাদি থেকে নমুনা স্বরূপ একটি ঘটনা বলিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে, আপনাদের শ্রবণের জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এটা হল এই যে,

একবার একজন লোক, এক মরুভূমিতে, গ্রাম্যদের থেকে একজন আহলে হাকিকাতের বাড়িতে মেহমান হয়েছিল। ঐ বাড়িতে সে দেখতে পেল, ঘরের মালিক তারা তাদের মাল-সামানার তেমন একটা হেফাজত করার চিন্তায় মগ্ন নহে। এমনকি ঘরের মালিক ঘরের এক কোনে টাকা পয়সা সকল মূল্যবান সম্পদকে খোলামেলা ভাবে ফেলে রেখে দিয়েছে। তখন ঐ মেহমান ঘরের মালিক কে বলিল যে, আপনি কি চুরি হওয়ার ভয় করছেন না, এভাবে টাকা কড়িকে ফেলে রেখে দিয়েছেন? ঘরের মালিক তাহাকে বলিল যে, "আমাদের মাঝে চুরি ডাকাতি বলতে কিছু হয় না"। আবার মেহমান বলিল যে "আমরা আমাদের টাকা পয়সা কতই হেফাজতে সিন্দুকে ও তালা দিয়ে রাখার পরেও চুরির ভয়ে থাকি ও চুরি ডাকাতি হয়" কি বলচ্ছেন আপনি? ঘরের কর্তা তাহাকে বলিল যে, আমাদের চুরি না হওয়ার কারণ হল "আমরা এলাহির হুকুমে ও শরীয়তের ন্যায়-বিচারের নামে কেউ চুরি করলে তার হাত কর্তন করি" মুসাফির বলিল এমনটি হলে আপনাদের বেশীর ভাগ লোকের এক হাত না থাকাটা আবশ্যকীয় হয়ে যায়। তখন ঘরের মালিক তাহাকে বলেছিল যে,

"আমি পঞ্চাশ বছর বয়সী আমার সারাটা জীবনে মাত্র একবার এরকম চুরির হাত কাটা দেখেছি"। ঐ মুসাফির লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলিল, "আমাদের দেশে প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ লোকের চুরির যন্ত্রনায় তাদেরকে জেলখানায় প্রেরণ করি, কিন্তু আপনাদের এইখানের আদালতের, ন্যায়-বিচারের ন্যায় একটুও পরিমাণ প্রভাব দেখতে পাচ্ছি না"। তারপর ঘরের মালিক বলিল যে, আপনারা অনেক বড় এক হাকিকাত ও সুক্ষ এবং ক্ষমতাবান এক রহস্য থেকে গাফলতি করচ্ছেন, ঐ সুক্ষ ভেদকে ছেড়ে দিয়েছেন। এই কারনে সুবিচারের ভিত্তিকে হারিয়ে ফেলচ্ছেন। মানবতার মঙ্গল ও কল্যানের স্থলে ন্যায়-বিচারের পর্দার নীচে অহংকার, জুলুম এবং পক্ষপাতী পূর্ণ বাতাসের প্রবেশাধিকার হয়ে থাকে, রাষ্ট্রীয় আইনের নির্দেশ সমূহের প্রভাব ভেঙ্গে যায়"। এই হাকিকাতের রহস্য হল এই যে, আমাদের মাঝে কোন চুর যদি তার হাতকে অন্যের মালের প্রতি লম্বা করে তখন ঐ মুহূর্তে সে শরীয়তের বিধানকে বাস্তবায়ন হবে বলে স্বরণ করে। আরশে-এলাহি থেকে অবতীর্ণ হওয়া বিচারের হুকুম তার মনে কম্পিত হয়৷ তখন ব্যাক্তি ঈমানের অনুভূতির দ্বারা, কলবের কর্ণ দ্বারা শাশ্বত বানী থেকে আগত হুকুম তথা "চুরের হাত কাটা হবে" اَلسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا এমন আয়াতকে সে অনুভব করে শ্রবণ করার ন্যায় ঈমান ও আত্মবিশ্বাসের হুশ ও চেতনার এবং উচ্চ স্থরের উদ্রেক ও প্রদীপ্তি, প্রকোপন তার মাঝে কাজ করে। রুহের চতুর্দিকে, অনুভূতির গভীর তল দেশে ঐ দেহ নামী কারখানার প্রতি আক্রমনের ন্যায় একটি রুহানি অবস্থা অর্জন করে। নফস ও মনোবাসনা থেকে আগত ঝোঁক সমূহ পদদলিত হয়, নিরাবরন করে, রুচি প্রত্যাখ্যিত হয়। এভাবে চিন্তা করতঃ ঐ চুরির ঝোঁক ভূলুণ্ঠিত হয়। কারণ কেবলমাত্র সন্দেহ বা ফিকির নহে, বরং আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহ যেমন – জ্ঞান, কলব, অনুভূতি – হঠাৎ ঐ চুরির কামনাকে, আগ্রহকে আক্রমন করে। শরীয়তের শাস্তির স্বরণে আসার সাথে উচ্চ মানের এক ধমকি এবং অনুভূতি প্রবণ এক নিশেদাজ্ঞা ঐ চুরির আগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হয়, ব্যাক্তিকে নিশ্চুপ করে দেয়। আবশ্যিকভাবে ঈমান অন্তরের মধ্যে, মগজের মধ্যে সর্বদা নিশেদাজ্ঞার কারনে এই কাজকে না করার যে প্রবণতা, ঝোঁক তৈরি হয় এই ধারানুসারে ব্যাক্তি সব সময় তার চেতনা ও নফসের মাঝে এক ভীতির সঞ্চারন করে যে, " এটা নিসেদজ্ঞ" আমি করতে পারবনা, এভাবে এই চুরি নামী কাজ করা থেকে পলায়ন করে।

হাঁ মানুষের সর্ব প্রকার কর্ম তার অন্তর, অনুভূতির ঝোঁক থেকে বাহিরে আসে। আর ঐ ঝোঁক বা প্রবণতাসমূহ, রুহের চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা থেকে আসে। আর রুহ বা আত্মা হল সে ঈমানের নুরের সাথে কর্মপন্থা চালিয়ে যায়। ভাল কিছু হলে সে করতে আগ্রহী হয় আর মন্দ হলে সে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টার তলে টানতে কাজ করে। ফলে আরও বধির কর্ম তাহাকে অন্যায় পথে চালানোর ক্ষেত্রে বিজয়ী হতে পারেনা। মোদ্দাকথাঃ নিয়ন্ত্রনী সাজা ও শাস্তি, এলাহির হুকুমের এবং তার দেওয়া ন্যায়-বিচারের নামে প্রচলিত হওয়ার বেলায় যেমন আত্মা, তেমনি মানুষের জ্ঞান, একইভাবে অনুভূতি তার সাথে মানবের মধ্যে থাকা সমস্থ সুক্ষ ইন্দ্রিয় সমূহ প্রভাবিত ও সংশ্লিষ্ট পূর্ণ হয়। ফলশ্রুতিতে এই কথা স্পষ্ট হয় যে, পঞ্চাশ বছরে একবার হাত কাটার ন্যায় শাস্তি তুল্য আইন আমাদেরকে তোমাদের প্রতিদিনের পঞ্চাশ ব্যাক্তিকে জেলখানায় বন্দিকরন থেকে অনেক অনেক উপকারে আসচ্ছে, সাহায্য করচ্ছে। আপনাদের বিচার নামীয় পন্থায় যে শাস্তি প্রয়োগ হচ্ছে এটা কেবল আপনাদের ধারনার উপর প্রভাব বিস্তার করচ্ছে৷ কারণ কেউ চুরির ইচ্ছা পোষণ করার সময় দেশ-জাতি, লাভ-ক্ষতির বিবেচনায় তার দেমাগে শাস্তির ব্যাপারটার চাপ তার মাঝে ধারনা প্রসূত উদ্গাত হবে। নতুবা মানুষেরা যদি তার চুরির খবর জানে বড়জোর তার দিকে অসুন্দর দৃষ্টিতে থাকাবে। আর যদি সে স্বীকার করে তাহলে সর্ব উচ্চ রাষ্ট্র তাহাকে জেলে পাঠাবে ঐভাবে সে চিন্তা করে। ঠিক ঐ সময় চুর ব্যাক্তি তার ধারনার শক্তির অংশ বিশেষ প্রভাবিত হয়। অথচ নফস ও অনুভুতি থেকে বের হওয়া – বিশেষ করে চুরি করা বা বস্তুর তার প্রয়োজন ও যদি হয় –

এর পরেও এই ধারনা আইনের কারনে নফস ও অনুভুতি বিজয়ী হয়ে যায়। এরকম আরও অনেক সমস্যাবলী থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্যে এই নিয়ম আপনাদের কোন কাজে আসছে না।

ঠিক এই জায়গাতে এলাহির আদেশের মাধ্যমে বিচার না করার কারনে, এই শাস্তি পন্থাও সুবিচার নহে, আদালত নহে, ন্যায়-বিচার নহে। এটা এরকম যে অজু ছাড়া, কিবলাহীন ভাবে নামায পড়ার ন্যায় বাতিল বলে গন্য হবে, ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

এতে প্রমান হল যে, আসল ও হাকিকি ন্যায়-বিচার এবং প্রভাবকারী সাজা, শাস্তির বিধান হল; আল্লাহ্‌র হুকুমের নামে হওয়া চাই, নতুবা এর ফলাফল শততে এক % এ নেমে আসবে। সুতরাং এই আংশিক চুরির বিসয়কে, অন্যান্য সার্বিক বিষয়াদিতে এলাহির হুকুম আহকামের সাথে যুক্তি খাটান। যাতে করে এটা বুঝে আসে যে, মানব জাতীর শান্তির তরে দুনিয়াতে ন্যায়-বিচার এর সাথে প্রতিষ্টিত হয়। আর সুবিচার এটা তো হল কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে কোরআনের দেখানো ন্যায়-বিচারের পথেই কেবল হতে পারে, , ,।

এখন যদি মানুষ খুবই দ্রুত তার দেমাগকে, মস্তিস্ককে ঠিক করে বুঝে এলাহির আইনের, বিধানের, ন্যায়-বিচারের প্রতি এবং ইসলামের হাকিকাত সমূহের প্রতি ও তার দফতর সমূহে বিচার আদালতকে বিন্যাস্থ না করে তাহলে অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কেয়ামত ঘটতেই চলবে; নৈরাজ্যবাদীদের, অরাজকতার, ইয়া'জুজ-মা'জুজদের হাতে অস্ত্র সমজাতে বাদ্য হবে এমনটি-ই আমার অন্তরে এসেছে। (খুতবায়ে শামিয়া ৭৫)

ইনসাফ বা আদালত হল দুই প্রকার, এক/ মাহযি (খাটি, নির্ভেজাল বিচার) দুই/ এযাফি বা নিছবি (অনুষঙ্গী, সংযোজন বিচার) এগুলোর মাঝে মাহযির ব্যাখ্যা হল এমন যে,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

আলোচ্য আয়াতের ইঙ্গিত পূর্বক অর্থ হলঃ কোন নিরপরাধ মানুষের অধিকার, সে যদি সঠিক থাকে তাহলে সমস্থ জনগনের জন্যে তার অধিকার খর্ব করা যাবে না। সকল জনগনের শান্তি হলেও কোন ব্যাক্তির অধিকারকে বিসর্জন দেয়া, বাদ দেয়া, এটা কিছুইনা বলা যাবে না। মহান রবের রহমতের দৃষ্টিতে হক সব সময় হক-ই থাকে, কে ছোট কে বড় এটা দেখা হয় না, ছোটকে বড় কাহারও ভুলের জন্যে সাধারনভাবে দেখা যাবে না। কোন জাম'আতের সুবিদার জন্যে কোন ব্যাক্তির অসন্তুষ্ট চিত্তে তাহাকে ফাঁসিতে বা তার অধিকারকে খর্ব করা যাবে না। এখন কেউ যদি ইচ্ছে করে ক্ষমা করে দেয় বা নিজেকে বিসর্জন করে এটা আলাদা বিষয়। আবার এযাফি হল এমন যে, সকলের শান্তি, সালামতির জন্যে, একজনকে আমলে না নেয়া, গুরুত্ত না দেয়া। কোন দল বা জামআ'তের জন্যে, ব্যাক্তির অধিকারকে দৃষ্টিপাত না করা। "আহওয়ানুশ্যর" মন্দের ভাল বলে একটি সংযোজিত এযাফি বিচার আছে ঐ দিকে মোড় নেয়া, ঐ দিকে বিচার কর্ম চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু নিরেট সত্য যে মাহযি বা খাটি বিচারের ফয়সালা যেখানে করা সম্ভব সেখানে এযাফি বা আপেক্ষিক বিচারে যাওয়া অবৈধ, অন্যায়। যদি যায় তাহলে এটা পরিষ্কার জুলুম হবে। যেমন এই জন্যে হযরত আলি রাঃ সাহেবাইন্দের তথা হযরত আবু বকর ও উমরের রাঃ এর বিচার ব্যাবস্থাকে তথা মাহযি বিচার বা খাটি বিচারকে প্রয়োগ করা সম্ভব বলে তিনি ঐ ভাবে ইসলামী খেলাফতের ভিত্তি ধারন করে ন্যায়-বিচারের অগ্রধুত ছিলেন, পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তার বিপরীত যারা ছিলেন তথা মাহযি বিচারের প্রতি আপত্তির সূরে অবস্থানি এযাফি বিচার মুখী যারা ছিলেন তারা বলেছিলেন এখন ইসলামের প্রসারতা বেশী হওয়ায় অনেক সমস্যাবলীর সম্মুখীন আমরা এই বলে এযাফি বিচারের ফরমুলাকে তারা ইজতেহাদ করেছিলেন। (তারা আযিমাতকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, ইসলামী সিয়াসাতের দুনিয়ায়

নিজেদেরকে মজবুর ধারনা করে রুখসাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তাসামুহে পতিত হয়েছিলেন) আর ইতিহাস যা দেখিয়েছে এগুলো আসলে মৌলিক কারণ নহে, মাত্র বাহানা ছিল। (কারণ ইজতেহাদকারী সঠিক হলে দুই সোয়াব নাহলে এক সওয়াবের ইবাদাত, আর ভুল হলে মজবুর এমন উসুল বিবেচিত। (তাইতো আমরা বলি সাহাবাদের মধ্যকার এমন অবস্থা সমূহে যেমন কাতিল তেমনি মাকতুল উভয়ই জান্নাতি তাই তাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করনা, আমরা করিওনা))। (মাক্তুবাত ৫৩)

একদা এক বাদশাহ এমন এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল যে, তার ঔষধ ছিল একটি কিশোরের দেহের রক্ত! পরে এই কিশোরের বাবা, কিশোরকে, বিচারকের অর্ডারের মাধ্যমে টাকার বিনিময়ে বাদশাহকে দিয়ে দিল। এমন অবস্থায় বাচ্চাটি উপস্থিত মজলিসে যেখানে ক্রন্দন ও আপত্তি করার কথা সেখানে সে হাসচ্ছিল। তাহাকে জিজ্ঞেস করা হল যে, তুমি কেন সাহয্য অন্বেষণ করচ্ছনা, তোমার রক্ত এখন খুলে ফেলা হবে তুমি মারা যাবে কেন কোন আপত্তি জানাচ্ছনা, আমরা তুমাকে হাসতে-ই দেখতে পাচ্ছি? বাচ্চাটি তখন বলেছিল যে, মানুষ যখন বিপদে পতিত হয়; প্রথমে সে তার বাবার কাছে যায়, পরে আদালতের বিচারকের কাছে যায়, এর পরে বাদশাহর কাছে নিজের আপত্তি তুলে ধরে। আর আমার অবস্থা আলাদা, কারণ আমি বাবার কাছে কীভাবে যাব বাবা নিজেই-ত আমাকে কাটার জন্যে বিক্রি করে দিচ্ছে; সাথে বিচারক ও আমার মৃত্যুর জন্যে ফয়সালা দিচ্ছে; আবার অন্য দিকে বাদশাহ সে নিজের রোগ মুক্তির জন্যে আমার দেহের রক্ত চাচ্ছে, , , , , , , , , এই আকস্মিক ও অনাকাংখ্যিত এবং এই চিত্রের সীমাহীন অন্যায় ও জুলুমের নোংরা, কলুষিত যা পূর্বে কক্ষনও কেউ দেখেনি এমন বিপদের সম্মুখে যেখানে যারা আদালত ইনসাফ করার কথা তারাই জুলুম করচ্ছে এমন অবস্থায় বড়জোর হাসি ছাড়া আর কি দিয়ে প্রতিবাদ করা যায়। (জীবনী ২৩৮)

একই ভাবে যেমন এলাহীর নির্ধারিত ভাগ্য যা পরিনাম ও ফলসমূহের বিবেচনায় খারাপ ও মন্দ থেকে পবিত্র। ঐভাবেও কারণ ও মাধ্যম এর দৃষ্টিতেও অত্যাচার এবং বীভৎসতা থেকে পবিত্র। কারণ হল ভাগ্য মৌলিক কারণসমূহকে দৃষ্টিপাত করে। এভাবে বিচার করে। কিন্তু মানুষগন, বাহ্যিক দর্শনীয় কারণ সমূহকে নির্দেশনাতে ভিত্তি স্থাপন করে করে চিন্তা করে। ভাগ্যের ক্ষেত্রে একই বিচারের তরে অত্যাচারে নিমজ্জিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বিচারক তোমাকে চুরির অপরাধে হুকুম প্রদান করত জেলখানায় পাঠিয়েছে। অথচ তুমি চুরি কর নাই। কিন্তু কেউই জানে না তোমার গোপন এক হত্যা করার অপরাধ রয়েছে। তাই কদরে-ইলাহীও তোমাকে ঐ জেলে যাওয়ার ব্যাপারের সাথে হুকুম দিয়েছে। কিন্তু ভাগ্য তোমার ঐ গোপন হত্যার উপর হুকুম হিসেবে বিচার করেছে। যদিও বিচারক (মানুষ) তোমাকে চুরির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অথচ তুমি দৃশ্যত চুরির ব্যাপারে নিরপরাধ। সুতরাং একটি বস্তুতে দুটি দৃষ্টি-কোণের সাথে ভাগ্য ও এলাহীর সৃষ্টির বিচারালয় এবং মানব ব্যবহৃত, জুলুমকে দেখার ন্যায় অন্যান্য বস্তুসমূহ এটাকে তুলনাকৃত যুক্তি খাঠাও। অর্থাৎ ভাগ্য ও এলাহির সৃষ্টি, যা শুরূ ও শেষ, মূল ও কৃত্রিম, কারণ ও পরিণতি সমূহের বিবেচনার দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতা, অকল্যাণ, এবং জুলুম থেকে পরিচ্ছন্ন পবিত্র। (সোজলার ৪৬৪)

আরেকটি উদাহারন যেমনঃ কোন ন্যায়-বিচারক, হকের মাধ্যমে বিচার করা তার পছন্দনীয় কাজ এবং এমন সুবিচারে তিনি আনন্দ পান এমন কোন বিচারক, যিনি মাজলুমদের হক সমূহকে আদায় কল্লে তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা, খুশিতে শান্তি পান এবং যারা জুলুম করে তাদেরকে সাজা ও শাস্তি দিয়ে অত্যাচারিত ব্যাক্তিদের বদলা নিয়ে যেভাবে উৎফুল্ল হয়ে থাকেন, এমন বিচার থেকে এক প্রকার স্বাদ ভোগ করেন। ঠিক ঐ ভাবে মহান হাকিমে-মুতলাক, আদিলে-বিল-হাক এবং কাহহারে যুল-জালাল তিনি শুধুমাত্র মানুষ বা জিনদের ক্ষেত্রে নহেন, বরং সমগ্র সৃষ্টিকুলের ক্ষেত্রে হকের মাধ্যমে হক প্রদানের বিচার, অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের বিচারে এবং জীবন যাপনের অধিকারের বিচারে হকের

মাধ্যমে বিচার করে অস্থিত্ত ও জীবনের প্রতি আক্রমনকারী, অত্যাচারি থেকে তাহাদের হেফাজত করে এবং এমন ভয়াবহ আক্রমনকে ধমিয়ে রেখে আর যেন কেউ এমন অত্যাচার কাউকে করতে না পারে, বিশেষ করে হাসরের ময়দানে ও পরকালীন জগতে মানুষ ও জীনদের বিচারের আদালত থেকে অন্যান্য সকল প্রাণীদের সম্মুখে যে বিচার কার্যক্রম তিনি করবেন যুক্তি খাটালে ন্যায়-বিচারের চিত্র বুঝতে অসুবিদা হওয়ার কথা নহে। (সোজলার ৬২৪)

হে রাষ্ট্রের উচ্চ মাকামে আধিষ্টিত সুলতান, রাষ্ট্র প্রধানগণ! যদি পরিপূর্ণ ন্যায়-বিচার করতে চাও; তাহলে হযরত সুলায়মান আঃ এর ন্যায় (এক অর্থে তাকওয়া, ইলিম, টেকনোলোজি হতে পারে, কারণ দূরবর্তী স্থলে থাকা কিছুকে, কিতাবের ইলিম (ইসমে-আযম) দিয়ে হুবহু বা আকৃতিগত ভাবে সামনে নিয়ে আসা প্রমাণিত এটা সম্ভব, সুলায়মান আঃ এর একজন মানুষ উজির বা লেখক (আসিফ) চুখের পলকে বিল্কিসের তাখত এনে দেখিয়েছিলেন অনুঃ), স্বীয় দেশের, দুনিয়ার সকল দিক কে দেখতে ও বুঝতে চেষ্টা করুন। কারণ হল; একজন ন্যায়-বিচারক, জনগনের জন্যে আন্তরিক, পাগলপাড়া একজন বাদশাহ; রাষ্ট্রের যেকোন অঞ্চলের, যেকোন ব্যাপারে ইচ্ছা পোষণের বেলায় অবহিত, অবগত হওয়ার ক্ষমতা অর্জনের সাথে আধ্যাত্মিক দায়িত্তভার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে এমনকি পূর্ণভাবে আদালত, ইনসাফ, ন্যায়-বিচার করতে পারবে। মহান রব শূরা নমলের ৪০ নং আয়াতের মোহরাঙ্কিত ভাষায় বলছেন যে, হে বনি আদম! কোন নাগরিকের, কোন বান্দার প্রতি বিস্তৃত কোন রাষ্ট্রে ও এই রাষ্ট্রের মধ্যে যদি পরিপূর্ণ আদালত করতে চাও; তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতির এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাবলীকে আমি শিক্ষা স্বরূপ তোমাদের সামনে রাখছি এমনকি যেহেতু প্রত্যেক মানুষকে আমি এই দুনিয়াতে প্রাকৃতিক ভাবে, সৃষ্টিগতভাবে একজন খলিফা হওয়ার যোগ্যতা দান করেছি। তাহলে এটা বুঝে নেও যে এই তোমাদের দেওয়া যোগ্যতা জমিনের মাধ্যে ব্যাবহার পৃথিবীকে দেখানো, দেখা, বুঝা এগুলো সবকটি আমার হিকমতের দাবি স্বরূপ। এখন যদি কেউ ব্যাক্তিগত ভাবে ঐ লেভেলে পৌছাতে নাও পারে শ্রেণীগত ভাবে মানুষ ঐ পর্যায়কে স্পর্শ করতে পারবে। অর্থনৈতিকভাবে, বস্তুগতভাবে যদি অগ্রগতি করতে নাও পারে কিন্তু অলি সত্তাদের উন্নতির ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত হতে পারবে। অতএব, তুমরা আমার দেওয়া এই সুবিশাল নেয়ামত থেকে উপকার, ফায়দা অর্জন করতে পার। এখন দেখি তুমরা ইবাদাতের অযিফাকে না ভুলার শর্তে এমন ভাবে কাজ করে যাও যে, পৃথিবীর উপরে, সব দিকে সকলের দেখতে পাওয়া, সর্ব কোণে সকলের আহ্বানের ডাকে সাড়া দিয়ে সুন্দর একটি বাগাণে এই দুনিয়াকে রুপান্তর কর। (সোজলার ২৫৭)

বিখ্যাত মুসাফির ও ঐতিহাসিক আউলিয়া চেলেবি, তার মুসাফিরনামা কিতাবে লিখেছেন যে, সর্ব প্রথম যিনি ইস্তানবুলের কাজি বা বিচারক ছিলেন জনাব খিজির ভাই চেলেবির সম্মুখে, চূড়ান্ত জমকালো ক্ষমতাবান বাদশাহ ফাতিহ মোহাম্মাদ সুলতান ও এক ইঞ্জিনিয়ারের মাঝে একটি সমস্যার মামলা এভাবে আঞ্জাম দিচ্ছিলেন যে, বর মাপের একটি স্মৃতি-ভাস্কর্য এর খুঁটি সহ সৌধ তৈরি করবে এমন মূল্যবান পাথরের খুঁটি একজন রোম রাজমিস্ত্রি ইঞ্জিনিয়ারকে তিনি দায়িত্ত দিলেন। আর ঐ ইঞ্জিনিয়ার বাদশাহ ফাতিহের ইচ্ছার বিপরীত এই মহামূল্যবান পাথরের খুঁটিকে কাটছাঁট করে নিয়ম অনুযায়ী সে চুড়ার অংসকে ছোট করল। পরে বাদশাহ তার বিপরীত ইচ্ছার অনুসরণের কারনে শাস্তি স্বরূপ তার হাত কেটে দিলেন। পরবর্তীতে ঐ রোমান ইঞ্জিনিয়ার বাদশাহর বিরুদ্দে মামলা দায়ের করলে, এই মামলার বিচারের দিন মহান বাদশাহ ফাতিহ সিংহাসনের এক কুনে বসতে চেয়েছিলেন। হটাৎ, মহান বিচারক জনাব খিজিরের বিচার কার্যালয়ের নিয়ম মাফিক বিবাদী বাদশাহ ফাতিহের দিকে আওয়াজ আসল যে,

আপনি এখন বসবেন না জনাব! আপনার ব্যাপারে আপত্তিকারী আপনার দুশমনের সাথে ইসলামী শরীয়তের কর্ম ও বিধান পন্থায় এখন আপনি বিচারের সম্মুখীন হবেন; দাড়িয়ে থাকুন!

খিজির ভাই চেলেবি; যিনি বিচারক হিসেবে বিবাদী শাহানশাহ সুমহান বাদশাহ ফাতিহ বাদী রোমান ইঞ্জিনিয়ারের হাত সন্দেহ-ভুলে কর্তন করার কারনে ইসলামী আইনের কেসাস স্বরূপ বাদশাহর হাত কাটা হবে এই ফয়সালা জানালেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার কেসাস বিধান না চাওয়ার কারনে, মহান বাদশাহ ঐ লক্তিকে দিনে দশটি স্বর্ণের টুকরা দেওয়ার তাযমিনাতের ফয়সালা হয়; এমনকি ইঞ্জিনিয়ার কেসাস না চাওয়ার কারনে বাদশাহ তাহাকে বিশটি স্বর্ণ মুদ্রার প্রতিদান দান করেন।

এটা হচ্ছে ইসলামী আদালতের মামলা সমূহের পরিচ্ছন্নতা ও হক আদায়ের বিচার ও বিচারকের সুমহান ন্যায়-বিচারের, ইনসাফের একটি যিন্দা ও জাগ্রত উদাহারন, যা আমাদেরকে প্রদর্শন করছে সর্ব উচ্চ মাকামে যিনি থাকেন আর সর্ব নিম্নে যে থাকে ইসলামী আদালতের আইন কানুনের কাছে সবাই সমান। (ইসারাতুল ই'জায ২২৫)

একবার হযরত আলী রা: এক কাফিরকে নিচে ফেলে হত্যা করতে তলোয়ার ও বের করে নিয়েছিলেন কিন্তু ঐ কাফির লোকটি হযরত আলী রা: এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করিলে তিনি তাহাকে হত্যা করা থেকে বিরত রহিলেন। কাফির লোকটি জিজ্ঞেস করল কেন আমাকে হত্যা করচ্ছ না হে আলী ? তখন হযরত আলী উত্তরে বলেছিলেন আমি তোমাকে প্রথমে আল্লাহর জন্যে, তার ভালবাসার খাতিরে হত্যা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু থুথু নিক্ষেপ করার পর আমি ভীষণ রাগান্বিত হলাম আর আমি ভাবলাম এখন যদি তোমাকে হত্যা করি তাহলে আমার রাগের অংশবিশেষ তোমার হত্যার সাথে জড়িত হয়ে যাবে যা আমাদের দ্বীনে নিষিদ্ধ। তখন ঐ কাফির বলল যে আমি থুথু নিক্ষেপ করে আমাকে তাড়াতাড়ি হত্যা করতে তোমাকে ক্রদান্নিত করেছিলাম । আর যাই হোক তোমাদের দ্বীন ঐ পরিমাণ খালিছ ও বিশুদ্দ তাহলে অবশ্যই তোমাদের দ্বীন হাক্বিক্বি ও আসল দ্বীন। হে ঈমানদারগণ, অপদস্থার ভিতরে, গোলামীর নিয়ন্ত্রণে যদি প্রবেশ করতে না চাও তাহলে স্বীয় বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগাও আর তোমাদের মতভেদের কারণে জালিমরা যে সুযোগ নিচ্ছে ঠিক তাহাদের বিপরীতে اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ

মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। হুজরাত-১০

উক্ত আয়াতের দ্বারা পবিত্র মহান প্রাসাদে প্রবেশ কর এবং স্বীয় দেশ জাতি সত্ত্বাকে রক্ষা করার হেকমত অর্জন কর। তা নাহলে নিজেকে ও হেফাজত করতে পারবে না অধিকারসমূহ ও রক্ষা করতে পারবে না। এটা জানা বিষয় যে, দুই নায়ক যদি (কুস্তিগীর) একে অপরের, সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তাহলে তাদের দুজনকেই ছোট্ট একটি শিশুর জন্যে হত্যা করা কোন ব্যাপার নহে। আবার দেখ, যদি দাড়িপাল্লায় দুই পাহাড় ও একে অপরকে তাদের ওজন দেখাতে প্রতিযোগিতায় নামে তাহলে তাদের পেটে থাকা ছোট্ট একটা পাথর যথেষ্ট তাদের ওজনের অহংকার নষ্ট করে তাদের নিয়ে খেলা করতে পারে যে দিকে যে বসবে তার বিপরীত পাহাড়ের ওজন কম দেখাবে।

সুতরাং হে মু'মীনগণ! স্বীয় লোভ থেকে এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ একগুয়েমী থেকে কোন লাভতো নেই পাশাপাশি কিছুই থাকবে না তোমার সব নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তোমার সামাজিক হায়াতের সাথে সম্পর্ক থাকে তাহলে আলোচ্য হাদীসকে,

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্যে ইমারত স্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। (বুখারি, নামাজ-৮৮/ মুসলিম- বির-৬৫)

মহামূল্যবান এই সংকেতকে নিজের জীবনের সংববিধান মনে কর ও প্রতিষ্ঠত কর। এই দুনিয়ার পেরেশানী ও অশান্তি থেকে নিজেকে বাচাতে পারবে। (মাক্তুবাত ২৬৯)

কিছু প্রশ্নের উত্তর

১- দ্বীনের খেদমতের মাপকাটি কেমন হওয়া উচিৎ?

ভিত্তি স্বরূপ কয়েকটি নিয়ম শ্রবণ করো;

প্রথমটি হল = তুমি তোমার সাথে সংযুক্ত বিষয় ও তোমার চিন্তা চেতনা কে যখন সত্য বা হক হিসেবে সাব্যস্থ কর: তখন তোমার একথা বলার অধিকার রয়েছে যে, আমার পথ ও চিন্তা সঠিক এবং অন্যের তুলনায় সুন্দর। কিন্তু মোটেও একথা বলার অধিকার তোমার নাই যে, কেবল আমার পথই সঠিক বাকীদের পথ বাতিল।

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ * وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِى الْمَسَاوِيَا

(দেওয়ানে ইমাম শাফি-৯১)

উক্ত পংক্তির দ্বারা পরিষ্কার যে, বিবেকহীন দৃষ্টি ও নিম্নশ্রেণীর চিন্তা কখনও হাকিম হতে পারে না এমনিতে অন্যের পথকে বাতিল পথ বলে সিদ্ধান্তও নিতে পারে না।

দ্বিতীয়টি হল = তোমার গবেষণায় হক্ব হল ঐ জিনিস যে, আমি যা যা বলব সবকিছু সঠিক হতে হবে। আর এই চেষ্টা করা উত্তম। কিন্তু সবকিছু সঠিক বা সত্য তোমার বলার অধিকারই নেই। তোমার সকল কথা যেন অবশ্যই সঠিক হয় কিন্তু এটাও সত্য যে সকল সত্যকে বলতে পারা বা বলা সত্য নহে। (যা শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট) ভাগ্যের কি পরিহাস তোমার মত এখলাছ বিহীন মানব উপদেশকে মাঝে মাঝে রক্তপাতের সঙ্গী করে এবং বিপরীত কাজ করে।

তৃতীয়টি হল = যদি সাহস, সামর্থ্য থাকে তাহলে শত্রুতামী নিজের অন্তরের সাথে কর, এটাকে সমুন্নত করতে কাজ কর। এমনকি তোমার সবচাইতে বড় দুশমন ও ক্ষতিকারক নফসে-আম্মারা ও তার খাম-খাহেশাতের সাথে তুমি দুশমনী কর। এটাকে বিশুদ্ধ করতে কাজ কর। এই যন্ত্রণায় বিদ্ধ অন্তরের খাতিরে কোন মু'মীনের অন্তরকেও কষ্ট দিও না। আবার ও বলছি তুমি যদি কারো সাথে দুশমনী করতে চাও তাহলে কাফিরগণ অনেক রয়েছে, বেদীনরা বে-সুমার আছে তাদের সাথে শত্রুতামী কর। হ্যাঁ, ঐটা কর যেমনটি মুহাব্বত গুনটি মুহাব্বতের উপযুক্ত। তেমনি শত্রুতার ন্যায় অভ্যাস প্রথমে নিজের জন্যে যেটা উপযুক্ত। যদি তুমি ঝগড়াতে জয়ী হতে চাও তাহলে অনিষ্টতার মুখামুখী অনিষ্টতা দিয়ে নহে উত্তম আচরণ দিয়ে তার প্রতিবাদ কর।

কারণ যদি তুমি মন্দের দ্বারা প্রতিবাদ কর, তাহলে ঝগড়া আরও বাড়বে ও মজবুত হতে থাকবে । (দুটি অনিষ্টতার প্রতিষ্ঠা হয়) প্রত্যক্ষভাবে যদি ও দেখতে মনে হয় মন্দতার ফল সুন্দর কিন্তু প্ররোক্ষভাবে ঘৃন্যতা, অনিষ্টতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন শত্রুতা নীরবে চলতে থাকে। অন্য দিকে যদি তুমি উৎকৃষ্টতার দ্বারা মুকাবেলা কর তাহলে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হয় এবং এখানে বন্ধুত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে। إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكْتَهُ * وَ إِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا

(মুতানাব্বি, দেওয়ানে তাইয়েব-৩৮৬)

অবেদিত পংক্তিটিতে বুঝানো হয়েছে যে,

একজন মু'মীনের শান হচ্ছে মর্যাদাবান হওয়া। তোমার প্রদত্ত সম্মান আবার ঘুরে ফিরে তোমারই নিয়ন্ত্রণে থাকবে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি যদিও অপদস্থতাকে প্রদর্শন করে কিন্তু ঈমানের দৃষ্টিতে এটা সম্মানের ও মর্যাদার। হাঁ উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি যে মন্দ চরিত্রের, তাহাকে যদি বার বার বলা হয় "তুমি ভাল, তুমি ভাল তাহলে প্ররোক্ষতার দৃষ্টিতে কিছু পরে হলেও এর প্রভাবে লোকটি ভাল হতে চলবে। কিন্তু অন্যদিকে ভালোলোককে যদি শুধু বলা হতে থাকে তুমি খারাপ, তুমি পাপী" ঐ সময় তার উপর মন্দের প্রভাব পড়তে থাকে। এর পরিস্থিতি যখন এমন হয় তখন ক্বোরআনের আয়াতে দিকে দৃষ্টি দাও وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়,তখন মান রক্ষারথে ভদ্রভাবে চলে যায়। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (ফুরক্বান-৭২) (তাগাবুন-১৪)

এরকম অনেক আয়াতসমূহে কর্ণপাত করলেই তুমি বুঝতে পারবে সফলতা ও শান্তি সম্মান প্রদানের উৎস।" (মাক্তুবাত ২৬৫)

২- যদি প্রশ্ন কর যে, হাদীস শরীফে উল্লেখিত হাদীস

اِخْتِلَافُ أُمَّتِى رَحْمَةٌ

(কুরতুবি, জামেউল আহকামুল কুরান-৪/১৫৯)

যখন ইখতেলাফ রহমত তখন তো এমনিতেই একতরফামী অবশ্যক হয়। আর এই পক্ষপাতিত্ব রোগটি যা অনেক সময় অত্যাচারিত জনগনকে অত্যাচারী জালিমের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। কেননা, যদি কোন গোত্রের বা গ্রামের অতিরঞ্জিত ব্যক্তিরা তাদের গ্রামের গরীবদের বিরূদ্ধে ঐক্যমতে পৌছে তখন খুবই সহজভাবে তারা মজলুম গ্রামবাসীকে দমন করতে পিষে ফেলতে পারবে। আর এখানে যদি পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকে তাহলে সাধারণ জনগন এক পক্ষে দাড়াতে সক্ষম হবে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে। এমনকি ভিন্নমুখী মতাদর্শ ও মতভেদপূর্ণ বুদ্ধিমানদের মধ্য থেকে সত্যটা, বাস্তবটা ও স্পষ্ট হয়ে আসবে যে, সঠিক কে বা কারা ছিল।

উত্তরঃ প্রথম প্রশ্নে আমরা বলব যে, হাদিসের যে মতভেদ উল্লেখ হয়েছে এটা দলিলের সাথে সংশ্লিষ্ট হাঁ-বোদক এখতেলাফ। অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বীয় মতবাদের ও আদর্শের সুন্দর্য তুলে ধরতে দলিলের সাথে চেষ্টা করে । অন্যের প্রতি খারাবী বা অন্যেরটাকে বাতিল করার জন্যে নহে হয়তোবা পূর্ণতা বা বিশুদ্ধতার জন্যে কাজ করে। এটা হল হাঁ-বোধক কাজের নমুনা।

কিন্তু যদি না-বোদক (মানফী) কাজের মনোভাব নিয়ে আশ্বাস দেয় তাহলে তো দুশমনী ও হিংসাপরায়নতা এবং একে অন্যকে বিনাশ করতে কাজ করে যাবে এটাতো উল্লেখিত হাদীসের দৃষ্টিতে অনুমূদীত নহে। কেননা

একে অন্যকে ধ্বংস ও ঝগড়ায় লিপ্তকারী ভাল কাজে উদ্ভদ্য করতে পারে না। দ্বিতীয় প্রশ্নাংশের জন্যে আমরা বলি যে,

যদি পক্ষপাতিতা হক্কের রক্ষার জন্যে হয় তাহলে হক্বপন্থীদের আশার আলো হতে পারে। কিন্তু এখনকার ন্যায় বিদ্বেষপূর্ণযুগ, মনের মনোবাসনা পূর্ণকারী পক্ষাপাতিত্ব বে হক্ব (অন্যায়কারী) দের জন্য আশার আলো হবে ঐ রকম যে, তাদেরকে তাদের হজম শক্তি বাড়াতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। কেননা যদি দুশমনী করার ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছে শয়তান আসে আর শয়তান তার চিন্তাচেতনাকে সাহায্য করে পক্ষপাতিত্ব যদি তাহাকে দেখায় ও বুঝায় এটা সঠিক তাহলে ঐ ব্যক্তি তখন শয়তানকে ও তার অনুকরণীয়তাকে রহমত মনে করবে। আবার ঠিক বিপরীত ফেরেসতার ন্যায় কোন লোক এসে যদি বলে যে, এমনটি নিষিদ্ধ কাজ, তখন কোন সন্দেহ নেই তাহাকে লা-নাত প্রদান করতঃ অপদস্থতার স্থরে সন্দেহ পথকে সুন্দর হিসেবে প্রদর্শন করবে তথা শয়তানকে অগ্রাধিকার দিবে। তৃতীয় প্রশ্নাংশে আমরা বলি যে, হক্কের নামে হাক্বিক্বাতের আলোকে হওয়া ফিকিরের দুশমনী যদি হয় তাহলে, মাকসাদ এবং ভিত্তির পাশাপাশি তার মাধ্যম সমূহেও মতভেদ সৃষ্টি হয়। হাক্বিক্বাতের সকল দিকে মহত্যতা প্রকাশ করতঃ হক্ব ও হাক্বিক্বাতের জন্যে খেদমত করে, এটা গ্রহণীয়। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব ও হিংসাপরায়ণতায় যে নফসে-আম্মারা ফেরাউনের বন্ধু হয়ে গিয়েছে তার আলোকে চিন্তা করলে কেবল যা ইচ্ছা তাহাই করবে মনোরঞ্জনের প্রতি আগ্রহী হওয়ার এক নিয়মে ফিকিরের দুশমনীতে থেকে হাকিকাতের সৌন্দর্যের মধ্যে নহে বরং ফিতনার অগ্নিশালা বের করা ছাড়া আর কিছু বের হবে না। কেননা যখন মাকসাদের ঐক্য প্রয়োজন দেখা দেয় তখন ঐ জাতীয় ফিকিরসমূহ দুনিয়াতেও শান্তির চিহ্ন পাওয়া অসম্ভব। হক্কের নামে না হওয়ার কারণে অসীম জটিলতায় প্রবেশ করে। সুস্থতার ন্যায় উপযুক্ততার অনুপস্থিতির কারণ সমূহ বিভেদের দিকে প্রকাশ পায়। এই সবকিছুর জন্যে দুনিয়াটাই সাক্ষী স্বরূপ হয়ে জমে আছে। (মাক্তুবাত ২৬৮)

৩- আপনি সব সময় মাস'আলা বুঝাতে উপমা ব্যাবহার করেন কেন?

অথচ ইসলামি হুকুমের ব্যাখ্যার দৃষ্টিতে ইলমে মানতিকের তথা যুক্তি বিদ্যার জ্ঞানানুসারে উপমা তুল্য যুক্তি যা মাস'আলার নৈকট্যতার কোন উপকারে আসেনা। মাস'আলার পূর্ণ নৈকট্যতার জন্যে অকাট্য দলিলের যুক্তি প্রয়োজন হয়। আর ফিকাহবিদগণের পরিভাষায় সর্ব উচ্চ ধারনার ব্যাবহার প্রয়োজনে কেবল হয়ে থাকে। শুধু তাই নহে আপনি কাহিনি ও বলে ব্যাখ্যা করে। কাহিনি তো কল্পনা সুলভ হয়' বাস্তবতার সাথে কোন মিল নেই। অনেক সময় বিপরীত হয়?

ইলমে মানতিকের ভাষায় উপমা তুল্যতা মূল বিষয়ের নৈকট্যতা প্রদান করেনা। তবে উপমা তুল্যের একটি প্রকার আছে যে, যা মানতিকের দলিলের চেয়ে শক্তিশালী হয়। এবং মানতিকের প্রথম ধাপের থেকে আরও নিকটবর্তী হয় এটা। এই প্রকার হল এটা যে, একটি আংশিক তুলনীয় উপমার দ্বারা সার্বিকতার মৌলিকতার চুড়াকে দেখিয়ে দিয়ে, তার হুকুমটাকে ঐ মৌলিক বিষয়ের উপর ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই হাকিকাতের নীতিমালাকে, একটি বিশেষ বস্তুতে দেখাতে সক্ষম হয়। যাতে করে ঐ মহান মাস'আলার আসল বিসয়কে বিঝতে সহজ হয়, এবং আংশিক, উপস্থিত উপমাটি যেন তার দিকে রুপ নিয়ে জ্ঞান অর্জন হয়। যেমন- " সূর্য তার আলোর ক্ষেত্রে একক উপাদান হওয়া স্বত্বেও তার আলোর মাধ্যমে; প্রত্যাকটি বস্তু যেগুলো চকচক করে দেখতে দেখবেন সব কটিতে সূর্য বিদ্দমান"। এখন এমন উদাহারনের দ্বারা এমন এক মৌলিক নিয়মকে প্রদর্শন করে যে মোটেও বলা হবে না এই বস্তুর মধ্যে সূর্য বিদ্দমান, তার আলো বা কিরণ

বস্তর সাথে সাময়িক সংশ্লিষ্ট। এমন অবস্থায় নিকট ও দূর এক হয়ে যায়, অল্প ও বেশী এর দুরত্ত যেন সমান। দেখতে গেলেও আসল সূর্য তার মধ্যে স্থান স্বরূপ উপস্থিত নহে কেবল আলো উপস্থিত।

আবার দেখুন যেমন- " বৃক্ষের ফল সমূহকে, তার পাতা সমূহকে; এক মুহূর্তে, একই পন্থায় সাবলীলভাবে এবং সুক্ষ-পূর্ণ পরিহিতভাবে একই স্থানে তথা বৃক্ষে এক মহান হুকুমের অর্ডারে তার রুপায়ন, নকশাকরণ করা হয়েছে" এটাও এক তুলনা যে, হা সমুজ্জ্বল এক হাকিকাতের এবং সার্বজনীন এক নিয়মের চুড়াকে প্রদর্শন করছে। ফলে এই হাকিকাত ও তার নীতিমালাকে এমন ভাবে উপস্থাপন করছে যে, এই বিশাল কায়েনাত ও এই বৃক্ষের ন্যায় ঐ সুক্ষ হাকিকাতের বাস্থবতার নীতি-পন্থাকে, এখানে গুপন থাকা একত্তবাদের রহস্যকে প্রকার করে দিচ্ছে, এ যেন একটি ঘূর্ণায়নের ময়দান স্বরূপ। সুতরাং বানী নামীয় কিতাবের সমস্থ উপমা তুল্য দৃষ্টান্ত সমূহ এই প্রকার থেকে যে, যা অকাট্য দলীলের মানতিকের থেকে আরও শক্তিশালী, আরও মাস'আলা বুঝার ক্ষেত্রে নিকটবর্তী। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর হল, জানা কথা যে , অলঙ্কার শাস্ত্রের বিদ্যায়- কোন শব্দের, কোন বাক্যের মৌলিক অর্থটা, অন্য কোন অর্থের উদ্যেশ্য নেওয়াটা যদি কেবল গবেষণার মাধ্যম হয় তখন এমন পরিভাষাকে "লাফযে- কেনায়া" ইঙ্গিতপূর্বক শব্দ বলা হয়। এবং কেনায়াকে বিবেচনায় আনা তুল্য কোন বাক্যের আসল অর্থটা, সত্য বা মিথ্যার মাপকাটি হিসেবে দেওয়া হয় না। বরং আসল অর্থ নহে, ইঙ্গিতের অর্থটাই সত্য বা মিথ্যার দিকে সম্পর্কিত হয়। এখন যদি ঐ ইঙ্গিত পূর্ণ অর্থটা সত্য হয়ে থাকে; তাহলে ঐ বাক্যটা সত্য বিবেচিত হবে। তার আসল অর্থটা যদি মিথ্যাও হয় কিন্তু তার সত্যতাকে নষ্ট করবে না। আবার যদি ইঙ্গিতের অর্থটা মিথ্যে হয়; আর আসল অর্থটা সত্য হয় তাহলে ঐ কথা বা বাক্যটা মথ্যেবাদী হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন একটি কেনায়া উদাহারন হল- (ফুলানুন তাওইলুন নাজাদ) অর্থাৎ তার তলোয়ারের হাতা, বাঁধন অনেক লম্বা। এই কথার মানে হল, ঐ ব্যাক্তির কেনায়ি অর্থ হল তার উচ্চতা অনেক বেশী। এখন যদি এই লোকটি লম্বা হয়ে থাকে আর তার কোন তলোয়ার বা হাতা বা বাঁধন যদি নাই থাকে তার পর ও ঐ কথাটি সত্য, সঠিক। আবার ঐ লোকটির উচ্চতা যদি না থাকে খাটো হয়; আর তার তলোয়ার থাকে হাতা থাকে বা বাঁধন থাকে তারপরও এই কথা মিথ্যে। তার কারণ এখানে আসল অর্থটা নেয়া উদ্যেশ্য নহে। যাইহোক, দশম বানী ও বিশতম বানী এর ঘটনাবলীর ন্যায়, অন্যান্য বানী সমূহের হেকায়া সমূহ যেগুলো এই ইঙ্গিত-প্রবণ বা কেনায়া এর আওতাভুক্ত যে, চূড়ান্ত পর্যায়ের ও অতি সত্য এবং অবস্থার প্রেক্ষাপট ধারি হওয়া এই ঘটনাবলী এর বাস্থবতার নিরিখে এগুলোর হাকিকাত সমূহ, ইঙ্গিত মূলক অর্থে ব্যাবহার হয়েছে। কোন মাস'আলার কোন আসল অর্থকে বুঝানোর ক্ষেত্রে উপমা দূরবীন এর মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যেভাবেই হোক না কেন সত্যকে বা মৌলিক হাকিকাতের কোন ক্ষতি করবে না ও করছে না। প্রত্যেকটি হেকায়া একেকটি উদাহারন স্বরূপ। শুধু মাত্র জনসাধারণের বুঝতে সহজ হওয়ার লক্ষে মুক্তাযায়ে হাল তথা উপস্থিত সাবলীল ভাষায় ইহা প্রকাশ করা হয়েছে। (সোজলার ৬১৫)

৪- শয়তানদের বানানো বা সৃষ্টি করার হেকমত কি? মহান রব তিনি শয়তান ও মন্দকে সৃষ্টি করেছেন? মন্দের সৃষ্টি করা মন্দ, অনিষ্টের সৃষ্টি মানে হল অনিষ্টতার কাজ নহে কি ?

অসম্ভব! কস্মীন কালেও নহে, , , মন্দের সৃষ্টি মন্দ নহে, বরং মন্দের অর্জন করা হল মন্দ কাজ। তার কারন হল; অস্তিত্ত প্রদান ও সৃষ্টির সম্পর্ক হল তার সকল ফলাফলের সাথে; আর কোন কিছুর অর্জন করাটা বিশেষ এক সংস্পর্শ হওয়ার কারনে বিশেষ ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করে। যেমন- বৃষ্টির আসার সাথে হাজার হাজার ফলাফলের সম্পর্ক রয়েছে; এর সব কটই উপকারী ও ভাল। এখন যদি মন্দ ইচ্ছার দ্বারা কেহ কেহ এই বৃষ্টি থেকে ক্ষতি দেখতে পায় তার পরও সে বলতে পারবে না যে ~ বৃষ্টির সৃষ্টি বা পাঠানো এটা কোন রহমত নহে~ সে বলতে পারবেনা যে বৃষ্টির সৃষ্টি খারাপ

একটি কাজ। এখন এমনটি যদি কেউ বলে তাহলে এটা তার নিয়তের বা অর্জনের ত্রুটির কারনে বলছে। একই ভাবে আগুনের সৃষ্টির মাঝে সীমাহীন উপকার রয়েছে; হাকিকাতের দৃষ্টিতে উপকার আর উপকার প্রমাণিত। কিন্তু কেউ যদি তাহাকে মন্দ নিয়তে ব্যাবহার করে পরে আগুনের থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে ~ আগুনের সৃষ্টি মন্দ কাজ~ এমনটি সে বলতে পারে না। তার কারণ আগুনকে শুধু তাহাকে জ্বালানোর জন্যে সৃষ্টি করা হয় নাই। বরং সে খাবার তৈরি করতে গিয়ে বা মন্দের নিয়তে আগুন কে ব্যাবহার করার ফলে আগুন তার কাজ চালিয়ে গিয়েছে। মোটকথাঃ বেশীর ভাগ ভাল ফলাফলের জন্যে কিঞ্চিৎ মন্দকে গ্রহণ করা যায়। এখন যদি বেশীর ভাগ মন্দ থেকে বাঁচার লক্ষে, বেশীর ভাগ ভাল কাজের মাধ্যম হয় এমন অল্প মন্দকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়; তাহলে ঐ সময় ভাল কাজ বেশী না পাওয়ার ধরুন মন্দের খারাপিটা প্রাধান্য পেয়ে বিজয়ী হয়ে যাবে। যেমন- জিহাদের ময়দানে সৈন্যদের ক্ষেত্রে তাদের আংশিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই ক্ষতির মধ্যে জিহাদের ময়দানে এত বেশী উপকার রয়েছে যে, এর মাধ্যমে ইসলামকে কাফিরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা হয়। এখন যদি ঐ অল্প ক্ষতির কারনে জিহাদকে তরক করা হয় তাহলে ঐ সময় বেশীর ভাগ ফায়দা চলে যাওয়ার সাথে বেশীর ভাগ ক্ষতি চলে আসাটা স্বাভাবিক। এটা ও তো আবার একই জুলুম। আরেকটি উদাহারন যেমন- আঙ্গুলের মাঝে জ্বর হয়েছে এমন ক্ষতিকর রুগের থেকে বাঁচার উপায় হল ঐ আঙ্গুলের আংশিক কেটে ফেলা, এটাই তার জন্যে উপকারী, অথচ বাহ্যিক ভাবে দেখতে দেখা যায় এমনটি করা খারাপ কাজ। এখন যদি আংশিক ক্ষতি থেকে বাঁচার লক্ষে আঙ্গুল না কাঁটা হয় তাহলে এক সময় হাত কাঁটা লাগবে, ক্ষতি আরও বেড়ে যাবে।

অতএব, এই কায়েনাতের ক্ষতি সমূহের ও বিপদ- আপদ সমূহের, শয়তানদের ও ক্ষতিকর বস্তু মন্দ সমূহের অস্থিত্ত দেওয়া বা সৃষ্টি করাটা, মন্দ বা অনিষ্ট নহে; কারণ এগুলো অসংখ্য গুরুত্তপূর্ণ ফলাফল দেওয়ার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- ফেরেশতাদের উপর শয়তানরা প্রভাব বিস্তার করতে না পারার কারনে, ফেরেশতাদের জীবনের কোন উন্নতি বা তারাক্কি বলতে কিছু নেই। তাদের অবস্থান সব সময় একই ভাবে স্থিরকৃত। পরিবর্তন হয় না। একই ভাবে প্রাণীদের অবস্থা ও এরকম। তবে মানুষের জগতের চিন্তা করলে, উন্নতি তারাক্কি সীমাহীন ও অপরিসীম। নম্রুদ, ফেরাউনদের কথা কল্পনা করে দেখ কি পরিমাণ নিম্নমুখীতা এবং এমনকি সিদ্দিকীন ও আউলিয়া, নবীগণের কথা মনে কর কি পরিমান উন্নতি আর উন্নতি বিদ্দমান, প্রমাণিত। সুতরাং কয়লার ন্যায় নিকৃষ্ট কাল রুহ সমূহকে ও হীরার ন্যায় জ্বলজ্বল কারী নুরানি, উচ্চ মানে রুহ সমূহকে আলাদা ও পরিচ্ছন্ন এবং পার্থক্য করার লক্ষে শয়তানদের সৃষ্টির মাধ্যমে, এবং সুক্ষ- রহস্যের উদ্গাত করনের এমনকি এখানে আম্বিয়াদেরকে পাপ থেকে পবিত্র রাখনের জন্যে এই দুন্যাতাকে একটি পরিক্ষারগার ও যোগ্যতার দরজা এবং জিহাদ প্রচেষ্টার ময়দান হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, একটি এলাহির দোকান খোলা হয়েছে। এখন যদি এই মুজাহাদা ও প্রতিযোগিতা না থাকে তাহলে মানব জাতির মাঝে থাকা হিরা ও কয়লা উভয়ই সমান হয়ে যাবে, পার্থক্য করা যাবে না। আলায়ে ইল্লিয়্যিন এর অধিকারী আবু বকর সিদ্দিক রাঃ এর রুহ এবং আস্ফালে সাফিলিনের বাসিন্দা আবু জেহেলের রুহ একই লেভেলে চলে আসবে। অর্থাৎ শয়তানদের ও অনিষ্টপূর্ণতাকে সৃষ্টি করার কারনটা, বড় ও সার্বজনীন ফলাফলকে লক্ষপাত করার কারনে এগুলোর সৃষ্টি বা অস্থিত্ত দেওয়াটা মন্দ নহে, অনিষ্ট কর্ম নহে, বরং এগুলোর মন্দ ব্যাবহারের ফলে বা অর্জন করা নামীয় বিশেষ ভিত্তি-মূল নিয়ত পূর্ণ যোগ্যতার স্পর্শ থেকে আগত মন্দ সমূহ, এগুলো ঐ অনিষ্টকর বস্তু বা ব্যাপার সমূহ, এটা তো মানুষের অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্টপূর্ণ; এলাহির সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট নহে। (মাক্তুবাত ৪৩)

৫- রাজনীতি থেকে আপনি কেন দূরে থাকেন?

উপস্থিত দুনিয়ার পলেটিক্স থেকে আপনি কেন দূরে থাকছেন? বর্তমানের এতই নিকৃষ্ট পরিবর্তনশীলতার সম্মুখে আপনার কোন পরিবর্তন, উদ্যোগ নাই কেন? এমন পরিস্থিতিকে আপনার কি ভালই লাগছে? না আপনি এমন রাজনীতির অনিষ্ট উত্তান-পতন থেকে ভয় করছেন যে এই জন্য নীরব হয়ে আছেন?

উত্তরঃ আসলে কোরআনে হাকিমের খেদমত, আমাকে কঠোরভাবে এই যামানার রাজনিতির জগৎ থেকে দূরে রেখেছে, ওখানে সংশ্লিষ্ট হতে বারণ করেছে। এমনকি রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করতেও আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। নতুবা আমার পিছনের সারাটি জীবন স্পষ্ট প্রমান করে যে, সত্যের সাথে জীবন ধারার পথে সংগ্রামে আমাকে ভয় বলতে কিছু স্পর্শ করে নাই বা করছে না। আর কেনই বা ভয় আমার থাকবে ? দুনিয়ার সাথে আমার মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুর সাথে তো কোন সম্পর্কই আমার নাই। সন্তান-সন্ততির চিন্তাও আমার নাই। ফলে মাল সম্পদের কোন দুশ্চিন্তাও আমার নেই। খাবার দাবারের আনন্দ-ফুর্তিরও আমার কোন টেনশন নেই, প্রয়োজন নেই। মিথ্যাবাদি যশ -খ্যাতির কোন লোক দেখানোর মতো কপটতার শান -সউকত নামী এই দুনিয়ার রক্ষার কাজেও আমি ব্যাস্থ নহি, বরং এগুলো থেকে দূরে থাকার মেহনতে রহমত হিসেবে জাগ্রত আছে আমার মৃত্যু। এই মৃত্যুও ঐ মহান খালিকে-যুলজালালের হাতে। কারই-বা ক্ষমতা আছে যে সময়ের আগে ঐ মৃত্যুকে স্পর্শ করতে পারে? স্বভাবতঃ ইজ্জতের সাথে মৃত্যু, আর জিল্লতির সাথে জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া এটা পরিষ্কার। পুরাতন সাঈদের ন্যায় একজন এভাবে বলেছিলেন যে,

وَ نَحْنُ أُنَاسٌ لَا تَوَسُّطَ بَيْنَنَا * لَنَا الصَّدْرُ دُونَ الْعَالَمِينَ اَوِ الْقَبْرُ

খুব সম্ভবত কোরআনের খেদমত আমাকে এই মানব সমাজের রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ে চিন্তা করতে বাঁধা প্রদান করছে। ব্যাপারটা এরকম যে, মানবের জীবনটা হল একটি যাত্রা মাত্র। আর এই যামানায় কোরআনের নুরের সাথে দেখতে পেয়েছি যে, ঐ রাজনীতির পথটা একটি জলাবত বিলুয়ার মধ্যে জীর্ণশীর্ণ অনুপে প্রবেশ করে ফেলেছে। কলুষযুক্ত-দূষিত, পচিত-দুর্গন্দজন্মিত একটি নোংরামির ভিতরে মানুষের দলগুলো হোঁচট খেয়ে আবার দাড়িয়ে এভাবে যাচ্ছে। এদের আবার একটি দল খুবই সান্ত ও নিয়ন্ত্রনের দ্বারা চলছে। আবার কোন দল এই কলুষিত, নিকৃষ্ট পচিত পথ থেকে বাঁচার জন্যে বিভিন্ন মাধ্যম সমূহকে ব্যাবহার করছে। তবে বেশীর ভাগই; ঐ নোংরা, বিছ্রি, গন্দজনিত পথের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেই। শততে বিশ % লোক মাতালজনিত, ঐ নিকৃষ্ট পচা গন্দের পথকে তারা মিস্কে আম্বরের ঘ্রাণের পথ মনে করে হাসি তামাশায় উৎফুল্ল হয়ে হয়ে দাড়িয়ে হোঁচট খেয়ে খেয়ে জীবন চালিয়ে যাচ্ছে, সুদূর শ্বাসরোধী আবস্থায় যন্ত্রণা ভোগ করছে । আবার শততে আশি % লোক তারা জানে, অনুভব করে এই রাস্তাটি এরকম নিকৃষ্ট ও পচিত এবং কলুষিত কিন্তু তারাও বড়ই পেরেশান, এর ফলে সঠিক পথকে দেখতে পাচ্ছে না, , ,

সুতরাং এমন সমস্যার দুটি পথ আছেঃ **প্রথমটি** হল, হাতের ক্ষমতা বা বাঁধনের দ্বারা ঐ পাগলাটে হওয়া ২০% লোকের উচিৎ তারা সংযমী, অপ্রমত্ত, সংযত হবে। **দ্বিতীয়টি** হল, একটি নুরের জ্যোতি দেখানোর মাধ্যমে পেরেশান যারা তাদেরকে সালামতির পথকে প্রদর্শন করা।

আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এই লোকদের সংখ্যার বিপরীত আশি জন যারা তাদের হাতে অস্ত্রের হাতা, মাথাকে বাঁধনকে ধরে রয়েছে। অথচ ঐ বেচারাগণ বা পেরেশা নিরা তাদের বিপরীতে অন্যরা সত্যকে বা সত্যের আলকে দেখাতে পারছে না। যদি দেখায়ও; তাহলে এক হাতে লাঠি অন্য হাতে নুরের আলো হওয়ার কারনে সিকিউরিটি বা আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছে না। যার ফলে ঐ পেরেশানরা মনে মনে ভাবছে যে, এই লোকেরা তাহলে কি আমাকে নুরের আলো দেখিয়ে তলোয়ারের

হাতা ব্যাবহার করবে? এভাবে অনিশ্চয়তায় ভুগচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে হাতের কব্জি ভেঙ্গে যাবার কারনে , নূর ও উড়ে যায় এবং নিভে যায়।

অতএব, যদি এই জীর্ণ-পূর্ণ স্থানকে চিন্তা করি, তাহলে এটা হল গাফলত ও ভ্রষ্টতার পয়দলে পিষাকর ও নোংরামির এক মানবিক সমাজের জীবনের চিত্র। আর মাতালরা হল; দালালাতের, অনিষ্টতার মজায় বেষ্টিত ও স্বাদ ভোগকারী একঘুয়েমির জিঞ্জিরে যারা আদিষ্ট। আর যারা এখানে পেরেশান তারা হল; এই অনিষ্টতা থেকে ভ্রষ্টতাকে ঘৃণা কারীরা কিন্তু তারা এর ভিতর থেকে বের হতে পারছে না, , , নিজেকে বাঁচাতে চাচ্ছে, পথ খুজে পাচ্ছে না, বড়ই পেরেশান তারা। আর ঐ হাতে রাখা রশি বা বাঁধন তা হল; রাজনীতির দুম্রজালি আবহাওয়া। আরেকটি হল নূর; আর এটা হল কোরআনের হাকিকাত সমূহ। নুরের সামনে ঝগড়া করতে নেই, তারা বিরুদ্ধ্যে দুশমনি করা যায় না। কেবল যে বিতাড়িত শয়তান থেকে দূরে থাকে, ঘৃণা করে তারা কেউই এই কোরআনের হাকিকাতের প্রতি অবজ্ঞা করতে পারেনা। ফলশ্রুতিতে, আমিও নুরে-কোরআনকে আমার হাতে পাওয়ার জন্যে أعوذ بالله من الشيطان و السياسة বলে বলে আপনাদের এই রাজনীতির লাঠিকে নিক্ষেপ করে, আমার দুনো হাতে নুরের আলোকে আলিঙ্গন করেছি। আমি দেখতে পেয়েছি যে, এখনকার রাজনীতির অত্যাচারি বাতাসের মধ্যে; যেমন অনুযায়ী তেমনি বিপরীতদেরও এই নুরের বিরুদ্ধ্যে দোকান খোলা। সমস্থ রাজনীতির আবহাওয়ার ও একমুখীতার, পক্ষপাতিত্তের অনেক উপরে এবং তাদের প্রতিহিংসার উদ্দ্যেশ্যের বুঝাপাড়া থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার দরজাটা খোলা হল এই কোরআনের আদর্শে নিরপেক্ষতা যেখানে জরুরী সেখানে এই কোরআনে প্রদর্শিত কোরআনের আলো থেকে মোটেও এমন রকমের চরিত্র বা পক্ষপাতিত্ত, নিজেরদের প্রতি কেবল ইনসাফ করার এই শিক্ষা রাজনীতির দুম্রজালি পন্থা কুরানের নূর শেখায়না, শিক্ষা দেয়না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ মানুস-রুপি শয়তানদের বা জানুয়ারদের যারা মনে করে ধর্মহীনতা এবং নাস্তিকতাই হল সিয়াসাত বা রাজনীতি।

আলহামদুলিল্লাহ, রাজনীতি থেকে একাকার হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে, কোরআনের হীরার ন্যায় হাকিকাত সমূহের আদর্শ সমূহকে রাজনীতির প্রোপ্যাগান্ডায় অপরাধীর পাপে পাপিষ্ট হওয়া সাধারণ কাঁচের চুরমার হওয়া টুকরার ন্যায় আমি রাজনীতি চেড়ে দিয়ে এই হিরক সমূহকে নীচে নামিয়ে নিয়ে আসিনি। বরং এই রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কারনে মহামূল্যবান এই হীরার টুকরা গুলো সকলের কাছে আরও উন্নত চাকচিক্যময় এক পন্থায় এগুলো বাড়তেই আছে। (মাক্তুবাত ৪৮)

অবশ্যই, এই যামানা; যেমন ঈমানের তেমনি দ্বীনের জন্যে, যেমন সামাজিক জীবনের তেমনি শরীয়তের জন্যে, যেমন সার্বজনীন আইন-কানুন তেমনি ইসলামি রাজনীতির জন্যে, অতি মাত্রার একজন মহামূল্যবান মুজাদ্দিদের প্রয়োজন বোধের দাবি করে। তবে সব চেয়ে গুরুত্তপূর্ণটা হল ঈমানের হাকিকাত সমূহের হেফাজত করনের ক্ষেত্রে নতুনত্তের দায়িত্তটা হল সর্ব উৎকৃষ্ট মানের সব চেয়ে বড় দায়িত্ত। এই ঈমানের মাহাত্ম সমূহের সামনে শরীয়ত, সামজিক জীবন, রাজনীতির যে স্থর সমূহ আছে এগুলো ২য়, ৩য়, চতুর্থ নং স্থরের অধিকারী হয়। হাদিসের রেওয়ায়েতের ভাষায় যে দ্বীনের ক্ষেত্রে উন্নতি নতুনত্তের ব্যাপারে গুরুত্ত দেওয়া হয়েছে এটা হল ঈমানের হাকিকাতের ব্যাপারের উন্নতি উদ্যেশ্য। কিন্তু জনসাধারণের চিন্তা ফিকিরে, দুনিয়া মুখী মানুষদের দৃষ্টিতে বাহ্যিক ভাবে অনেক প্রশস্থ এবং কৌশলী হেকমতের বিবেচনায় তারা ইসলামি জীবন ব্যাবস্থাকে এবং দ্বীনই রাজনীতির দিক থেকে বেশী গুরুত্তারোপ করার কারনে, তারা ঐ দূরবীনের লেন্স দিয়ে এই ব্যাপারকে দেখছেন, এবং অর্থ ও তুলে ধরছেন।

একই ভাবে এই তিনটি গুরুত্ত পূর্ণ অযিফা বা দায়িত্ত এক সাথে কোন ব্যাক্তির বা দলের মাঝে পাওয়া কতই না জরুরী, কিন্তু এমন উপস্থিতি ও শক্তিশালী ঈমানের বলে বলিয়ান হওয়াটা এমনকি পরস্পরে আক্রমন না করে চলাটা বাস্তবে অনেক দূরে মোটেও দেখা যাচ্ছে না। শেষ যামানায়, আহলে বায়তের নুরানি জ্যোতি হওয়া ইমাম মাহদি ও তার দল এমনটি দেখাতে সম্মত হবেন। এই যুগে, মিহান রাব্বে কারিমের লাখ কুটি শুকরিয়া যে, রিসালে নুরের তাত্বিক হাকিকাত ও ব্যাক্তি সুহৃদদের আধ্যাত্মিক শক্তি, ঈমানের হাকিকাতের হেফাজতের ময়দানে উন্নতির জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। (কাস্তামুনু ১৮৯)

এই যুগে, ইসলাম অনুসারীদের সব চেয়ে বর ধ্বংসাত্মক ব্যাপার হল শাস্ত্র এবং দর্শন-বাদীদের থেকে আগত এক দালালাতের অনিষ্টতায় সমস্ত অন্তর সমূহকে কলুষিত করা এবং ঈমানকে নোংরা করা। এর এক মাত্র সমাধান হল নুরের আলো; আলোকে এমন ভাবে তুলে ধরা যেন ঈমানী কলব গুলো আত্মবাদি হয়, পরিচ্ছন্ন হয়, রক্ষিত হয়। এখন যদি রাজনীতির মশালের বাঁধন দিয়ে এর সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হয়, বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে দুশমন কাফিরেরা মুনাফিকের রুপ নিবে। আর মুনাফিক হল কাফির থেকে আরও বেশী মারাত্মক, ধ্বংসাত্মক। তার মানে হল রাজনীতির মশাল এখনকার এই যামানায় মানুষের অস্থির কলব সমূহকে ইসলাহ করা অনেক জঠিল। ঠিক ঐ সময় কুফুরি কলবে প্রবেশ করবে, গুপনে লুকিয়ে থাকবে; তার ভাই মুনাফেকি জাগিয়ে উঠবে। এক সাথে নূর এবং এই ধোঁকাবাজ মশাল দুনোটা আমার মতো মানুষ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নহে। এই জন্যে সমস্থ শক্তি ক্ষমতা দিয়ে নুরের আলোর সাথে নিজেকে বিছিয়ে আছি। রাজনীতির মশাল যেভাবে হোক না কেন তার দিকে লক্ষপাত করা অনুচিত। এখন যদি অর্থনৈতিক জিহাদের প্রেক্ষাপটকে চিন্তা করি; তাহলে এই দায়িত্ত আমাদের হাতে আপাতত নহে। হা আমি জানি অবস্থার প্রেক্ষাপটের ধারাবাহিকতায় কাফিরের মুরতাদের বিরুদ্দে অবস্থান নেওয়া বাঁধ তৈরি করার জন্যে মশাল দরকার। কিন্তু সর্ব উচ্চ আমাদের দুটি মাত্র হাত আছে। তবে আমাদের যদি একশত হাত ও থাকে, তাহলে আমাদের ঈমানের নুর-ই যথেষ্ট। মশাল ধরার হাত আমাদের এই মুহূর্তে নেই। (লাম'আলার ১০৪)

আমাদের দুশমন কিন্তু বিদেশীরা নহে। আমাদের এত নীচে নামানোর আসল দুশমন হল আল্লাহ্‌র কালামকে ঘোষণা করতে বাঁধা হওয়া এবং (জেহালতের) মূর্খতার ফলাফল নামী শরীয়তের বিরোধিতা করা। আরেকটি হল (জরুরত) প্রয়োজন এবং এর ফলাফলের নাম হল খারাপ চরিত্র ও তার চলঙ্গতি। আরেকটি হল ইখতেলাফ বা মতভেদ তার ফলের নাম হল দুষ্ট নিয়ত ও মুনাফিকি এটা এমন যে আমাদের ঐক্যতায় ফাটল তৈরিকারী , আমাদের বড় দুশমন এই তিনটি বে-ইন্সাফি দুশমনের আক্রমন বৈ কিছু নহে। (খুতবায়ে শামিয়া ৯৬) আমাদের ধ্বংসাত্মক দুশমন হল জেহালত, জরুরত, ও ইখতেলাফ এই তিনটি দুশমনের সম্মুখে আমরা সান'আত, মা'রিফাত এবং ইত্তেফাকের দ্বারা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। (জীবনী ৬৪)

৬- কোন কিছু ভুলে না যাওয়ার জন্যে কি করা উচিৎ ?

রিসালে নুরের সুহৃদ গনের থেকে একজন যুবক সে কোরআনের হাফিজ, অনেক অনেক লোকের প্রশ্ন করার ন্যায় বলিলেন যে, " আমার মাঝে ভুলে যাওয়ার রোগটা, এমন ব্যাধি বেড়েই চলচ্ছে। আমি কি করা উচিৎ"? আমি বলিলামঃ " প্রচন্ড চেষ্টা করে যাও হারাম কোন কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত না দিতে"। কারণ এ ব্যাপারে নবীজির রেওয়ায়েত রয়েছে। আর ঈমান শাফি' রহঃ এর বলার ন্যায় বলছি " হারাম দৃষ্টিপাত, (নিছিয়ান) বিস্মৃতিপ্রবণতা, ভুলে যাওয়া বাড়িয়ে দেয়"।

অবশ্যই, ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে যখন হারাম বা অবৈধ দিকে দৃষ্টিপাত করা বেড়ে যায়, তখন নফসের রচি-বোধ, অনিষ্টতা উস্কিয়ে উঠে, দেহের খাহেশাতের মনোবাসনাকে অন্যায় পথে ব্যাবহার করে নোংরামিতে অপচয় করে। সপ্তায় অনেক বার গোসল করার প্রতি মজবুর হয়। ফলশ্রুতিতে, মেডিকেল সাইন্সের ভাষায় সে দেমাগের, বিচক্ষণতার, সংরক্ষণীয়তার শক্তিকে হারিয়ে ফেলে, নষ্ট হতে থাকে। হাঁ, এই যুগে অশ্লীলতার নোংরামিতে খোলা-মেলার বিস্তৃতির কারনে, বিশেষ করে এই গ্রীষ্ম কালীন দেশ সমূহে উল্লেখিত অপ-দৃষ্টিতার মন্দ ও অশালীন ব্যাবহার, সর্ব ক্ষেত্রে, সার্বজনীন ভাবে সকলের উপর ভুলে যাওয়ার ন্যায় বিস্মৃতি প্রবনতা বাড়তেই চলছে। সবাই আংশিক বা সার্বিক দৃষ্টিতে এই আপত্তির মায়াজালে বেষ্টিত। সুতরাং এই সর্ব ক্ষেত্রে সয়লাব হওয়া অসুস্থতার অগ্রগতির কথাটা হাদিস শরিফে উল্লেখ করা বর্ণনার সুক্ষ ব্যাখ্যার চুড়াকে স্পর্শ করে, পরিষ্কার ভাবে ইঙ্গিত প্রদর্শন কর। নবীজি বলেছিলেন যে, শেষ যামানায়, কোরআনের হাফিজদের বুক থেকে তা উঠিয়ে নেয়া, বের করে নেওয়ার হবে, তারা কোরাআনকে আর স্বরণে রাখতে পারবে না। এর অর্থ এই মন্দ দৃষ্টিপাতের প্রচলন বেড়ে যাবে আক্রমণাত্মক ভাবে। ফলে এই হারাম দর্শনের অপবিত্র কারনটা পবিত্র কোরআনকে বুকে রাখতে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। এই হাদিসের ইহা একটি সুক্ষ ব্যাখ্যা। অদৃশ্যের খবর কেবল আল্লাহই জানেন। (কাস্তামুনু ১৩৩)

৭/ ত্রিশ, চল্লিশ বছরে আপনি কি শিখলেন?

আমি চল্লিশ বছর জীবনে, ত্রিশ বছরের মেহনতে কেবল মাত্র চারটি কথার সাথে চারটি বাক্য শিখেছি। এর ব্যাখ্যা হবে তবে এখানে সংক্ষেপে ইঙ্গিত দিচ্ছি। **চারটি কথার দ্বারা উদ্যেশ্য হল** মা'নায়ে হরফি, মা'নায়ে ইসমি, নিয়্যত, মনোযোগ-দর্শন বা দৃষ্টি। এগুলো এরকম যে,

জনাবে হক মহান আল্লাহ্ ব্যাতিত অর্থাৎ তামাম মহা-বিশ্বকে মা'নায়ে হরফির সাথে এবং তার বিবেচনায় দেখা জরুরী (তিনি সৃষ্টি না করলে নভো ও ভু-মণ্ডল অস্থিত্তে আসতো না)। মা'নায়ে ইসমি এর সাথে ও মাধ্যম বা কারণ সমূহের বিবেচনায় দেখাটা মারাত্মক ভুল হবে (এমনি এমনিতে, ফেটে- ছেঁটে, এই কারনে ঐ কারনে সৃষ্টি হয়েছে মনে করা)।

হাঁ, প্রত্যেক বস্তুর দুইটা দিক রয়েছে, একটি দিক চির-সত্যের দিকে, হকের দিকে থাকায়। অন্য দিকটা জনগনের দিকে লক্ষপাত করে। এখন জনগনের দিকটা হকের দিকটাকে শামিয়ানা বা চাঁদোয়া এক পর্দার অথবা আলোকভেদ্য একটি কাঁচের টুকরার ন্যায়, তার নীচে থাকা হকের দিকে দৃষ্টিপাতকারী এমন এক দিকের সম্পর্ককে দেখাবে একটি পর্দার মতো হওয়া আবশ্যকীয়। ফলশ্রুতিতে এরই ধারাবাহিকতায়, যখন কেউ নেয়ামতের দিকে লক্ষপাত করবে তখন মহান নেয়ামত দাতাকে, আর যখন শিল্পায়নের, (বর্তমান সব ধরনের আবিষ্কার) দিকে থাকাবে তখন আসল কারিগরকে, যখন কারণ বা মাধ্যম সমূহের দিকে থাকাবে হাকিকি বা মৌলিক প্রভাবকারীকে তার দেমাগে ও ফিকিরে যেন আসে আসল কর্তাকে যেন ভুলে না যায়।

একই ভাবে, দর্শনদৃষ্টি বা লক্ষদৃষ্টি ও নিয়্যত এগুলো বস্তুর মাহাত্মতাকে পরিবর্তন করে। গুনাহকে সোয়াবে, আর সোয়াবকে গুনাহে রুপান্তর করে। অবশ্যই নিয়্যত যেটা প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক গতিময়তায় ইবাদতে রুপ নেয়। আবার একই আমল যদি লোক দেখানোর জন্যে হয় তখন এটা ইবাদাত থেকে গুনাহের আকৃতি ধারন করে৷ বস্তুগত বিষয়াদিকে যদি এই কারনে সেই কারনে হয়েছে বলে মাধ্যম সমূহের দিকে থাকায় তখন এটা মূর্খতা বা জেহালাত হবে। ঠিক এই যায়গায় যদি আল্লাহ্‌র দিকে চিন্তা করে বিবেচনা করে তখন এটা মা'রিফাতে এলাহি বা পালনকর্তার পরিচয় জানতে পারাকে বুঝায়।

চারটি বাক্যের দ্বারা উদ্দ্যশ্য হলঃ ১। "ইন্নি-লাছতু-মালিকি"আমি আমার নিজের মালিক নহি। বস্তুতঃ আমার মালিক যিনি তিনি-ই হলেন এই কুল-কায়েনাতের মালিক। কিন্তু নিজেকে নিজের মালিক হওয়ার দৃষ্টিতে দেখছি যে, যেন আসল মালিকের গুণ সমূহ ও গুণ সমুহেরে এক প্রকার তাৎপর্য সমূহকে এবং তার সিমানাকে বুঝতে পারি। হাঁ, আমার নিজের সন্দেহ প্রবণ, সীমিত সীমা-রেখার দ্বারা আমার মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম গুণাবলীর এক দিক থেকে তার শাশ্বত, চিরন্তনতার কিনারাকে বুঝতে জানতে পারলাম।

২। "আল-মাউতু হাক্কুন" মৃত্যু নিশ্চিত হবেই, জী, এই জীবন, এই দেহ এই বিশাল দুনিয়াতে না ভাঙ্গা এমন কোন পিলার বা খুঁটি হয়ে থাকতে পারবে এমন সক্ষমতা তার মাঝে নেই। যদিও এই জীবন বা দেহ লোহা বা পাথরের দ্বারা তৈরি নহে। বড়জোর এই জীবন বা দেহ গোশত, রক্ত, হাড় এর ন্যায় ভিন্নমুখী বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট। অল্প এক সময়ের জন্যে এদের সক্ষমতা, ভারসাম্যতা যদিও এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একত্রিত, জোটবদ্ধ কিন্তু সময়ের সিমানায় তাদের আলাদা হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া সার্বক্ষণিক এটা স্বরণীয়।

৩। " রাব্বি ওয়াহিদুন" আমার রব, পালনকর্তা হলেন একজন। হাঁ, সকলের কাছে থাকা সামগ্রিক সুখ সমূহ, যা একজন রাব্বে-রাহিমের কাছে আত্মসমর্পণীয়তার সাথে সম্পৃক্ত। যদি একজন রবের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াটা এরকম চিন্তা করা না হয় তাহলে ঠিক বিপরীত সীমাহীন রবের প্রতি মুখাপেক্ষীতা ভেসে, প্রকাশ পাবে। কারণ মানুষ, সামাজিকতার ও ঐক্যতার বিবেচনায় এমন প্রাণী যে, সমস্ত বস্তুর সাথে তার প্রয়োজন ও সম্পর্ক রয়েছে। এবং প্রত্যেক বস্তুর সম্মুখে, বিপরীতে (অনুভূত হয়ে বা না হয়ে) তার প্রভাব, ও যন্ত্রনা সমূহ এই মানুষের মাঝে উপস্থিত। এটা যদি তাহলে এরকম বিষাক্ত হয় একেবারেই জাহান্নামের একটি অবস্থা ছাড়া অন্য কিছু নহে। কিন্তু যখন এই মানুষ অনেক রবের বা আসবাব সমূহের ব্যাবহারে যে মাধ্যম গুলোর কথা বলে এগুলোকে যদি এক রবের কাছে হস্থান্তর করে তখন ফেরদাউসি এক মাকামের, স্থানের, জান্নাতের অধিকারী হতে পারবে৷

৪। " আনা " আমি এর সাথে সব সময় কথাবার্তায় ব্যাবহারের অনাকাংখ্যিত আমিত্ত। অর্থাৎ নিজেকে এক অস্থিত্ত, এক মুল্যায়নি ভাবের আচরন দেখানো যে, এই আমি নামীয় আমিত্ত মহান রবের গুণাবলীকে, তার শিল্পায়নের কারিগরিকে জানার ও বুঝার জন্যে একটি সেন্ট্রাল বা ক্ষেন্দ্র এবং এই আনা নামীয় আমি একটি একত্তবাদের হিকমতের যুক্তি স্বরূপ। (মানুষ আমি আমি আমি করে যে কথাবার্তা বলে এখানে সে চিন্তা করলে আমি নামীয় এক রবের একত্তবাদের ইঙ্গিত পাবে। অনুঃ)। (মাছনাবিয়ে নুরিয়া ৫১)

৮/ আহলে দালালতের কিছু লোকেরা বলে যে, মহাবিশ্বের সার্বক্ষণিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সাথে পরিবর্তন ও রুপান্তরের কর্তা যিনি, সন্দেহাতীত ভাবে তিনি নিজের ক্ষেত্রেও পরিবর্তিত ও বিবর্তনশীল হওয়া জরুরী?

কস্মিন কালেও নহে! লক্ষ কুটি বার অসম্ভব! পৃথিবীর আয়না বা বস্ত সমূহের পরিবর্তন, আকাশের ঐ সূর্যের পরিবর্তনের আবশ্যকতায় আসে না, বরং ঠিক তার বিপরীত সূর্যের উজ্জলতার সতেজতাকে প্রদর্শন করছে। একইভাবে শাশ্বত, চিরন্তন, স্থায়ী, সর্ব ক্ষেত্রে কামালে-মুতলাক, পূর্ণতায় নিরংকুশ, সার্বিকভাবে যিনি বাধাহীন রাজাধিরাজ আল্লাহ্ যিনি বস্ত থেকে পবিত্র ও মুক্ত, স্থান থেকে, বেষ্টন থেকে, কাল থেকে পাক-পবিত্র, সব কিছুর উপরে হওয়া এক শোধিত স্বত্বা, এক যাতে-আকদাস সত্ত্বার পরিবর্তন ও রুপান্তর হওয়া অবাস্থব ও অবান্থর কথা। পৃথিবীর বা কায়েনাতের বস্তবাদী পরিবর্তনের ব্যাপারটি; ঐ মহান সত্ত্বার পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট নহে, বরং এর সাথে সম্পৃক্ততা না হওয়া এবং এর সাথে সংযুক্ত না হওয়াটা হল তার এককত্তের প্রমান। কারণ হল; সীমাহীন বস্তু সমূহের পরিপাটি ভাবে সব কিছুকে সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রন করার যে পরিবর্তন তিনি করেন বা গতিময়কারী স্বত্বা, তিনি নিজে রুপান্তর না হওয়া অত্যাবশ্যকীয়।

যেমন- তুমি অসংখ্য ফিতা বা রশি দ্বারা অনেক ফুলকে বা খেলার বলকে যদি সংযুক্ত বা বেঁধে, পেছাতে থাক এবং সব সময় এই কাজ করতে থাকলে তুমাকে আপন জায়গাতে থেকে করতে হবে নড়াচড়া করলে এই কাজ পূর্ণ ভাবে করা হবে না। যদি নড়াচড়া কর তাহলে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হবে।

আরেকটা বিখ্যাত ব্যাপার যে, পরোপুরি ভাবে সুন্দর সাবলীল কর্মকে বাস্থবায়নের জন্যে বারবার নড়াচড়া করা অপ্রাসঙ্গিক। কেন নয় এমনটি করলে কাজের বিন্যাসে ঘাটতি ঘটবে। এভাবে মহান আল্লাহ্ ও তার জন্যে এই মা'মুলি কায়েনাতের পরিচালনায় পরিবর্তন হওয়া খাপ খায়না, অবাস্থব।

অন্য কথায়, পরিবর্তন ও রুপান্তরিত হওয়া; ত্রুটিহীনতা ও পূর্ণাঙ্গতার সফলতার জন্যে সতেজতা ও অভাব বা প্রয়োজনের ও কোথাও স্থান নেওয়া থেকে আরও উন্নীত এক ব্যাপার। এখন যদি মহান পবিত্র সত্তাকে নিয়ে চিন্তা করি; তিনি তো যেমন কাদীম বা পিছনের শেষ নেই তেমনি সর্ব ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার মুক্ততায় পাশাপাশি নিরংকুশ বাধাহিনতায়, একই ভাবে বস্ত থেকে মুক্ত; তিনি ওয়াজিবুল-উযুদ (আবশ্যকীয় অস্থিত্ত) হওয়ার দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে তার সত্ত্বার ব্যাপারটায় পরিবর্তন, রদবদল হওয়া অসম্ভব, অবান্থর, সম্ভব নহে, , , (বস্তুর পরিবর্তন হতে পারে তার শাশ্বত কারিগর পরিবর্তন হওয়া জরুরী নহে। অনুঃ) (লামআ'লার ৩৫১)

৯/ ঈমানের পরীক্ষা , উপর থেকে নীচে পরে দেখাও তোমার আল্লাহ্ কীভাবেসাহায্য করেন? একবার শয়তান হযরত ঈসা আঃ কে আপত্তির সূরে জিজ্ঞেস করেছিল যেঃ " যেহেতু মৃত্যু ও সব কিছু এলাহির সৃষ্ট তাকদিরের সাথে সম্পর্কিত; তাহলে এই উচু স্থান থেকে নিজেকে নিক্ষেপ করে দেখাও, তখন বুঝতে পারবে কীভাবে মারা যাও। আসলে ভাগ্য বলে কিছু নেই"

হযরত ঈসা আঃ উত্তরে বলেছিলেন যে, اِنَّ لِلّٰهِ اَنْ يَخْتَبِرَ عَبْدَهُ وَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يَخْتَبِرَ رَبَّهُ (আদাবুদ্দিন-ওয়া-দুনিয়া ২১, আল'মাওয়ারদি) অর্থাৎ- মহান আল্লাহ্‌র জন্যে তথা স্রষ্টার জন্যে পালনকর্তার জন্যে এ কথা সমীচীন যে, তিনি তার বান্দাকে পরিক্ষা করতে পারেন এই বলে যে, তুমি যদি এমনটি করো তাহলে আমি ঐরকম করবো। দেখি গোলাম হিসাবে তুমি আমার হুকুম কতটুকু পালন করো? এভাবে বলে তিনি পরিক্ষা করতে পারেন। কিন্তু ঠিক তার বিপরীত বান্দার কোন অধিকার নাই বা তার এমন ক্ষমতা নাই যে, সে তার মালিক কে মহান রবকে পরিক্ষা করবে, এবং বলবে যে, আমি যদি এরকম করি তুমি কি ঐরকম করবে? তোমাকে পরিক্ষা করে নিব। এভাবে বলে বান্দা তার মালিক কে পরিক্ষা করা হল অভদ্রতা; ইবাদাতের দৃষ্টিতে এটা হল নিসেদজ্ঞ। আর যেহেতু বাস্তবতা এরকম তাহলে মানুষের উচিৎ সে তার দায়িত্তকে আদায় করবে এবং রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে বা এলাহির কাজে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করবেনা। বিখ্যাত এক ঘটনা, একবার ইসলামের মুজাহিদদের মধ্য থেকে এবং জেঙ্গিয খানের সৈন্যকে কয়েকবার পরাজিত কারী বাদশাহ তার নাম ছিল জালালুদ্দিন হারযামশাহ তিনি জিহাদে যাওয়ার সময়, তার অনুসারী ও উজির তাহাকে বলেছিলেন যে, বাদশাহ আপনিতো জয়ী হবেনই; মহান আল্লাহ্ আপনাকে বিজয়ী করবেনই, তখন তিনি বলেছিলেন যে, ~ আমি আল্লাহ্র হুকুমের অনুসরণে জিহাদের রাস্তায় আমার কাজ ও দায়িত্ত আদায় করতে বাধ্য, কর্তব্য পরায়ন, এটা আমার কাজ। আমি আমার রবের কাজের সাথে নিজেকে মিক্স করবনা, হস্তক্ষেপ করার আমার অধিকার নেই। জয়ী করা বা সফলতা দেওয়া এটা তার কাজ এটা তার হাতে। অতএব, এই সত্ত্বা এই গভীর সুক্ষতাকে বুঝার কারনে, জীবনে তিনি অসংখ্যবার বিজয়ী হয়েছিলেন। অথচ সর্ব শ্রেষ্ট উস্তাদ, সর্ব প্রেক্ষাপটের বাহক, সব চেয়ে বড় রাহবার রাছুলে আকরাম আলাইহিচ্ছালাতু অয়াচ্ছালামকেও বলা হয়েছে যে, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ এলাহির এই আদেশের দ্বারা নবীজির মেহনত ও দাওয়াতকে মানুষ অনুসরণ না করার ক্ষেত্রে এটা প্রমান করছে যে তিনি সঃ কি পরিমাণ মেহনত করেছেন ও করতেন।

তার কারণ হল إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ এই আয়াত প্রমান করছে যে, মানুষকে সত্যের দাওয়াত শুনানো এবং হেদায়াত দান করা, মহান রবের দায়িত্ত। তার দায়িত্তে কাহারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। যেহেতু ব্যাপার এরকম, হে আমার প্রিয় ভাইগন! আপনারা ও আপনাদের দায়িত্ত না হওয়া এমন গতিময়তায় হাত না বাড়িয়ে, ভিত্তি তৈরি না করে আপনাদের রবের হুকুমের সাথে নিজেদেরকে অংশীদার করবেন না এটা তার ইচ্ছা তিনি কাকে পথ দেখাবেন আর কাকে দেখাবেন না আপনারা আপনাদের দায়িত্তে থাকা দাওয়াত দিয়ে যান!, , , , (লাম'আলার ১৩০) **১০/** خَيْرُ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِكُهُولِكُمْ وَ شَرُّ كُهُولِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِشَبَابِكُمْ (মু-জামিল কাবির ২২/৮৩)

আলোচ্য অংশ কি হাদীস ? এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ হাদিস বলে আমি শুনেছি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল:- সবচাইতে উত্তম যুবক ঐ ব্যক্তি যে, বয়স্কদের ন্যায় মৃত্যুকে অনুভূব করে ও আখেরাতের জন্যে কাজ করে, যৌবনের খাহেশাতে প্রভাবিত না হয়ে গাফলতের সাথে ও জড়িত হয় না । অন্যদিকে সবচাইতে খারাপ বৃদ্ধ ঐ ব্যক্তিটি যে, গাফিলতি ও খাহেশাতের ক্ষেত্রে যুবকদের ন্যায় চাল-চলন করে । শিশুদের ন্যায় মনোবাসনার অনুসারী হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰينَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰينَا اللهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

সাঈদ নূরসীর

বাস্তবিক মর্ম বাণী সমূহ

১। যিনি মশার শক্তিকে সৃষ্টি করেছেন, সূর্যকে ও ঐ সত্ত্বা সৃষ্টি করেছেন।

২। মানুষ সৃষ্টিগত সম্মানী হওয়ার ধরুন, সত্যকে অন্বেষন করে। কখনও অন্যায় হাতে পৌছায়, বাতিলকে সত্য মনে করে বক্ষে গোপন করে রাখে, যখন হাকিকাতকে খুড়ে তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে ভূল পথে নিমজ্জিত হয় ফলে সত্য মনে করে বাতিলকে তার চিন্তাদেহে পরিধান করে।

৩। প্রতিদানের উপর ফেরাকারী রাজনীতি একটি জানুয়ার।

৪। সময় বুঝিয়ে দিয়েছে যে, জান্নাত এত সস্তা নহে, জাহান্নাম ও অপ্রয়োজনীয় নহে।

৫। উত্তম দর্শনকারী উত্তমভাবে চিন্তা করে, আর উত্তম চিন্তাকারী জীবন থেকে স্বাদ উপভোগ করে।

৬। মানব জাতীকে প্রান্তবন্তকারী হল তার কৃতকর্ম আর মৃত্যুবরণকারী হল তার হতাশা।

৭। কৃত্রিমতা যদি জ্ঞানের হাত থেকে বের হয়ে মূর্খের হাতে পৌছায় তখন তা বাস্তবতায় রুপ ধারণ করে অমৌলিক ব্যাপারের দরজা খুলে।

৮। আত্মগরিমা মানুষের মাল না হলেও মানুষকেই মাল বানিয়ে ফেলে।

৯। হাদিস হল জীবনের মূল ধাতু ও বাস্তবতার মূল উপকরণ।

১০। ধর্মের সজিবতা জাতির প্রাণবন্ততার নাম একি সাথে ধর্মীয় জীবন হল জীবনের আলো স্বরুপ।

১১। দুশমনের দুশমনী; যদি দুশমনীতে চলে এটা তার বন্ধু কিন্তু দুশমনীতা ছেড়ে দিয়ে বন্ধু হলে এটা তার শত্রু।

১২। যামানা যতই বয়োজ্যেষ্ট হচ্ছে কোরআন ততই যৌবনে পা রাখছে, সে তার গোপনীয়তাকে প্রকাশ করছে। আলোকে আগুন মনে হওয়ার ন্যায় কখনও সাহিত্যের জটিলতাও অতিরঞ্জনের আবহাওয়া দেখায়।

১৩। সমস্যাবলীঃ যা পাপকর্মের শিক্ষক স্বরুপ, নিরাশ যা চিন্তা শক্তির ভ্রষ্টতার; অন্তরের অন্ধকারচ্ছন্নতা রুহের সমস্যাবলীর কেন্দ্রীয় ক্যেবল স্বরুপ।

১৪। সবচেয়ে বদ বখত, সবচেয়ে বিপদগ্রস্থ ও বিপদমূখী ব্যক্তি হল যে কাজ করে না, যদিও অলসতা ব্যক্তির স্বীয় স্বরুপ, অপর দিকে কর্মব্যস্থ প্রচেষ্টাকারী দেহের জীবন এবং এই জীবনের পূর্ণ সচেতনতা স্বরুপ।

১৫। ধৈর্যের প্রতিধান ঐক্যতা। অলসতার শাস্তি পাপে পূর্ণতা। প্রচেষ্টার ফল সার্বিক ধনাঢ্যতা। চলমান সিদ্ধান্ত চেতার প্রতিধান হল বিজয় স্বরুপ।

১৬। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করুন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দেখা সাক্ষাৎ করুন, আল্লাহর জন্যে ব্যস্থ থাকুন "আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর তরে, আল্লাহর কারণে" সন্তুষ্টির দফতরে জীবন চালিয়ে যান। ঐ সময় আপনার সমগ্র জীবনের প্রতিটি মিনিট এক বছরের ছোয়াব সমমানে লিখিত হবে।

১৭। তামাম কায়েনাতের সুলতান হলেন একজন, সবকিছুর চাবিকাটি তারই কাছে রয়েছে, সবকিছুর লাগাম তারই হাতে, সবকিছুই তার আদেশ বার্তায় সমাদিত হয় যদি তুমি তাহাকে পেয়ে যাও তাহলে সকল চাহিদা কামনা পেয়ে গেলে, সীমাহীন হাতপাতা ও ভয়ভীতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে নিলে।

১৮। মালের মালিক কারণ প্রসূতবশত মালিক হওয়ার যে ধারণা করছে, আসলে মূলত আসল মালিকতো ঐ মাধ্যমতা কারণ সমূহের বিপরীত দিকে সবকিছু প্রত্যক্ষকারী চিরঞ্জীব শক্তিধর আল্লাহ কে কেহ নহে।

১৯। মহান স্রষ্টা সীমাহীন তার ক্ষমতা ও অসীম রহমতকে প্রদর্শন করার জন্যে মানুষের মধ্যে অসংখ্য অক্ষমতা সংখ্যাহীন অভাবকে ত্বরান্বিত করে রেখেছেন।

২০। অস্থায়ী সৃষ্টি জীবের অস্তিত্ব যেহেতু স্থায়ী নহে যতই তার জীবন লম্বা হোক না কেন ঘুরে দিয়ে সীমীত সংক্ষিপ্ত জীবনের হুকুমের আওতায়ই থাকবে। তার একটি বছর একটি সেকেন্ডের ন্যায় গমনীয়, হৃদয় আকৃতি পূর্ণ একটি কল্পনা এবং দুঃখ বিশেষ একটি স্বপ্ন অন্য কিছু নহে।

২১। এই দুনিয়ার ঘরটি হল একটি পরিক্ষাক্ষেত্র এবং খেদমতের পাত্র; এখানে মজা করা ও মূল্য পাওয়া বা প্রতিধান চাওয়ার জায়গা নহে।

২২। প্রকৃতি হল একটি এলাহীর শিল্পকর্ম, শিল্পী বা কারিগর হতে পারে না একটি রাব্বানী কিতাব স্বরুপ, লেখক হতে পারে না একটি নকশা স্বরুপ নকশাকারী হতে পারে না একটি খাতা স্বরুপ কখনও খাতার মালিক হতে পারে না, ইহা একটি কানুন স্বরুপ কখনও ক্ষমতাবান হতে পারে না।

২৩। কোরআন হল একজন হাফিজ যে কুদরতের কলম দ্বারা মহাবিশ্বের পৃষ্টা সমূহের মধ্যে লিখিত আয়াত সমূহকে পড়ে যায়।

২৪। এটা কি সম্ভব যে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলকে সৃষ্টিকারী মহা প্রকৌশলী আল্লাহ আসমান ও জমিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হওয়া এবং সৃষ্টিকুলের সর্বোচ্চ পরিপূর্ণ ফল সূলভ হওয়া এই মানবজাতীকে অনর্থক ছেড়ে দিবেন, তিনি মাধ্যম সমূহ ও অনাকাংখিত ব্যাপার সমূহের হাতে মানুষকে তুলে দিবেন, বিশাল হিকমতের সাগরকে অহেতুকতার জ্বলে উল্টিয়ে দিবেন? কখনও নহে!

২৫। হে মানুষ! যদি তুমি রিপু ও শয়তানের কথায় জীবন চালাও তাহলে আসফালে সাফিলিনে নিক্ষিপ্ত হবে। আর যদি তুমি কোরআনের ও হক্বের কথায় চলো তাহলে আ'লায়ে ইল্লিয়িনে উজ্জীবিত হবে। ফলে বিশাল এই কায়েনাতের মহাসুন্দর কেলেন্ডারে রুপান্তরিত হবে।

২৬। যে আল্লাহকে চিনতে পারে নাই তার তামাম দুনিয়া ব্যাপি বালা মুসিবত বিদ্যমান। আর যে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে তার দুনিয়া আলোতে নূরানী ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তিতে ভরপুর। স্থরভেদে ঈমানের শক্তি দ্বারা স্বাদবান হয়।

২৭। অবশ্যই যদি এই কায়েনাত থেকে রিছালাতে মুহাম্মদ (স:) এর নূর বের হয়ে যায় চলে যায় তাহলে এই কায়েনাত মৃত্যুবরণ করবে.....আর যদি কোরআন চলে যায় কায়েনাত পাগল হয়ে যাবে, এবং পৃথিবী স্বীয় দেমাগ বুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলবে, বরং চেতনহীন থাকা কোন অস্তিত্বের ব্যক্তিকে কোন দ্রুতগামী গাড়ী আঘাত হানবে তখন কেয়ামত হয়ে যাবে।

২৮। জীবনের স্বাদকে এবং জৌলুসকে যদি পেতে চাও তাহলে আপন জীবনকে ঈমানের দ্বারা জীবনযাপন করো এবং ফরজ সমূহ দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত করো এবং গুনাহ থেকে অতি দূরত্ব বজায় রেখে এই জীবনকে হেফাজত করো।

২৯। হাকিকি সুঃখ ও যন্ত্রণাহীন আনন্দ এবং কষ্ট সহিষ্ণুতাহীন পরম মনোভাব এবং জীবনের চির শান্তিময়তা কেবল মাত্র ঈমানের মধ্যেই বিদ্যমান এবং ঈমানের মৌলিকত্ব এই দফতরেই পাওয়া যায়।

৩০। ঈমান যেমনটি নূর তেমনি শক্তি ও হাঁ হাকিকি ঈমানকে অর্জনকারী ব্যক্তি তামাম সৃষ্টিকুলে সৌর্যবীর্জের সাথে অধিকারী হয়।

৩১। ঈমান মানুষকে মানুষ বানায় বরং ঈমান মানুষকে বাদশাহ বানায়।

৩২। দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষার ময়দান ও খেদমতের স্থান। আনন্দ, পারিশ্রমিক ও পুরুস্কারের জায়গা নয়।

৩৩। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন যেমন নেয়ামতকে বৃদ্ধি করে তেমনি অভিযোগ মুসিবতকে বৃদ্ধি করে। একই সাথে তাকে দয়ার অযোগ্য করে।

৩৪। ভ্রাত্তিত্ব বন্ধুত্ব, শক্তি সামর্থ হল হক্ব ও ইখলাসের মধ্যে আর এই শান্তির মাধ্যম এখলাস অর্জন হয় মৃত্যুর স্বরণের মাধ্যমে।

৩৫। মন্দকে সৃষ্টি করা মন্দ নয় মন্দের অর্জন করা মন্দ।

৩৬। একটি দালান তৈরী করতে ১০০ জন লোকের ১০০ দিন লাগে কিন্তু তা ধ্বংস করতে একজন লোকের একটি মেছের কাটিই যথেষ্ট।

৩৭। দুইজন শক্তিশালী যোদ্ধা যদি একে অপরের সাথে ঝগড়ায় ব্যস্থ থাকে তাহলে জানা কথা একটি ছোট শিশুও তাদের পরাজিত করতে সক্ষম।

৩৮। দাঁড়িপাল্লার দু দিকে যদি দুটি পাহাড় রাখা হয় তাহলে উভয়ের সাথে খেলা করার ক্ষমতা একটি ছোট পাথরের ও আছে।

৩৯। তোমার বলার অধিকার আছে যে আমার, মাসলাক হল হক্বের উপর অথবা আরও সৌন্দর্যের পথ কিন্তু তোমার বলার অধিকার নাই যে কেবল মাত্র হক্ব হল আমার মাসলাক।

৪০। তোমার সকল বলা যেন সত্য হয় কিন্তু সকল সত্যকে বলা তোমার অধিকার নেই। সকল কথা সত্য হওয়া আবশ্যকীয় কিন্তু সকল সত্যকে বলে যাওয়া অর্থাৎ সঠিক নহে।

৪১। কাউকে যদি সব সময় বলা হয় তুমি ভালো তুমি ভালো, তাহলে ভালো হতেপারে আবার কাউকে যদি বলা হয় তুমি খারাপ তুমি খারাপ তাহলে সে আরো নিচে পতিত হয় খারাপ হয়।

৪২। লোভ হল বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্র, নির্ভরতা ও অল্পতুষ্টি হল রহমতের অস্ত্র।

৪৩। গীবত হল শত্রুতাকারীদের, প্রতিহিংসাকারীদের একমুখীদের সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত নিকৃষ্ট অস্ত্র। একজন সম্মানিত লোক সে কখনও এই নিকৃষ্ট অস্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে না।

৪৪। কুরআন ও ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই মহামূল্যমান বাহিক্যভাবে যতই ছোট দেখা যায় না কেন মূল্যায়নে তা অনেক অনেক বড়। অবশ্যই চিরস্থায়ী সুখের পথে সাহায্যকারী কখনও ছোট নহে।

৪৫। মুসিবতের সময় দীর্ঘ হয়। আল্লাহ মানবকে যে ধৈর্য্য নামক ক্ষমতা দান করেছেন। অমূলক পথে ব্যায় না করলে তা সকল মুসিবতে মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট।

৪৬। মুসিবত বড় করে দেখলে বড় হতে থাকে ছোট করে দেখলে ছোট হতে থাকে যেমন রাতের অন্ধকারে কিছুর ছায়া দেখলে গুরুত্ব দিলে বড় হতে থাকে না দিলে হারিয়ে যায়।

৪৭। ঈমান হল জান্নাতের আধ্যাত্মিক তু'বা বৃক্ষের বীজকে বহনকারী, আর কুফুর হল জাহান্নামের আধ্যাত্মিক জাক্কুম বৃক্ষকে গোপনে বহন করে। অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তা শুধুমাত্র ইসলামের ও ঈমানের মধ্যে বিদ্যমান।

৪৮। গোনাহ হল যা অন্তরকে কালো করতে করতে ঈমানের নূর মিঠে যায় অন্তর শক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক গুনাহে কুফুরিতে থাকার যাবার একটি পথ বিদ্যমান আছে।

৪৯। তোমাদের প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত থাকা আবশ্যক কেন নয় তিনি যদি খুশি হয়ে যান আর তামাম দুনিয়া অখুশি থাকে এর কোন মূল্য নাই। তিনি যদি গ্রহণ করে নেন। আর দুনিয়া প্রত্যাখ্যান করে এরও কোন প্রভাব নাই।

৫০। মুসলমানদের ভ্রাত্তিত্বের বন্ধন হল দেহের হাত নাক চুখের ন্যায় যেভাবে এগুলো পরস্পরে ঝগড়াটে হয় না এবং একে অপরকে আপ্রাণ সমর্তন করে যায়।

৫১। অমিতব্যয়ী ব্যক্তি লাঞ্চনা, বঞ্চনার শিকার হয় আর দরিদ্রতায় পতিত হতে বাধ্য হয়। এই যামানায় অপচয় করে যে সম্পদ ব্যায় করা হয় তার বিনিময়ে অনেক উচ্চ মূল্যে শোধ করতে হয়।

৫২। বিনয়ীতাকে নীচু ও গাম্ভীর্যতাকে অহংকারী বাহ্যিকভাবে মনে হলেও হাকিকাতে তা সম্মানের বৈশিষ্ট্য ঠিক তেমনী মিতব্যয়ীতা কৃপণতা নহে।

৫৩। সমাজের মানুষের নীজের প্রতি আকর্ষন তৈরী করতে ইচ্ছা করা যাবে না, তবে কাউকে আকর্ষিত করানো যাবে এতে আনন্দিত হওয়া যাবে না এমনটি হলে ইখলাস নষ্ট হয়ে লোক দেখানোতে রুপান্তরিত হয়ে যাবে।

৫৪। সাহায্য ও সহয়তা মানুষের কাছে চাওয়া যায় না বরং দেওয়া যায়, এমনকি মনে মনে আকাংঙা করে অপেক্ষিত থাকাবস্থায় প্রেক্ষাপটি আচরণে ও চাওয়া যাবে না বরং প্রদান করে সঙ্গে সঙ্গে ভূলে যাওয়ার পন্থায় দেওয়া হবে। নতুবা এখলাসে আক্রমণ করবে।

৫৫। প্রত্যেক দেখতে পাওয়া সুখ আনন্দের মাঝে একটি দুঃখ কষ্টের চিহ্ন থাকে।

রেফারেন্স সমূহ

১,কালেমাত ২, মাকতুবাত ৩, লামআত ৪, শুয়াআত ৫, ইসারাতুল ইজাজ ৫, মাসনাবিয়ে নুরিয়া ৬, মালাহিক ৭, সিয়াকুল ইসলাম ৮, মুনাজারাত ৯, খুতবায়ে শামিয়া ১০, আসায়ে মুসা ১১, তিলসিমাত ১২, জুলফিকার ১৩, সিরাজুন্নুর ১৪, সিক্কায়ে তাসদিকে গাইবিয়্যাহ ১৫, মুহকামাত ১৬,রুমুজাতে সামানিয়্যাহ ১৭, আসায়ে বাদিয়্যাহ ১৮, উসমাঞ্জা আন্সিপ্লডিক লুগাত ১৯, ফুরকানে কারিম ২০ কুতুবে সিত্তা ও ইত্যাদি।

Risale-i-nur kasıdesi

Dost istersen Allah yeter
Yârân istersen Kur'an yeter
Mal istersen kanaat yeter 2
Düşman istersen nefis yeter ...2
Nasihat istersen ölüm yeter............
Hakikate iman ile
Uhuvvetin ferman ile devam ede edeceğiz
peyğambarın irsad ile
Işaratun nuru ile devam ede edeceğiz
Muhabbetin kuvvet ile
samımetin göcü ile
mehemetin ima ile
şefakatın sime ile. hayatımız devam edeceğiz
Hakikate iman ile
Uhuvvetın ferman ile devam ede edeceğiz
risalatun nuru ile
ustazımın şürü ile 2 devam ede edeceğiz
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ * وَ قُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ * قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰيهَا * وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰيهَا *
ان الله يحب المتوكلين
ان الله مع الصابرين
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ * * وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

müstakımın yolu ile
ustazımın gözü ile
allahımın rıza ile
dünıyamızın feda ile devam ede edeceğiz
Muhabbetın kuvvet ile
samımetin göcü ile
mehemetin ima ile
şefakatın sime ile. hayatımız devam edeceğiz
Hakıkatı ıman ile
Uhuvvetın ferman ile 2 devam ede edeceğiz
resalatun nuru ile
ustazımın şürü ile
ıhlasının takva ile
rabbımızım nusrat ile devam ede edeceğız
peyğambarın sözü ile
ışaratun nuru ıle 2 hayatımız devam edeceğiz
Hakıkatı ıman ile
Uhuvvetın ferman ile devam ede edeceğiz
rısalatun nuru ile
ustazımın şürü ile
allahımın rıza ile
dünıyamızın feda ile devam ede edeceğiz.

Aciz…. Abdul mannan.

সমস্থ নূর সুহৃদগণের প্রতি উস্তাদ বদিউজ্জামানের মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বেকার শেষ দারস.

আমার প্রান প্রিয় ভাইগন!

আমাদের দায়িত্ত হল পজেটিভ বা ইতিবাচক চলাফেরা করা, নড়াচড়া করা। নেগেটিভ বা নেতিবাচক বিচলন আমাদের কাজ নহে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে কেবলমাত্র ঈমানের খেদমত করা হল আমাদের লক্ষ উদ্দ্যেশ্য, আল্লাহ্‌র কাজ কি ? ঐ দিকে নিজেদেরকে মিক্স বা মিশ্রিত করা আমাদের চিন্তার বিষয় নহে, এটা তিনি-ই বেশী ভাল জানেন। আমরা নিজেদের হেফাজত ও রক্ষা করার ফলাফল বহন করে ঈমানের খেদমতের ভিতরে; প্রত্যেকটি সমস্যার বিপরীতে ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতার প্রতি মুখাপেক্ষী। যেমন-

আমি নিজের ক্ষেত্রে উদাহারন স্বরূপ বলছি যে, আমি পূর্ব থেকেই আগত এই দুনিয়ার পক্ষ থেকে সকল চাপ ও আমাকে নিম্নগামী করে এমন আচরণের বিপরীত নাক ছিটকাইনাই। আমার জীবনে আগত অনেক অনেক চাপাচাপিকে আমি বহন করেছি, মাতা পেতে নিয়েছি, এর অনেক দৃষ্টান্ত প্রমাণিত রয়েছে। উদাহারন হিসেবে যেমন- রাশিয়ায় কামান্ডারের প্রতি পা উত্তোলন না করাটা; রাষ্ট্রীয় সিকিউরিটি সৈন্য সম্পর্কিত ফাঁসির ধমকির বিখ্যাত মামলার সম্মুখে পাশাদের যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্ন সমূহের বিপরীতে পাঁচ টাকার মূল্যও আমি দেই নাই এমন অনেক মামলার ন্যায়, এই জাতীয় অনেক ব্যাপার গুলো সাক্ষী হয়ে আছে। কিন্তু এর পরে এই ত্রিশ বছর যাবৎ ইতিবাচক আচরণ করাটা, নেতিবাচক গতিভেদ না করার এবং এলাহির কর্ম পদক্ষেপে নিজেকে না জড়ানোর হাকিকাতের কারনে; আমার বিপরীতে উত্তাপিত মামলা, হিংসাপর সকল কিছুর বিপরীতে আমি ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চিত্তে আমি মুকাবেলা করেছি।

হযরত জিরজিস আঃ (তারিখে তাবারি,২/১৮৬) এর ন্যায়, বদর, উহুদের ময়দানে সীমাহীন কষ্ট ভোগের ন্যায় ধৈর্য ও আনত নয়নে গ্রহণ করে জীবন পার করেছি।

হাঁ , এই একাশিটি অপরাধকে অন্যায়ভাবে উপস্থাপনকারী, সায় প্রধান কারী বিচারককে এমন মামলায় আমি নিজেকে মিথ্যা প্রমান করার সাথে আমার উপর জুলুমের ফয়সালাকারীদের বিপরীতে বদদোয়া ও আমি করেনি। তার এক মাত্র আসল ব্যাপার ও কারণ হল এই যুগে আধ্যাত্মিক জিহাদ করে যাওয়া জরুরী। এই ধ্বংসাত্মক সংগ্রামের সম্মুখে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা বাঁধ তৈরি আবশ্যকীয়। এর মাধ্যমে আমাদের ভিতরকার সমস্থ কষ্ট সহিষ্ণুতাকে সমগ্র শক্তি দিয়ে নিজেদেরকে সাহায্য করা উচিৎ। অবশ্যই আমাদের এই সংগ্রামি পথে শক্তি আছে। কিন্তু এই শক্তিকে, ভিতরকার অস্থিতিশিল পরিস্থিতিকে হেফাজত করার ক্ষেত্রে ব্যাবহার করা অত্যান্ত জরুরী। “ ওলা তাযিরু ওয়াযিরাতুন ওয়িয্রা উখ্রা ” আলোচ্য বিধানের সাথে বোধগম্য যে, কোন অপরাধীর প্রানের কারনে; তার ভাইকে, পরিবারকে, তার শিশু-কিশোরদেরকে অপরাধী করা যায় না। এই কারনে, আমি আমার সারাটি জীবনে সমগ্র শক্তি দিয়ে সার্বজনীন ভাবে ভিতরকার হেফাজতের জন্যে উৎসর্গী হয়েছিলাম। এই শক্তি আমাদের ভিতরকার উম্মতের বিরুদ্দে ব্যাবহার নহে, বরং বাহির থেকে আগত আক্রমনের থেকে মুক্ত থাকার জন্যে ব্যাবহার করা যেতে পারে। উল্লেখিত আয়াতের শিক্ষার দ্বারা আমাদের দায়িত্ত হল; ভিতরকার সমস্থ সমস্যাবলিকে আমাদের সার্বিক শক্তি দিয়ে হেফাজতের লক্ষে সহযোগিতার হাত বাড়ানো ও আমরা এটাই করতে হবে। এই কারনেই তো আমাদের ইসলামী দুনিয়াটা ঐ ভাবে হেফাজত থেকেছিল এবং ভিতরকার ফিতনা, অশান্তি হাজারে এক পার্সেন্টে নেমে এসেছিল। এটাও কৌশলগত গবেষণার ফলাফলে উন্নীত হয়েছিল। আধ্যাত্মিক জিহাদের সব চেয়ে বড় শর্ত হল; এলাহির ফয়সালার সাথে না জড়ানো যে, আমাদের কাজ হচ্ছে খেদমত করা; ফলাফল মহান রবের হাতে সংশ্লিষ্ট, আমরা তো আমাদের দায়িত্ত আদায় করাতে বাদ্য ও মজবুর।

আমিও জালালুদ্দিন হারজামশাহ এর ন্যায় বলছি, আমাদের দায়িত্ত ঈমানের খেদমত করা, উপযোগিতা, বিজয়ী করা না করা এটা মহান রবের দায়িত্ত। এভাবে চিন্তা করে এখলাসের সাথে বিচলন করাটা আমি কোরআনের কাছ থেকে জ্ঞান পেয়েছি।

বাহিরের পক্ষ থেকে আগত আক্রমনের বিপরীত মজবুত ভাবে মুকাবেলা করা জায়েয। কারণ দুশমনের মাল, সন্তান-সন্তুতি গনিমতের হুকুমে আনিত। কিন্তু ভিতরের ব্যাপারটা এরকম নহে, ভিতরের সমস্যাবলিকে ইতিবাচক পন্থায় আধ্যাত্মিক সমস্যাবলীর বিপরীতে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও এখলাসের সাথে করতে হয়। বাহিরের সাথে জিহাদ আলাদা ও ভিতরের জিহাদ সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। এখন লক্ষ লক্ষ সুহৃদগণকে মহান আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন, আমাদের কাজ হল আমাদের সমস্থ শক্তি দিয়ে বড়জোর ভিতরকার সমস্যাবলিকে হেফাজতের জন্যে ইতিবাচক পন্থায় এগিয়ে যেতে হবে, সমাধান করতে হবে। এই যামানায় ভিতরের ও বাহিরের মধ্যে আধ্যাত্মিক জিহাদকে বুঝতে পারাটা অনেক অনেক বড় এক ব্যাপার।

আরেকটি ব্যাপার বলি, এটাও অপরিসীম গুরুত্তপুরক। কোরআনের বিধান অনুসারে, এই যামানায় মিমহীন এই মাদানিয়াতের, আধুনিকতার, সভ্যতার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে দৈনিক জীবনের প্রয়োজনের নামে জরুরতের নামে মানুষ চারটি জরুরতকে বিশটিতে উপনীত করে নিয়েছে। মন্দ অভ্যাসের দাসে পরিণত হয়েছে, অপ্রয়োজনীয়তাকে খাসলতে রুপান্তর করে নিয়েছে। যেখানে আখেরাতের উপর ঈমান রেখেছে আবার “জরুরত রয়েছে” বলে জরুরতের ধারনার সাথে দুনিয়ার এই ক্ষনস্থায়ি খাবার-দাবার, চলা-ফেরা, লাভ-লোকসানকে জরুরত জরুরত বলে ঈমান রাখা আখেরাতের স্থলে দুনিয়াকে গুরুত্ত দিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে, প্রাধান্য দিচ্ছে।

চল্লিশ বছর পূর্বে, একজন জেনারেল আমাকে দুনিয়ার সাথে জীবন যাপনে অভ্যস্থ করানোর লক্ষে বেশ কিছু কামান্ডারদেরকে, এমনকি বেস কিছু হজাদেরকে আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তারা আমাকে বলিলেন যে, “আমরা এখন দুনিয়ার প্রতি অনুগত হতে বাদ্য – ইন্নায যারুরাতি তুবিহুল মাহযুরাত – আলোচ্য কায়দার ধর্মানুসারে ইউরোপের কিছু নিয়ম-নীতিকে সভ্যতার নিরিখে সাড়া দিতে,তাক্লিদ করতে আমরা মজবুর হয়ে গেছি”। আমিও তাদেরকে বলিলাম যে, আপনারা সীমাহীন ধোঁকার ধুম্রজালে পরে গিয়েছেন ও নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছেন। জরুরত যদি মন্দ ইচ্ছার থেকে আগত হয়, তাহলে অকাঠ্যভাবে এটা সঠিক নহে; হারামকে হালাল করতে পারবে না। আর যদি মন্দ পুষ্টতা থেকে না আসে অর্থাৎ জরুরত হারাম পথের বাহক যদি না হয়, তাহলে সমস্যা নেই। যেমন- কোন ব্যাক্তি, অনিষ্টতার নিয়তে হারামের মাধ্যমে (মদ, হিরুইন) যদি নিজেকে মাতাল করে এবং এই মাতলামির কারনে যদি সে কাউকে হত্যা করে; তাহলে তার উপর হত্যাকারী হিসেবে হুকুম সাব্যস্থ হবে, এটাকে মা’জুরিয়ত বা অপারগতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে না, সে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। কারণ হল- মন্দ ইচ্ছার দ্বারা এই জরুরতটাকে সে অস্থিত্তে, ময়দানে, বাস্থবে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কোন পাগল শিশু যদি আকৃষ্টতার ধরুন কাউকে এমন করে তাহলে এটা হত্যা বিবেচিত হবে না, মা’যুর হবে। শাস্তিতুল্য নহে, কারণ শিশুর কৃত হত্যা ইচ্ছার সুস্থ অন্তরালে ঘটেনি। সুতরাং আমিও ঐ কামান্ডারদের ও হুজুরদেরকে বলিলাম যে, খাবার-দাবার, জীবন যাপনের ন্যায় প্রয়োজনের বাহিরে আর কি-ইবা জরুরত রয়েছে যে, মন্দ ইচ্ছার দ্বারা অন্যায় ও নিশেদজ্ঞ, শরীয়তের বিধানের বাহিরে গিয়ে এবং হারামের পথে হেঁটে জন্ম গ্রহণকারী, বেহুদা প্রয়োজনীয়তা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করতে পারে না। অপর দিকে সিনেমা, থিয়েটার, ড্যান্স এর ন্যায় অনেক বিষয়াদি মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে বলার বাহানার গ্রহণীয়তা এই জন্যে নহে যে, এটা সর্বসাকুল্য, বাধাহীন প্রয়োজনের, মুতলাক জরুরতের থেকে না হওয়ার ধরুন এবং এমন সব কিছু নোংরামি মন্দ ইচ্ছার থেকে আগত হওয়ার কারনে, এগুলোর হারামকে হালাল করার কোন উপযুক্ত কারণ হতে পারে না। মানুষের তৈরি আইন কানুন এই ব্যাপারটাকে এমন ভাবে গ্রহণ করেছে যে, ইচ্ছার বাহিরে অকাট্য জরুরতের সাথে, মন্দ ইচ্ছা থেকে আগত হুকুম ও আদেশের মুখাপেক্ষীতা গ্রহণ করেছে। ঠিক এর বিপরীত এলাহি আইন কানুনে, আরও ভিত্তি পূর্ণ ও সূক্ষ্ময় নিতিমালার দৃষ্টিতে এটাকে পার্থক্য করেছে, প্রমাণিত করে উপস্থাপিত করে দেখিয়েছে , , , , , , ,   । (এমিরদাগ ২, ২৪১)

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসীর (রহঃ) সংক্ষিপ্ত জীবনী

আল্লামা নুরসির যুবক কালে একবার মিসরের আযহার ইউনিভার্সিটির রেক্টর বা উচ্চ-পদস্থ বড় এক আল্লামা শেখ বাহিদ রহঃ তুর্কিতে আসলে ও তার বন্দু বান্দবের খাতিরে নুরসির সাথে এক মুনাযারায় বসেছিলেন এবং চা খাওয়ার ফাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে উসমানী খেলাফতের হুকুমত ও ইউরোপের হুকুমত সম্পর্কে কি মনে কর? এই দুই রাষ্ট্রের ব্যাপারে তুমার মতামত কি? মুলতঃ শেখ বাহিদ প্রশ্নটি নুরসির জ্ঞানের পরিক্ষার জন্যে নহে বরং ভবিষ্যতের দুনিয়ার রাজনীতির গতি সম্পর্কে তার জানার উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন। নুরসিও উত্তরে বলেছিলেন যে,

اِنَّ الْاَوْرُوبَا حَامِلَةٌ بِالْاِسْلَامِيَّةِ فَسَتَلِدُ يَومًا مَا وَ اِنَّ الْعُثْمَانِيَّةَ حَامِلَةٌ بِالْاَوْرُوبَائِيَّةِ فَسَتَلِدُ اَيْضًا يَوْمًا مَا

অর্থাৎ- ইউরোপ একটি ইসলামের রাষ্ট্রে ও উসমানী রাষ্ট্র একটি ইউরোপের রাষ্ট্রে গর্ভপাত হয়ে আছে। সময় আসলে একদিন বাস্তবতা প্রকাশ্যে চলে আসবে, তথা এই গর্ভপাতের বাচ্ছা জন্ম গ্রহণ করবে। এই উত্তর শুনে হযরত শেখ বাহিদ রহঃ বলেছিলেন যে, এই যুবকের সাথে মুনাযারা করা অসম্ভব, তার সাথে মুনাযারা করা উচিৎ নহে, আমিও তার উত্তরের সাথে একমত ছিলাম। এই প্রশ্নের উত্তর কেবল মাত্র এই পন্থায় সহজ ও সাবলীল এবং অলংকারের মুক্তাযায়ে হাল অনুযায়ী উত্তর দেওয়া এই ভাবে শুধুই বদিউজ্জামানের জন্যে বিশেষ ক্ষমতার ব্যাপার। তিনি এই কথাগুলো সাঈদ নুরসী সম্পর্কে বলেছিলেন। আল্লামা নুরসির একটি তাত্ত্বিক পরামর্শ হল এই যে, পথপ্রদর্শক কোন কিতাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যান্ত সচেতন থাকতে হবে। কারণ এই জামানাটার, থর থর করে রুপ আকৃতির ভিন্নমুখী ডিজাইনে ধোঁকাবাজি এতই বেশী যে, পর্দার ঠিক বিপরীত দিকে ইসলামের যুবকদেরকে তারা ধ্বংস, নষ্ট, অপদস্থ, লাঞ্চিত করে তাদের দিকে নিয়ে ব্যাস্থ রেখে দিতে অতি কৌশলে কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং কোন বইকে পড়ার আগে বা কোন কথাকে শুনার কালে প্রথমেই এই কথাগুলোর উত্তর খুজে নিবে আর তা হল;

مَنْ قَالَ وَ لِمَنْ قَالَ وَ لِمَا قَالَ وَ فِيمَا قَالَ

অর্থাৎ কে বলেছে? কাকে বলেছে? কেন বলেছে? কোন লেভেলে বলেছে? এই ভিত্তি মুলক নীতির উত্তর খুজে বিবেচনার দৃষ্টিতে আনা জরুরী। আর এটাই হচ্ছে কোন কথার লেভেলের উচ্ছতা, সুন্দর্যতা, ক্ষমতার প্রারম্ভিকা কে আত্মস্থ করার দিক সমূহ। ভুলে গেলে চলবেনা কথার চারটি শর্ত হল বক্তা, শ্রোতা, কথা, লেভেলের স্বার্থকথা।

তিনি মহাবিশ্বের প্রকৃত রূপকে মহান স্রষ্টার নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এই আয়াত সমূহ যদি পাঠ করা হয় তাহলে ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের হাক্বীক্বাত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এমন প্রকৃত ও মজবুত ঈমানের স্তরে পৌছতে সক্ষম হয় যা প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের সূক্ষ্ম বেড়াজাল থেকে উদ্ভূত সংশয় সমূহের মোকাবেলা করতে সক্ষম। সকল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির অর্থ হচ্ছে নিখিল বিশ্বের দ্বার উন্মোচন করা। এই বিশ্বজগতকে যদি এক বিশাল গ্রন্থরূপে দেখা হয় যার প্রতিটি অক্ষর “গ্রন্থ প্রণেতা”র প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাহলে তা ঈমানের বুনিয়াদকে শুধু মজবুতই করে না, তাকে গভীর ও সম্প্রসারিতও করে। মানুষের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে এমন এক দ্বীন যার মাধ্যমে সে মহান স্রষ্টা আল্লাহকে তাঁর সকল সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীসহ চিনতে সক্ষম হয়। রিসালে-ই নুর মানুষের কাছে তার স্রষ্টার পরিচিতি সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করে; এটা মুসলমানদেরকে অনুকরণীয় ঈমান থেকে প্রকৃত (তাহক্বীকি)

ঈমানের দিকে ধাবিত করে; অমুসলিমদেরকে সৃষ্টির উপাসনা থেকে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। মহা প্রজ্ঞাময় কুরআনের পথ দেখায়।

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (রহঃ) ১৮৭৬ সালে পূর্ব তুরস্কের বিতলিস প্রদেশের নুরস নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি অতি উচ্চস্থরের আলিম ছিলেন যিনি প্রথাগত দ্বীনি বিষয় ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত ছিলেন। যৌবনেই তিনি শিক্ষা দীক্ষায় অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন এবং বদিউজ্জামান (কালের বিস্ময়) খেতাব অর্জন করেন। বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসীর (রহঃ) জীবনকাল উসমানী খিলাফত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন ও বিভাজন, ১৯২৩ সালে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র গঠন এবং এর পরের ৩৭ বছর পর্যন্ত ব্যপ্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (রহঃ) মানবতার জন্য ইসলামের পথে সংগ্রাম করেন। তিনি অগনিত ছাত্রকে শিক্ষাদান এবং সমকালিন প্রথম সারির আলেমদের সংগে বিভিন্ন দ্বীনি কর্মকান্ডে জড়িত থাকা ছাড়াও পূর্ব তুরস্কে রুশ সৈন্যদের আক্রমন প্রতিরুধে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। রুশদের বিরুদ্ধে দুই বছর যুদ্ধে সক্রিয় থাকার পর যুদ্ধাহত অবস্থায় তিনি বন্দী হন। বন্দীত্ব থেকে অলৌকিকভাবে মুক্তিলাভের পর ইসলামের স্বার্থ সমুন্নত করার জন্য জনজীবনে বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। যাইহোক, যে বছরগুলতে ওসমানী খিলাফত ভেঙ্গে তা প্রজাতন্ত্রে রূপ লাভ করে সেই বছরগুলোতেই তিনি "পুরাতন সাঈদ" থেকে "নতুন সাঈদ"- এ রূপান্তরিত হন। "নতুন সাঈদ"-এ রূপান্তর ছিল তাঁর জন্য জনজীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পড়াশুনা ও ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকা, যা তখন ছিল এক নতুন ধরনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি। দুই বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ কর্মকান্ড ও দমন নীতির বিরোধিতা করায় তাঁকে পশ্চিম আনাতোলিয়ায় নির্বাসিত করা হয় এবং এর পরের সাতাশটি বছর তাঁর জীবন শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার, হয়রানি এবং কারাদন্ড ভোগের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। কিন্তু কারাদন্ড ও নির্বাসনের এই বছরগুলিতেই প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠার "রিসালে-ই নূর গ্রন্থসমগ্র" লিখিত হয় এবং সমগ্র তুরস্কে তা ছড়িয়ে পড়ে। সাঈদ নুরসী নিজেই বলেন, এখন আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, আমার জীবনের অধিকাংশ সময়ই নিজ ক্ষমতা, দূরদর্শিতা, উপলব্ধি এবং ইচ্ছার বাইরে এমনভাবে পরিচালিত হয়েছে যাতে কোরআনের খেদমতের জন্যই এই বইগুলো লিখিত হয়। জ্ঞান চর্চায় ব্যয়িত আমার সমগ্র জীবন যেন ছিল "রিসালে-ই নুর" লেখার প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র। ইসলামী দুনিয়ার অধঃপতনের মূল কারণ যে ঈমানের ভিত্তি দূর্বল হয়ে যাওয়া একথা বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (রহঃ) বুঝতে পেরেছিলেন। এই দূর্বলতার সাথে বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদ এবং অন্য সকল অপশক্তির আক্রমন এক হয়ে উনবিংশ এবং বিংশ শতকে ঈমানের ভিত্তিকে দূর্বল করে দেয়। ফলে তাঁর এই বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, ঈমানকে মজবুত করা এমনকি বাঁচিয়ে রাখাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জরুরী এবং প্রধান কাজ। সে সময় যা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে ইসলামের ইমারতকে তার ভিত্তিতে পূণঃনির্মাণ করার নিমিত্তে সব ধরনের প্রচেষ্টা করা এবং কলমের জিহাদের মাধ্যমে সকল আক্রমণকে প্রতিহত করা।

বস্তুতঃ "রিসালে-ই নূর"-এ তিনি এ কথাই প্রমান করেন যে, বিশ্বজগতের কর্মকান্ড বিষয়ক বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধকর আবিস্কার দ্বীনের হাক্বীকাতকেই বরং মজবুত করে। রিসালে-ই নূরের গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করার কোন অবকাশ নেই কারণ বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (রহঃ) নিজেই তুরস্কের ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে ইসলামী আকীদা ও ঈমানকে পুনর্জীবিত করেন; এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর এই ভূমিকার গুরুত্ব বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও "রিসালে-ই নূর" শুধুমাত্র যে মুসলমানদের সমস্যার সমাধান দেয় তাই নয় বরং সমস্ত মানবকূলের জন্যেও তা বেশ কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ "রিসালে-ই নূর" লেখা হয়েছে আধুনিক মানুষের মানসিকতাকে লক্ষ্য রেখে, যে মানসিকতা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে জড়বাদী দর্শনে আচ্ছন্ন কোন ব্যক্তির মনে যেসব বিভ্রান্তি, সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়, রিসালে-ই নূর তার সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম। এটা আধুনিক মানুষের সকল "কি, কেন, কিভাবে"-র উত্তরও দিয়ে দেয়। রিসালে-ই নূর ঈমানের অতি গভীর বিষয়বস্তুসমূহ সাধারন মানুষের জন্য এমন সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করে যে, নবীনরাও তা বুঝতে পারে এবং ফায়দা লাভ করতে পারে। অথচ ইতিপূর্বে ঈমানের এ সমস্ত সূক্ষ্ম ও সুগভীর বিষয়ে শুধুমাত্র বিজ্ঞ আলেমগণই পড়াশুনা করতেন। বিশ্বজগৎ এবং মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি রিসালে-ই

নূরে এ কথা প্রমাণ করেন যে, প্রকৃত সুখ ঈমান এবং আল্লাহর পরিচয় লাভের মাঝেই নিহিত রয়েছে। তিনি এও দেখিয়ে দেন যে অশান্তি ও যন্ত্রণা যা কুফরের মাধ্যমে জন্ম নিয়ে মানুষের রূহ আচ্ছন্ন করে তা শুধুমাত্র প্রকৃত ঈমানের দ্বারাই নিবৃত করা সম্ভব। পবিত্র কুরআন মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে সম্বোধন করে। এই প্রজ্ঞাময় কিতাব মহাবিশ্ব এবং এর সত্যতা সঞ্চরণশীলতা ও পরিবর্তনশীলতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাতে সে মাখলুক হিসেবে তার নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবন করতে পারে। রিসালে-ই নূরে সাঈদ নুরসী শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। এবং অনেক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের পথ মাড়িয়ে ৮৪ বছর বয়সে ১৯৬০ সালে উরফায় ইন্তেকাল করেন। (অংশ বিশেষ সংগৃহীত, অনু;)

সাঈদ নূরসীর

বাস্তবিক মর্ম বাণী সমূহ

১। যিনি মশার শক্তিকে সৃষ্টি করেছেন, সূর্যকে ও ঐ সত্ত্বা সৃষ্টি করেছেন।

২। মানুষ সৃষ্টিগত সম্মানী হওয়ার ধরুন, সত্যকে অন্বেষন করে। কখনও অন্যায় হাতে পৌছায়, বাতিলকে সত্য মনে করে বক্ষে গোপন করে রাখে, যখন হাকিকাতকে খুড়ে তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে ভূল পথে নিমজ্জিত হয় ফলে সত্য মনে করে বাতিলকে তার চিন্তাদেহে পরিধান করে।

৩। প্রতিদানের উপর ফেরাকারী রাজনীতি একটি জানুয়ার।

৪। সময় বুঝিয়ে দিয়েছে যে, জান্নাত এত সস্তা নহে, জাহান্নাম ও অপ্রয়োজনীয় নহে।

৫। উত্তম দর্শনকারী উত্তমভাবে চিন্তা করে, আর উত্তম চিন্তাকারী জীবন থেকে স্বাদ উপভোগ করে।

৬। মানব জাতীকে প্রান্তবন্তকারী হল তার কৃতকর্ম আর মৃত্যুবরণকারী হল তার হতাশা।

৭। কৃত্রিমতা যদি জ্ঞানের হাত থেকে বের হয়ে মূর্খের হাতে পৌছায় তখন তা বাস্তবতায় রুপ ধারণ করে অমৌলিক ব্যাপারের দরজা খুলে।

৮। আত্মগরিমা মানুষের মাল না হলেও মানুষকেই মাল বানিয়ে ফেলে।

৯। হাদিস হল জীবনের মূল ধাতু ও বাস্তবতার মূল উপকরণ।

১০। ধর্মের সজিবতা জাতির প্রাণবন্ততার নাম একি সাথে ধর্মীয় জীবন হল জীবনের আলো স্বরুপ।

১১। দুশমনের দুশমনী; যদি দুশমনীতে চলে এটা তার বন্ধু কিন্তু দুশমনীতা ছেড়ে দিয়ে বন্ধু হলে এটা তার শত্রু।

১২। যামানা যতই বয়োজ্যেষ্ট হচ্ছে কোরআন ততই যৌবনে পা রাখছে, সে তার গোপনীয়তাকে প্রকাশ করছে। আলোকে আগুন মনে হওয়ার ন্যায় কখনও সাহিত্যের জটিলতাও অতিরঞ্জনের আবহাওয়া দেখায়।

১৩। সমস্যাবলীঃ যা পাপকর্মের শিক্ষক স্বরুপ, নিরাশ যা চিন্তা শক্তির ভ্রষ্টতার; অন্তরের অন্ধকারচ্ছন্নতা রুহের সমস্যাবলীর কেন্দ্রীয় ক্যেবল স্বরুপ।

১৪। সবচেয়ে বদ বখত, সবচেয়ে বিপদগ্রস্থ ও বিপদমূখী ব্যক্তি হল যে কাজ করে না, যদিও অলসতা ব্যক্তির স্বীয় স্বরুপ, অপর দিকে কর্মব্যস্থ প্রচেষ্টাকারী দেহের জীবন এবং এই জীবনের পূর্ণ সচেতনতা স্বরুপ।

১৫। ধৈর্যের প্রতিধান ঐক্যতা। অলসতার শাস্তি পাপে পূর্ণতা। প্রচেষ্টার ফল সার্বিক ধনাঢ্যতা। চলমান সিদ্ধান্ত চেতার প্রতিধান হল বিজয় স্বরুপ।

১৬। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করুন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দেখা সাক্ষাৎ করুন, আল্লাহর জন্যে ব্যস্থ থাকুন "আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর তরে, আল্লাহর কারণে" সন্তুষ্টির দফতরে জীবন চালিয়ে যান। ঐ সময় আপনার সমগ্র জীবনের প্রতিটি মিনিট এক বছরের ছোয়াব সমমানে লিখিত হবে।

১৭। তামাম কায়েনাতের সুলতান হলেন একজন, সবকিছুর চাবিকাটি তারই কাছে রয়েছে, সবকিছুর লাগাম তারই হাতে, সবকিছুই তার আদেশ বার্তায় সমাদিত হয় যদি তুমি তাহাকে পেয়ে যাও তাহলে সকল চাহিদা কামনা পেয়ে গেলে, সীমাহীন হাতপাতা ও ভয়ভীতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে নিলে।

১৮। মালের মালিক কারণ প্রসূতবশত মালিক হওয়ার যে ধারণা করছে, আসলে মূলত আসল মালিকতো ঐ মাধ্যমতা কারণ সমূহের বিপরীত দিকে সবকিছু প্রত্যক্ষকারী চিরঞ্জীব শক্তিধর আল্লাহ কে কেহ নহে।

১৯। মহান স্রষ্টা সীমাহীন তার ক্ষমতা ও অসীম রহমতকে প্রদর্শন করার জন্যে মানুষের মধ্যে অসংখ্য অক্ষমতা সংখ্যাহীন অভাবকে ত্বরান্বিত করে রেখেছেন।

২০। অস্থায়ী সৃষ্টি জীবের অস্তিত্ব যেহেতু স্থায়ী নহে যতই তার জীবন লম্বা হোক না কেন ঘুরে দিয়ে সীমীত সংক্ষিপ্ত জীবনের হুকুমের আওতায়ই থাকবে। তার একটি বছর একটি সেকেন্ডের ন্যায় গমনীয়, হৃদয় আকৃতি পূর্ণ একটি কল্পনা এবং দুঃখ বিশেষ একটি স্বপ্ন অন্য কিছু নহে।

২১। এই দুনিয়ার ঘরটি হল একটি পরিক্ষাক্ষেত্র এবং খেদমতের পাত্র; এখানে মজা করা ও মূল্য পাওয়া বা প্রতিধান চাওয়ার জায়গা নহে।

২২। প্রকৃতি হল একটি এলাহীর শিল্পকর্ম, শিল্পী বা কারিগর হতে পারে না একটি রাব্বানী কিতাব স্বরুপ, লেখক হতে পারে না একটি নকশা স্বরুপ নকশাকারী হতে পারে না একটি খাতা স্বরুপ কখনও খাতার মালিক হতে পারে না, ইহা একটি কানুন স্বরুপ কখনও ক্ষমতাবান হতে পারে না।

২৩। কোরআন হল একজন হাফিজ যে কুদরতের কলম দ্বারা মহাবিশ্বের পৃষ্টা সমূহের মধ্যে লিখিত আয়াত সমূহকে পড়ে যায়।

২৪। এটা কি সম্ভব যে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলকে সৃষ্টিকারী মহা প্রকৌশলী আল্লাহ আসমান ও জমিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হওয়া এবং সৃষ্টিকুলের সর্বোচ্চ পরিপূর্ণ ফল সূলভ হওয়া এই মানবজাতীকে অনর্থক ছেড়ে দিবেন, তিনি মাধ্যম সমূহ ও অনাকাংখিত ব্যাপার সমূহের হাতে মানুষকে তুলে দিবেন, বিশাল হিকমতের সাগরকে অহেতুকতার জ্বলে উল্টিয়ে দিবেন? কখনও নহে!

২৫। হে মানুষ! যদি তুমি রিপু ও শয়তানের কথায় জীবন চালাও তাহলে আসফালে সাফিলিনে নিক্ষিপ্ত হবে। আর যদি তুমি কোরআনের ও হক্বের কথায় চলো তাহলে আ'লায়ে ইল্লিয়িনে উজ্জীবিত হবে। ফলে বিশাল এই কায়েনাতের মহাসুন্দর কেলেন্ডারে রুপান্তরিত হবে।

২৬। যে আল্লাহকে চিনতে পারে নাই তার তামাম দুনিয়া ব্যাপি বালা মুসিবত বিদ্যমান। আর যে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে তার দুনিয়া আলোতে নূরানী ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তিতে ভরপুর। স্থরভেদে ঈমানের শক্তি দ্বারা স্বাদবান হয়।

২৭। অবশ্যই যদি এই কায়েনাত থেকে রিছালাতে মুহাম্মদ (স:) এর নূর বের হয়ে যায় চলে যায় তাহলে এই কায়েনাত মৃত্যুবরণ করবে.....আর যদি কোরআন চলে যায় কায়েনাত পাগল হয়ে যাবে, এবং পৃথিবী স্বীয় দেমাগ বুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলবে, বরং চেতনহীন থাকা কোন অস্তিত্বের ব্যক্তিকে কোন দ্রুতগামী গাড়ী আঘাত হানবে তখন কেয়ামত হয়ে যাবে।

২৮। জীবনের স্বাদকে এবং জৌলুসকে যদি পেতে চাও তাহলে আপন জীবনকে ঈমানের দ্বারা জীবনযাপন করো এবং ফরজ সমূহ দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত করো এবং গুনাহ থেকে অতি দূরত্ব বজায় রেখে এই জীবনকে হেফাজত করো।

২৯। হাকিকি সুঃখ ও যন্ত্রণাহীন আনন্দ এবং কষ্ট সহিষ্ণুতাহীন পরম মনোভাব এবং জীবনের চির শান্তিময়তা কেবল মাত্র ঈমানের মধ্যেই বিদ্যমান এবং ঈমানের মৌলিকত্ব এই দফতরেই পাওয়া যায়।

৩০। ঈমান যেমনটি নূর তেমনি শক্তি ও হাঁ হাকিকি ঈমানকে অর্জনকারী ব্যক্তি তামাম সৃষ্টিকুলে সৌর্যবীর্জের সাথে অধিকারী হয়।

৩১। ঈমান মানুষকে মানুষ বানায় বরং ঈমান মানুষকে বাদশাহ বানায়।

৩২। দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষার ময়দান ও খেদমতের স্থান। আনন্দ, পারিশ্রমিক ও পুরুস্কারের জায়গা নয়।

৩৩। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন যেমন নেয়ামতকে বৃদ্ধি করে তেমনি অভিযোগ মুসিবতকে বৃদ্ধি করে। একই সাথে তাকে দয়ার অযোগ্য করে।

৩৪। ভ্রাতিত্ত্ব বন্ধুত্ব, শক্তি সামর্থ হল হক্ব ও ইখলাসের মধ্যে আর এই শান্তির মাধ্যম এখলাস অর্জন হয় মৃত্যুর স্বরণের মাধ্যমে।

৩৫। মন্দকে সৃষ্টি করা মন্দ নয় মন্দের অর্জন করা মন্দ।

৩৬। একটি দালান তৈরী করতে ১০০ জন লোকের ১০০ দিন লাগে কিন্তু তা ধ্বংস করতে একজন লোকের একটি মেছের কাটিই যথেষ্ট।

৩৭। দুইজন শক্তিশালী যোদ্ধা যদি একে অপরের সাথে ঝগড়ায় ব্যস্থ থাকে তাহলে জানা কথা একটি ছোট শিশুও তাদের পরাজিত করতে সক্ষম।

৩৮। দাঁড়িপাল্লার দু দিকে যদি দুটি পাহাড় রাখা হয় তাহলে উভয়ের সাথে খেলা করার ক্ষমতা একটি ছোট পাথরের ও আছে।

৩৯। তোমার বলার অধিকার আছে যে আমার, মাসলাক হল হক্বের উপর অথবা আরও সৌন্দর্যের পথ কিন্তু তোমার বলার অধিকার নাই যে কেবল মাত্র হক্ব হল আমার মাসলাক।

৪০। তোমার সকল বলা যেন সত্য হয় কিন্তু সকল সত্যকে বলা তোমার অধিকার নেই। সকল কথা সত্য হওয়া আবশ্যকীয় কিন্তু সকল সত্যকে বলে যাওয়া অর্থাৎ সঠিক নহে।

৪১। কাউকে যদি সব সময় বলা হয় তুমি ভালো তুমি ভালো, তাহলে ভালো হতেপারে আবার কাউকে যদি বলা হয় তুমি খারাপ তুমি খারাপ তাহলে সে আরো নিচে পতিত হয় খারাপ হয়।

৪২। লোভ হল বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্র, নির্ভরতা ও অল্পতুষ্টি হল রহমতের অস্ত্র।

৪৩। গীবত হল শত্রুতাকারীদের, প্রতিহিংসাকারীদের একমুখীদের সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত নিকৃষ্ট অস্ত্র। একজন সম্মানিত লোক সে কখনও এই নিকৃষ্ট অস্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে না।

৪৪। কুরআন ও ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই মহামূল্যমান বাহিক্যভাবে যতই ছোট দেখা যায় না কেন মূল্যায়নে তা অনেক অনেক বড়। অবশ্যই চিরস্থায়ী সুখের পথে সাহায্যকারী কখনও ছোট নহে।

৪৫। মুসিবতের সময় দীর্ঘ হয়। আল্লাহ মানবকে যে ধের্য্যে নামক ক্ষমতা দান করেছেন। অমূলক পথে ব্যায় না করলে তা সকল মুসিবতে মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট।

৪৬। মুসিবত বড় করে দেখলে বড় হতে থাকে ছোট করে দেখলে ছোট হতে থাকে যেমন রাতের অন্ধকারে কিছুর ছায়া দেখলে গুরুত্ব দিলে বড় হতে থাকে না দিলে হারিয়ে যায়।

৪৭। ঈমান হল জান্নাতের আধ্যাত্মিক তু'বা বৃক্ষের বীজকে বহনকারী, আর কুফুর হল জাহান্নামের আধ্যাত্মিক জাক্কুম বৃক্ষকে গোপনে বহন করে। অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তা শুধুমাত্র ইসলামের ও ঈমানের মধ্যে বিদ্যমান।

৪৮। গোনাহ হল যা অন্তরকে কালো করতে করতে ঈমানের নূর মিঠে যায় অন্তর শক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক গুনাহে কুফুরিতে থাকার যাবার একটি পথ বিদ্যমান আছে।

৪৯। তোমাদের প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত থাকা আবশ্যক কেন নয় তিনি যদি খুশি হয়ে যান আর তামাম দুনিয়া অখুশি থাকে এর কোন মূল্য নাই। তিনি যদি গ্রহণ করে নেন। আর দুনিয়া প্রত্যাখ্যান করে এরও কোন প্রভাব নাই।

৫০। মুসলমানদের ভ্রাতিত্ত্বের বন্ধন হল দেহের হাত নাক চুখের ন্যায় যেভাবে এগুলো পরস্পরে ঝগড়াটে হয় না এবং একে অপরকে আপ্রাণ সমর্তন করে যায়।

৫১। অমিতব্যয়ী ব্যক্তি লাঞ্ছনা, বঞ্চনার শিকার হয় আর দরিদ্রতায় পতিত হতে বাধ্য হয়। এই যামানায় অপচয় করে যে সম্পদ ব্যায় করা হয় তার বিনিময়ে অনেক উচ্চ মূল্যে শোধ করতে হয়।

৫২। বিনয়ীতাকে নীচু ও গাম্ভীর্যতাকে অহংকারী বাহ্যিকভাবে মনে হলেও হাকিকাতে তা সম্মানের বৈশিষ্ট্য ঠিক তেমনী মিতব্যয়ীতা কৃপণতা নহে।

৫৩। সমাজের মানুষের নীজের প্রতি আকর্ষন তৈরী করতে ইচ্ছা করা যাবে না, তবে কাউকে আকর্ষিত করানো যাবে এতে আনন্দিত হওয়া যাবে না এমনটি হলে ইখলাস নষ্ট হয়ে লোক দেখানোতে রুপান্তরিত হয়ে যাবে।

৫৪। সাহায্য ও সহয়তা মানুষের কাছে চাওয়া যায় না বরং দেওয়া যায়, এমনকি মনে মনে আকাংঙা করে অপেক্ষিত থাকাবস্থায় প্রেক্ষাপটি আচরণে ও চাওয়া যাবে না বরং প্রদান করে সঙ্গে সঙ্গে ভূলে যাওয়ার পন্থায় দেওয়া হবে। নতুবা এখলাসে আক্রমণ করবে।

৫৫। প্রত্যেক দেখতে পাওয়া সুখ আনন্দের মাঝে একটি দুঃখ কষ্টের চিহ্ন থাকে।

রেফারেন্স সমূহ

১,কালেমাত ২, মাকতুবাত ৩, লামআত ৪, শুয়াআত ৫, ইসারাতুল ইজাজ ৫, মাসনাবিয়ে নুরিয়া ৬, মালাহিক ৭, সিয়াকুল ইসলাম ৮, মুনাজারাত ৯, খুতবায়ে শামিয়া ১০, আসায়ে মুসা ১১, তিলসিমাত ১২, জুলফিকার ১৩, সিরাজুন্নুর ১৪, সিক্কায়ে তাসদিকে গাইবিয়্যাহ ১৫, মুহকামাত ১৬,রুমুজাতে সামানিয়্যাহ ১৭, আসায়ে বাদিয়্যাহ ১৮, উসমাঞ্জা আন্সিপ্লিডিক লুগাত ১৯, ফুরকানে কারিম ২০ কুতুবে সিত্তা ও ইত্যাদি।